আদান-প্রদান

দানাপানি

গোপীনাথ মহান্তি

অনুবাদ

শৈল শর্মা

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ভূমিকা

প্রাচীন সাহিত্যের লোকগাথা, রূপকথা এবং অন্যান্য কাহিনীধর্মী কলাকৃতির মধ্যে উপন্যাসের বীজ প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত; তবুও, সাহিত্যের এই বিভাগের একক স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় আঠারো শতকের বিশ্বসাহিত্যে। বস্তুতঃ পরবর্ত্তী শতাব্দীই বিশ্বসাহিত্যে উপন্যাসকলার আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বর্ণযুগ।

জীবনের যাত্রাপথে দৃষ্টিকোণের দিগ্বলয় বিংশ শতাব্দীতে সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা'র গতিপ্রকৃতিতে যে ব্যাপক ও গভীর পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হ'ল, তা'রই জীবন্ত আলেখ্যের বাহকরূপে আধুনিক উপন্যাসকলা ভাবসম্ভার ও রসবৈচিত্র্যের দিক দিয়ে বর্ণাঢ্য ও সমৃদ্ধ। শুধু তা'ই নয়; অতীতের কাব্যধর্মী ও মহাকাব্যিক গুণাবলীর অধিকারী আজকের উপন্যাস সারস্বতগতে এক সম্ভ্রান্ত পদবীর দাবীদার। যুগ ও জীবনের সমস্ত সংঘাত, সমস্যা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের বাহক, তা আজ জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ ও উজ্জ্বল গ্রন্থ (one bright book of llfe—Lawrence) রূপে বিবেচিত ও সম্মানিত।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও আছে বৈদিক কাহিনী, বৌদ্ধজাতক, সংস্কৃত গদ্যগাথা এবং কথাসাহিত্য; এগুলিতে ও লৌকিক রূপকথায় উপন্যাসকলার আদিম রূপের সংকেত বিদ্যমান। তা হ'লেও আধুনিক অর্থে ও চেতনায় উপন্যাসের যে তাৎপর্য্য আমরা উপলব্ধি করি, তা'র আবির্ভাব-কাল—উনবিংশ শতাব্দীতে; তখন পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির চিন্তা ও চেতনার সঙ্গে ভারতীয় ভাব ও রসমানের যোগাযোগের ফলে এ দেশের চিত্তলোকে এক রেনেসাঁ বা নতুন অভ্যুদয়ের সূচনা হয়েছিল। পশ্চিমের সভ্যতার ও সাহিত্যের প্রতি

সেই অনুরাগ ও আসক্তি সৃষ্টি হওয়ার ফলে ভারতীয় সাহিত্যের আত্মা ও আঙ্গিকে অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হয় ; সেজন্য গদ্য ও পদ্য—উভয় ক্ষেত্রেই দেখা দেয় রুচির সংস্কার ও পরিবর্ত্তন। এই পরিবর্ত্তিত পশ্চাতপটেই উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধকে ভারতীয় আঞ্চলিক সাহিত্যে উপন্যাসের কৈশোরকাল বললে অত্যুক্তি হবে না। 1798-1903 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হিন্দী সাহিত্যে ইংশা আল্লা খাঁর "উদয়ভানু চরিত" "রাণী কেতকী কি কহানী" এবং 1823 খ্রীষ্টাব্দে রচিত প্রথমনাথ শর্মা ওরফে ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়ের "নববাবু বিলাস"কে ভারতীয় আঞ্চলিক সাহিত্যের দুই প্রাথমিক উপন্যাস রূপে গণ্য করা যায়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধেই বাংলা, মারাঠী, হিন্দী, মলায়ালম, ওড়িয়া, তামিল, তেলুগু ও সিন্ধী প্রভৃতি প্রান্তীয় সাহিত্যে উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গরূপ প্রকটিত হয়েছিল।

ওড়িয়া নাটকের জন্মদাতা রামশংকর রায়ের "সৌদামিনী" নামে এক উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে 1877-78 খ্রীষ্টাব্দে "উৎকল মধুপ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু তা অসম্পূর্ণ থাকায় 1888 খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রমেশচন্দ্র সরকারের "পদ্মমালী" প্রথম পূর্ণাঙ্গ ওড়িয়া উপন্যাস বলে গ্রহণযোগ্য। ওড়িয়ার পূর্বতন করদ রাজ্য নীলগিরিতে 1835 খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত এক সত্য ঘটনা অবলম্বনে রোমান্সধর্মী এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি লিখিত। কিন্তু প্রণয়ধর্মী কাব্য-কল্পনা, বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষ চিত্রণ ও নীতি-নিষ্ঠার গৌরব প্রতিপাদনের উপর লেখক সমধিক গুরুত্ব আরোপ করায় এতে সমকালীন সামাজিক জীবন ও সাধারণ চরিত্রচিত্রণ অত্যন্ত গৌণস্থান পেয়েছে। মুখ্যতঃ এটি একটি ঘটনা প্রধান উপন্যাস ; ভাষা-প্রয়োগেও এতে মধ্যযুগীয় আলংকারিক কাব্যশৈলীর প্রভাব পরিলক্ষিত। এটির পর 1891 খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় দ্বিতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস—রামশংকর রায়ের "বিবাসিনী"। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রচলিত সামাজিক সমস্যা ও সংঘর্ষের পরিবেশে কাহিনী ও চরিত্রচয়ন করে লেখক মারাঠা রাজত্বের কুশাসন ও অত্যাচারের পশ্চাতপটে উপন্যাসটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর প্রধান প্রবণতা—বাস্তবের ভিত্তির ওপর আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা। উপন্যাসটিতে বহু আঙ্গিকগত ত্রুটি আছে ; তবুও ওড়িয়া উপন্যাসের আদিপর্বে ও "পদ্মমালী'র প্রকাশের পরে পরে, রামশংকরের এহেন পদক্ষেপ যে ভাবী আশা ও বিপুল

সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছিল; তার জ্বলন্ত নিদর্শন—ব্যাস-কবি ফকীরমোহন ও গোপালবল্লভের উপন্যাসগুলি। কথাবস্তুর পরিকল্পনা, বর্ণনা ও রচনাশৈলীর দিক্ দিয়ে "বিবাসিনী" তা'র পূর্ববর্ত্তী উপন্যাস "পদ্মামালী"র চেয়ে উচ্চাঙ্গের বটে; কিন্তু আঙ্গিক তথা শিল্পরীতির দিক্ দিয়ে উন্নত কলাত্মক চেতনার অধিকারী নয়।

ওড়িয়া কথা সাহিত্য তথা গদ্যশৈলী নূতন কলেবর ও নবজীবনের জন্য যে মহান স্রষ্টার অপেক্ষা করেছিল, দীর্ঘ সেই প্রতীক্ষা ও তপস্যার সিদ্ধি ঘটান ওড়িয়া কথাসাহিত্যের বরপুত্র, ওড়িয়া ভাষার ত্রাণকর্ত্তা, ওড়িয়া কথাসাহিত্যের যথার্থ জনক ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা ব্যাসকবি ফকীরমোহন সেনাপতি (1843-1918) গদ্য ও পদ্য—এই উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর লেখনীর সব্যসাচীত্ব ও সিদ্ধি সুবিদিত। কথাসাহিত্যেও—গল্প ও উপন্যাস, উভয়ত্র—তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভার অমলিন সাক্ষ্য উৎকীর্ণ। ফকীর মোহনের চারটি উপন্যাসই ("ছ' মান আট গুণ্ঠ", "লছমা", "মামূ" ও "প্রায়শ্চিত্ত) 1898 থেকে 1915 খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ তাঁর 55 থেকে 73 বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত। ঐতিহাসিক উপন্যাস "লছমা" ("অপূর্ব-মিলন" নামে 1901 খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও "লছমা" নামে 1914 খ্রীষ্টাব্দে পুস্তাকারে প্রকাশিত) ছাড়া অন্য তিনটি উপন্যাস ওড়িষ্যার জনজীবন ও সামাজিক প্রবাহের আধারে রচিত। সামগ্রিকভাবে চারটি উপন্যাসেরই অন্তঃরূপ অনুশীলন করলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ফকীর মোহনের সন্ধানী শিল্পদৃষ্টিতে মোগল, মারাঠা ও ইংরেজ শাসনের সুফল ও কুফলের বাহক ওড়িষ্যার দীর্ঘ দুই শ' বৎসরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের রসভাষ্য তাঁর উপন্যাসগুলির বিভিন্ন চরিত্র-মাধ্যমে বিধৃত। অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার জীবন-বিদ্যালয়ে বেড়ে উঠেছিলেন ফকীর-মোহন; তাঁর সারস্বত প্রতিভার খাঁটি উৎকলীয় পরিবেশ; জীবন্ত লৌকিক ভাষার রসাল শৈলীর সাহায্যে মানুষের সাহায্যে মানুষের দ্বৈতরূপ—অর্থাৎ দেবতার শুভমূর্ত্তি ও শয়তানের কুৎসিত চেহারার চিত্র তিনি প্রাণবন্তভাবে এঁকেছেন; মানবিকতার মৌলিক আবেগের সঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রের প্রতি করুণা ও সহানুভূতিরও সঞ্চার হয় পাঠকের মনে। এ সবই তাঁকে উদার মানববাদী এক শিল্পী হিসাবে চিরকালের জয়মাল্য দিয়েছে। জীবনের গভীর বাস্তবতার সঙ্গে উন্নত আদর্শ-চেতনা, গভীর জীবননিষ্ঠার সঙ্গে উদার মানবপ্রীতি তাঁর সৃষ্টির অন্তঃপুরের কেন্দ্রবিন্দু। আধুনিক কথা-

শিল্পীদের আদিগুরু ফকীরমোহন যথার্থই আধুনিক শিল্পচেতনারও অগ্রদূত। তাঁর শেষ উপন্যাস "প্রায়শ্চিত্তে"র মৌলিক প্রশ্ন—"টাকা ছড়ালে কী না পাওয়া যায়?" ফকীরমোহনের সাবধান বাণী—"যে পাপের আশ্রয় নিয়ে সভ্যতা উত্তরোত্তর বাড়তির পথে, সেই পাপের জন্যই সভ্যতা চাইছে ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত? —এ শুধু সেকালের ত্রুটি নয়, আধুনিক যুগ ও জীবনের ক্ষেত্রেও এ বাণী সমভাবে প্রযোজ্য। এতে জীবনের লক্ষ্য ও তা'র সাধন পথের প্রশ্নও জড়িত। এই কথাশিল্পীর অমরকৃতি "ছ' মান আট গুণ্ঠ" 1898 খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; উপন্যাসটির চরিত্রচিত্রণ ও রচনাশৈলী একে ওড়িয়া উপন্যাস-সাহিত্যে এক অননুকরণীয় কালজয়ী ক্ল্যাসিকে পরিণত করেছে।

ফকীরমোহনের অনন্য প্রতিভা ও শিল্পসৃষ্টির সেই সমৃদ্ধ যুগে এক স্মরণীয় ব্যতিক্রম—ঔপন্যাসিক গোপালবল্লভ দাসের লেখা, ওড়িষ্যার আদিবাসীদের জীবনরসাশ্রয়ী উপন্যাস "ভীমভূয়া" (1908)। "পদ্মমালী"র মত এই উপন্যাসের প্রাণকেন্দ্র—রোম্যান্স। কিন্তু লেখক এতে প্রকৃতির আরণ্যক সন্তান এক আদিবাসী ভূয়াঁ যুবক ও অভিজাত অন্তঃপুরে পালিতা এক রাজপুত্রীর মধ্যে গভীর প্রণয় পরিকল্পনার যে মার্মিক চিত্র এঁকেছেন, গতানুগতিক প্রণয় চেতনার পশ্চাতপটে তা নিশ্চিত এক সাহসিক পদক্ষেপ এবং লেখকের মৌলিক তথা রোম্যান্টিক্ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। চরিত্রগুলির তুলনায় কিন্তু এই উপন্যাসের আখ্যানভাগ, পরিবেশের সাবলীল বর্ণনা ও বাস্তবতার চিত্রণ তত বলিষ্ঠ ও আকর্ষণীয় নয়। লেখকের মধ্যযুগীয় কাব্যধর্মী বর্ণনা ও আলংকারিক ভাষাপ্রয়োগ উপন্যাসের কথা-প্রবাহকে শিথিল ও নিরুত্তাপ করে। তবুও, সারস্বত রুচিক্ষেত্রে লেখকের এই সাহসী পদক্ষেপ সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় ও সম্মানিত। এই লেখকেরই প্রথম সংকেতের সম্ভাবনার সূত্র ধ'রে পরবর্ত্তী কালে ওড়িষ্যার আদিবাসী, জীবন, সমাজ ও চরিত্রের অন্তরঙ্গ রূপকার হিসাবে দেখা দিয়েছেন 'প্রতিষ্ঠাবান্ ও সিদ্ধহস্ত বর্ত্তমান লেখক গোপীনাথ মহান্তি।

ফকীরমোহনের সৃষ্টির পরবর্ত্তীকালে ওড়িয়া উপন্যাস বহুমুখী জীবন বৈচিত্র্যে বিশিষ্ট; বিষয়বস্তু ও বিন্যাসের ক্ষেত্রেও নানাভাব ও বৈভবে সমৃদ্ধ। এই সব কারণে তা'র যাত্রাপথ প্রশস্ত ও জয়যুক্ত। বিংশ শতাব্দীর ভাবাদর্শ তথা আন্তর্জাতিক শিল্পচেতনার

সঙ্গে ওড়িয়া কথাশিল্পীর নিবিড় পরিচয় ও যোগাযোগের ফলে ওড়িয়া উপন্যাসে ক্রমশঃ সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার অবতারণা, মানুষের দ্বৈত-ব্যক্তিত্বের চিত্রের সঙ্গে জটিল মনগহনের বিভিন্ন বিরোধাত্মক প্রবৃত্তির বিজ্ঞান-সম্মত বিশ্লেষণ, পল্লীভিত্তিক সংস্কৃতির সঙ্গে যন্ত্র-সভ্যতার সংঘর্ষজনিত মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও পরিবর্ত্তন এবং এই সব উপাদানে তৈরী পশ্চাৎপটে এক স্থির, অচঞ্চল মানবিক প্রত্যয়ের অনুসন্ধানের আলেখ্য দেখা যায়। ফকীরমোহনের যুগ থেকে আরম্ভ করে সাম্প্রতিক কাল পর্য্যন্ত উড়িয়া সাহিত্যের বহু কাব্যশিল্পী (চিন্তামণি মহান্তি, নন্দকিশোর বল, কুন্তলাকুমারী সাবত, কান্ত-কবি লক্ষ্মীকান্ত, গোদাবরীশ মিশ্র, গোদাবরীশ মহাপাত্র, প্রাণকৃষ্ণ সামল, মায়াধর মানসিং, জ্ঞানীন্দ্র বর্মা ও সচ্চিদানন্দ রাউতরায় প্রভৃতি) উপন্যাস-রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। কিন্তু নন্দ-কিশোরের প্রণয়ধর্মী ও সংস্কার-চেতনা-সম্বন্ধীয় উপন্যাস "কনক-লতা" (1925) সচ্চিদানন্দ রাউতরায়ের বস্তুবাদী ভাবাদর্শ ও সামাজিক অভ্যুদয়ের স্বপ্নসম্পকিত ব্যঙ্গধর্মী উপন্যাস "চিত্রগ্রীব" (1936) এবং কান্তকবি লক্ষ্মীকান্তের বৈপ্লবিক মানবতার বার্ত্তাবাহী উপন্যাস "জহ্নমামু" (1932-51)—এগুলিকে বাদ দিলে অন্য কোনও কাব্যশিল্পীর উপন্যাস পাঠকের সাময়িক শ্রদ্ধার পাত্র হয়ত হয়েছে, কিন্তু তা শিল্পসিদ্ধির দিক থেকে কলাবিচারের কষ্টিতে মহাকালের গৌরবতিলক ধারণে সমর্থ বলে মনে হয় না। অন্য দিকে কাব্য কবিতার ক্ষেত্রে স্বকীয় সৃজন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেও ঔপন্যাসিক-রূপে যাঁরা ওড়িয়া সাহিত্যে প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের মধ্যে কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী (মাটির মনিষ, লুহার মনিষ, মুক্তাগড়র ক্ষুধা, অমর চিতা প্রভৃতির লেখক) ও নিত্যানন্দ মহাপাত্র (জীয়ন্তা মনিষ, বিড়মাটি, ভঙ্গাহাড়, জীবনর লক্ষ্য প্রভৃতির রচয়িতা)—এই দু'জনের নাম উল্লেখযোগ্য। উচ্চাঙ্গের মানবিক মূল্যবোধ ও আত্মিক আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত কালিন্দীচরণের পল্লীজীবনাশ্রয়ী "মাটির মনিষ" এবং ত্যাগচেতনাশ্রয়ী প্রণয়ের বেদনা-বোধ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আধারে লিখিত নিত্যানন্দের "জীয়ন্তা মনিষ" ওড়িয়া উপন্যাস-সাহিত্যে দু'টি স্মরণীয় সৃষ্টি। কালিন্দীচরণের "মাটির মনিষে'র সঙ্গে ওড়িয়া সাহিত্যের "সবুজ" গোষ্ঠীর বহু শিল্পীর মিলিত উদ্যমে রচিত সহর-জীবনাশ্রয়ী, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস "বাসন্তী"-ও

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখযোগ্য। এরা ছাড়া যে সব কুশলী কথাশিল্পী ওড়িয়া উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে বৈষ্ণবচরণ দাস (মনে মনে), উপেন্দ্রকিশোর দাস (মলা জহ্ন), দিব্যসিংহ পাণিগ্রাহ (তু' মোমা), রাজকিশোর পট্টনায়ক (চলাবাট), কমলাকান্ত দাস (বউ), হরেকৃষ্ণ মহতাব (প্রতিভা), লক্ষ্মীধর নায়ক (হে মোর দুর্ভাগা দেশ), অনন্তপ্রসাদ পণ্ডা (কুলি), রামচন্দ্র মিশ্র (নাটকা চিত্রকর), বসন্ত কুমারী পট্টনায়ক (অমডা বাট), বামাচরণ মিত্র (চন্দ্র ও চম্পা), সুরেন্দ্র মহান্তি (অন্ধ দিগন্ত ও নীলশৈল), চন্দ্রশেখর রথ (যন্ত্রারূঢ়), শান্তনুকুমার আচার্য্য (নরকিন্নর), মহপাত্র নীলমণি সাহু (তামসী রাধা), গোবিন্দ দাস (অমাবস্যার চন্দ্র) হরিহর বাহিনীপতি (কারার মনিষ) ও বিভূতি পট্টনায়ক (চপলা ছন্দা) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের অনেকে একাধিক উপন্যাসের লেখক হ'লেও, যেগুলি কলাবৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্যের দিক দিয়ে প্রতিনিধি-স্থানীয় সৃষ্টি-প্রতিভার স্মারক, শুধু সেই উপন্যাসগুলির নাম বন্ধনীর মধ্যে উদ্ধৃত।

যে দু'জন যশস্বী স্রষ্টার নামে ওড়িয়া উপন্যাস সাহিত্য আজ গৌরবান্বিত, সৌভাগ্যক্রমে তাঁরা দুই ভাই--অগ্রজ কাহ্নুচরন ও অনুজ গোপীনাথ মহান্তি; গত প্রায় চার দশক এঁদের অবিশ্রান্ত লেখায় ওড়িয়া উপন্যাসের-গুণগত ও পরিমাণগত উন্নতি ঘটেছে। এঁদের কলাসৃষ্টিতে আছে—সমাজ-চেতনার প্রাঞ্জল অভিব্যক্তি, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, মানবিক মূল্যবোধের বিপর্য্যয়জনিত অসহায়তা ও আত্মগ্লানি, পারিপার্শ্বিকের সফল রূপায়ণ, উচ্চকোটির চরিত্রসৃষ্টি ও গভীর জীবনবোধ আর তা'র সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট জীবনপ্রত্যয়ের সাঙ্কেতিক অন্বেষণ। কাহ্নুচরণের সৃষ্টিসম্ভারের মধ্যে "হাঅন্ন", "শাস্তি" "অদেখা যাত্তি", "ঝঞ্ঝা", "তুণ্ডবাইদ", "কা", "পরি", "শর্বরী", "তমসাতীরে" প্রভৃতি জীবন-বৈচিত্র্য ও কলাত্মক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ; তেমনি গোপীনাথের বিপুল কলাকৃতির প্রতিনিধি-স্থানীয়—"পরজা", "অমৃতর সন্তান", "দাদিবুঢ়া", "শিবভাই", "অপহঞ্চ", "হরিজন", "দানাপানি" "লয়বিলয়", "রাহুর ছায়া", "মাটিমটাল" প্রভৃতি। বস্তুতঃ জীবনবোধের ব্যাপকতা; বৈচিত্র্য ও গভীরতার শিল্পসংগত অভিব্যক্তি এবং জীবন্ত ও উন্নত পর্য্যায়ের চরিত্রচিত্রণের দিক থেকে ঔপন্যাসিক গোপীনাথ মহান্তি নিজের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম স্রষ্টারূপে আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যে

সম্মানিত। সম্প্রতি তাঁর "মাটি মটাল" উপন্যাসের জন্য 1973 খ্রীষ্টাব্দের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ভারতীয় উপন্যাসে তাঁর স্থান সাদরে চিহ্নিত করেছে।

ওড়িশার আদিবাসী জীবনের সকল আশা-আকাঙ্খা ও সাংস্কৃতিক প্রত্যয়ের বিশ্বস্ত চিত্রের সরস ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশ—গোপীনাথের "পরজা", "অমৃতের সন্তান", "দাদিবুঢ়া", "শিবভাই", "অপহঞ্চ" প্রভৃতি উপন্যাসে; পাঠান্তরে এ বস্তু অন্যত্র দুর্লভ; এ দিকে গোপীনাথের প্রতিভা একক ও অনন্য। দেশের হরিজন জীবন নিয়ে লেখকের "হরিজন" উপন্যাস—চরিত্র ও বর্ণনার স্বাভাবিকতা এবং কলাকুশলতার দিক দিয়ে ভারতীয় সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র মর্য্যাদার অধিকারী। এই লেখকের "দানাপানি", "লয়বিলয়", "রাহুর ছায়া", "মনগহীরর চাষ", "মাটিমটাল" প্রভৃতি উপন্যাসে পাঠক পেয়ে যান আধুনিক জীবন সংগ্রামের যন্ত্রণা-জর্জর স্পর্শের সঙ্গে যুগবেদনাসমন্বিত আধুনিক মানসের অন্তর্দ্বন্দ্ব, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সংগ্রামের মার্গে এক স্থির প্রত্যয়ের শান্তভূমিতে উত্তরণ প্রয়াসী জীবনদর্শনের অনুভূতি। গোপীনাথের "পরজা" (1946), "অমৃতর সন্তান" (1949) ও "মাটি-মটাল" (1964) উপন্যাসত্রয়ী বৃহত্তর মানবজীবনের চিত্রবহ মহাকাব্যিক (epic) উপন্যাসের পর্য্যায়ে উন্নীত। বস্তুতঃ গোপীনাথই ওড়িয়া সাহিত্যে মহাকাব্যিক উপন্যাসের প্রথম ও সফল স্রষ্টা। নিজস্ব শিল্পলোকে এই লেখক সর্বদা সচেতনভাবে পরীক্ষারত এবং সেজন্য তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাস ভিন্ন রুচি ও স্বাদে যেমন স্বতন্ত্র তেমনি চিত্তাকর্ষক। "পরজা" ও "মাটি-মটাল" উপন্যাস দু'টি লেখকের সৃষ্টি-প্রতিভার সর্বোত্তম কীর্ত্তিরূপে গণ্য হ'লেও "দানাপানি" (1955), "হরিজন" (1948), "লয়বিলয়" (1956) ও "রাহুর ছায়া" প্রভৃতি উপন্যাস পরিবেশের খণ্ডিত পরিধিতে জীবনের পূর্ণাঙ্গ অথচ সাবলীল চিত্ররূপে স্রষ্টার সৃজনীপ্রতিভার অম্লান জ্যোতিতে ভাস্বর। "দাদিবুঢ়া" (1938) উপন্যাস থেকে শুরু করে "মাটিমটাল" (1964) পর্যন্ত স্রষ্টামানসের সুদীর্ঘ যাত্রাপথের ইতিহাস তাঁর বহু উপন্যাসে লিপিবদ্ধ। স্বদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি সচেতন তাঁর প্রতিভা দেশ ও কালাতীত। মানুষের চরিত্র চিত্রণে নিজস্ব জীবননিষ্ঠা ও মানবপ্রীতির অভ্রান্ত পরিচয়ে সর্বদা প্রোজ্জ্বল। লেখকের নিজের ভাষায়—"এই মানুষ—সে যে কোনও বর্ণে ও যতদূরেই থাক না কেন, তা'তে ও আমাতে বহে একই রক্তের

ধারা।" তাই তাঁর সৃষ্টিলোকে সমালোচক লক্ষ্য করে বিভিন্ন কালে—আধুনিক উপন্যাস রচনার বিভিন্ন পরীক্ষাধর্মী পদ্ধতির সঙ্গে বাস্তববাদ, স্বভাববাদ, স্থিতিবাদ বা চেতনা-প্রবাহের দার্শনিক অবস্থিতি। কিন্তু এ সবের উর্দ্ধে, ওড়িয়া উপন্যাস সাহিত্যে তিনি এক চিরায়ত স্রষ্টার সম্মান ও কৌলীন্য পেয়েছেন তাঁর রসোত্তীর্ণ জীবনভাষ্য ও মানবপ্রীতির মাধ্যমে।

শব্দশিল্পের ঐন্দ্রজালিক কারিগর এই লেখক। প্রকৃতি ও পরিবেশের বর্ণনা, নির্দ্দিষ্ট ভাবমুকুলের প্রস্ফুটন, মনুষ্যমনের আদিম ও আরণ্যক অনুভূতির অভিব্যক্তি—সবেতেই এই নিপুণ শব্দশিল্পী সফল ও সিদ্ধহস্ত; তা'রই সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমনে তিনি জাগিয়ে তোলেন কাব্য প্রতিভার এক অশ্রুত সংগীতের সম্মোহনী মূর্চ্ছনা। বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতা তাঁর শিল্পসৃষ্টির মৌলিক লক্ষণ; পারিপার্শ্বিক জীবনমঞ্চ থেকে আহৃত হ'লেও এমন অনেক নরনারী তাঁর চরিত্রসৃষ্টির চালচিত্রে দেখা যায়, যারা তাঁর প্রতিভার যাদুস্পর্শে চিরকালীন কলাকান্তি ও স্বকীয় সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল। উপন্যাস ও গল্প—উভয়ত্র, ফকীরমোহনের মত তিনিও সব্যসাচী ও সিদ্ধহস্ত।

"দানাপানি"র প্রকাশন 1955 সালে; বাস্তবধর্মী এই উপন্যাসের কথাবস্তু আধুনিক জীবনসংগ্রামে দ্রষ্টব্য। দানাপানির তীব্রদ্বন্দ্ব অর্থাৎ চাকরীক্ষেত্রে পদোন্নতির সমস্যাতে কেন্দ্রীভূত। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র 'বণ্'র মুখে লেখক বলেছেন—"আহা, খালি দানাপানির কাজিয়া রে, খালি দানাপানির কাজিয়া—ভাঙা সানকিতে মুঠোখানেক ভাত—তা'রই জন্য"—। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সাফল্য কামী" ও "যোজনাবাদী" বলীদত্ত তা'র কোম্পানী-চাকরীর পদোন্নতি ও সাফল্যের জন্য নিঃসঙ্কোচে নিজের বিবেক ও মানবিকতাকে বিকিয়ে নৈতিকতার সোপান থেকে কিভাবে ক্রমশঃ স্খলিত হয়েছে, শেষে নিজের স্থিতি প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনযজ্ঞে স্ত্রী সরোজিনীর সতীত্বকেও বিনা দ্বিধায় আহুতি দিয়েছে—তা'রই অসহায় ও করুণ কাহিনী "দানাপানি" উপন্যাস। লেখকের ভাষায় "বলীদত্ত অখ্যাত কোন গলিধূলির অজ্ঞাত মানুষ, বলিয়া; কিন্তু তা'র সংস্থিতি দরকার।" মানুষের এই দানাপানির সংস্থানই উপন্যাসটির মৌলিক সমস্যা; সেটাই ভিত্তি করে আধুনিক শিক্ষিত জীবনে দানাপানি সংগ্রামের বিভীষিকার স্বরূপ প্রকাশ করেছেন গোপীনাথ। এই সংগ্রামে মানুষ তা'র শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও নীতিবোধকে জলাঞ্জলি

দিয়ে নিজের 'অহং'কে চরিতার্থ করার জন্য কত ব্যগ্র ও অগ্রসর এবং অন্যের প্রতি অসূয়াকাতর—তারই বাস্তব অথচ শিল্পসঙ্গত রূপায়ন এই উপন্যাসে। এতে সামান্য চাপরাসী থেকে আরম্ভ করে কোম্পানীর অফিসার, বড় সাহেব পর্য্যন্ত সকলের চরিত্রের অন্তরূপ, অনীতি ও মানসিক শোষণের প্রবৃত্তি লেখকের সন্ধানী দৃষ্টিতে প্রোজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত।

"দানাপানি" অসংখ্য চরিত্রের মনোজ্ঞ চিত্রশালা। এখানে "দানাপানিরর খুদ-কুঁড়ো কুড়োতে" সত্যিই যেন বহু মানুষের বিরাট শোভাযাত্রা প্রতিযোগিতায় নেমেছে। লেখক তন্ময় অথচ নিরপেক্ষ-ভাবে তা'দের চালচলন ও চিন্তাভাবনার ভিতর দিয়ে কথাবস্তুর বাহ্যিক ও আভ্যন্তর দ্বন্দ্ব সাফল্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। এক দিক দিয়ে "দানাপানি"র চরিত্রগুলি প্রতিনিধিমূলক (Type character); তবুও নিজ নিজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে স্বকীয় রসদীপ্তিতে সেগুলি সমুজ্জ্বল; প্রত্যেকেই যেন এক এক সৃষ্টিতে রূপান্তরিত। আধুনিক সমাজসংস্থার একটি নির্দিষ্ট অংশের পরিপ্রকাশের উদ্দেশ্যে চরিত্রগুলি পরিকল্পিত। তবুও মানবিক প্রবৃত্তির মৌলিক অভি-ব্যক্তির দিক দিয়ে, সেগুলি সামগ্রিক জীবন—বোধের ও মানব মনের দোষদুর্বলতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। তাই বলীদত্ত থেকে শুরু করে মিষ্টার শা', শর্মা, রণজিত, সাকলাতওয়ালা, বড়বাবু, বণ্, সুন্টু'দা, এংকট্রাও, উমেশবাবু, গোপালবাবু, কনষ্টেবল রাজ, চাকর মিতিয়া, হর্ষ, নন্দ প্রভৃতি অসংখ্য পুরুষ চরিত্র এবং সরোজিনী থেকে শুরু করে রামবাবুর স্ত্রী, মিলি ও নিলি পর্য্যন্ত বহু নারী চরিত্রের প্রতি পাঠকের প্রীতি, করুণা ও সহানুভূতির সঞ্চার করতে লেখক সমর্থ হয়েছেন নিজের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে বলিষ্ঠ স্বধর্মের সমন্বয়ের মাধ্যমে।

ফকীরমোহনের "প্রায়শ্চিত্তে"র মত এখানেও উদ্দেশ্য ও উপায় তথা লক্ষ্য ও সাধনপথ সম্বন্ধে প্রশ্ন সোচ্চার। কিন্তু "দানাপানি"র চালচিত্র—বেশী বিস্তীর্ণ ও যুগাশ্রয়ী; শিল্পসাফল্যের দিক থেকেও বেশী রসোত্তীর্ণ ও জীবননিষ্ঠ। "উদ্দেশ্য অনুযায়ী উপায়"—এই নীতির অনুসরণ ছিল ও বলীদত্তর একমাত্র লক্ষ্য; তার, উপায় নিজেই নিজের উদ্দেশ্যে" পরিণত হয়েছিল; সেই বলীদত্ত তা'র পদমর্য্যাদার চরম পর্য্যায়ে পিতৃত্বের আত্মশ্লাঘাতে যখন উন্মাদ, তখন তাকে লক্ষ্য করে লেখক বলছেন—"বংশধরের অভাবে ধনের

ছিল না উদ্দেশ্য, নামেরও ছিল না লম্বা হওয়ার জোর।" এখন বলীদত্ত তা'য় সর্বরূপে এক অনুভূতির অধিকারী বটে, কিন্তু শেষে "দানাপানির মূল্যমানে সাক্ষ্য খুঁজতে খুঁজতে তা'র দিনরাত পার হয়ে যাচ্ছে" এবং তা'র "নিজের দেহে লাগাতার দাহ"। এখানেই বলীদত্ত চরিত্রের করুণ পরিণতি। অন্যদিকে নায়িকা সরোজিনীর চরিত্র :—"সে নারী ; সে ভাত পেয়েছে, পরনের কাপড় পেয়েছে গয়না পেয়েছে—তা কি সব পাওয়া ?" নারীত্বের মৌলিক দাবীর এই চিরন্তন প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে জীবনে সে এগিয়েছে এবং শেষে অন্যের চোখে সে—চরিত্রহীনা, স্খলিতা হ'লেও আপনার রূপে পরিপূর্ণা ও ফলবতী। দাবার সন্ধানে জীবনের গতিপথে সে বহু দ্বন্দ্বের মুখোমুখী ; তা'র মানসিকতার রূপান্তর ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তা'র ব্যক্তিত্ব পেয়েছে—"অনাগত পুনর্জন্ম"। তাই লেখক বলেছেন—"আজ শামুকে পড়েছে রূপকথার বর্ষাবিন্দু, শামুকের মুখ বন্ধ......... ক্ষেত্র পেয়েছে বীজ, ক্ষিতি পেয়েছে অঙ্কুরের উষ্ণতা, প্রতীক্ষার পরে পেয়েছে প্রকাশ। গর্ভাধানের আনন্দে গরবিনী মাটি পরিচয় খোঁজে নি বীজের ; সে পরিপূর্ণা—এটুকু পরিচিতিই যেন যথেষ্ট"। এ সরোজিনী এখন মরমী পাঠকের কাছে আর ঘৃণ্যা বা পতিতা নয় ; বরং তা'র নারীত্ব ও মাতৃত্বের দাবীতে, তা'র আফশোষের অবসানে ও পূর্ণতার বিজয়গর্বে সে সম্মানিতা ও স্নেহাস্পদা। তা'র অফুরন্ত মাতৃরূপা "নারীর তৃষ্ণা"র প্রতি পাঠক করুণাকোমল ও সংবেদনশীল।

বিভিন্ন চরিত্রসৃষ্টির সঙ্গে যুগ ও জীবনের চলন্ত চিত্রকে জীবন্ত ও বাঙ্ময় করতে লেখক বহুস্থানে নিজের দৃষ্টিভঙ্গী ও নির্দিষ্ট প্রত্যয়ের পরিচয় দিয়েছেন। লেখকের ভাষায়—"এ দুনিয়া যা হয়েছে, লেখাপড়াশেখা তোমরা বাবু যা হয়েছ—তা'তে নিঃশ্বাসের ভারী অভাব। আনন্দের বীজই নাই, তা বানানোর শক্তিও নাই"। কিংবা "পেটেন্ট্ মেডিসিনের বিজ্ঞাপনের মত—পেটেন্ট আইডিয়াজ-এর দৌরাত্ম্য ছেয়ে গেছে দুনিয়ায় ; তাই হাজার চেষ্টাতেও পৃথিবী সভ্য হচ্ছে না, সংসার থেকে বিদেয় হচ্ছে না যুদ্ধ, অশান্তি"। অথবা "উপায় মনে করে যা আশ্রয় করছে মানুষ, তা-ই হয়ে ওঠে নিজে নিজেরই উদ্দেশ্য ; মানুষের কাজ সেই পাথরের চাকার নীচে বুক পেতে দেওয়া....অথচ তা হোল ঠাণ্ডা পাথর, তা যন্ত্রবিশেষ—থোড়াই খাতির করে মানুষের রক্তমাংসের দেহের জন্য, তা'র নরম মনের মর্মকাহিনীর জন্য ? চাকা পিষে দলে চলে এগিয়ে ; শুষে

খায় আয়ুর পরে আয়ু"। আধুনিক রুগ্ন ও যান্ত্রিক জীবনের বিকল আত্মঘাতী রূপটি এ সব চিন্তাধারার মধ্যে মূর্ত্ত; আজকের ব্যাধিগ্রস্ত যুগ ও জীবন এরই মধ্যে এবং একই সঙ্গে লেখক মানবাত্মার নবজন্মের জন্য সৃজনের সঙ্গীত ও চেতাবনী শুনিয়েছেন। বস্তুতঃ, সামগ্রিক ও সর্বকালের মানবচেতনার গভীরতা ও তাৎপর্য্যের দিক থেকে "দানাপানি" একটি আংশিক চিত্র হলেও আধুনিক যন্ত্রধর্মী ও যন্ত্রণাজর্জর জীবনের এটি এক বস্তুনিষ্ঠ, সফল ও পূর্ণাঙ্গ রসভাষ্য। অত্যুক্তি হবে না যদি বলা যায় যে, ওড়িয়া উপন্যাসের বিকাশধারায় এটি কলাত্মক রসোত্তীর্ণতায় নিজস্ব এক স্বতন্ত্র ও সম্ভ্রান্ত আসন সংরক্ষিত করেছে।

—চিন্তামনি বেহেরা

মেটে রাস্তায় হেঁটে চলেছে বলিদত্ত, সেই পাড়া দিয়ে—যেখানে সারি সারি শুয়োরের খোঁয়াড় ; শুয়োরের গু' তার চাইই ; নিজের জন্য নয়, সায়েবের জন্য ; সায়েবের বাংলোয় দরকার। বলিদত্তের সঙ্গে আছে মজুর ; তার কাঁধে ঝোলানো বাঁকের দুই প্রান্তে দু'টো ঝাঁকা।

"এই গোলাপ গাছগুলোর গোড়ায় ক' মুঠো শুয়োরের গু' দিলে ফুল বেশ ভাল হয়," মেমসায়েব বল্‌ছিলেন মালীকে, "গোলাপে শুয়োরের গু', ক্যানায় ঘোড়ার গু' ; তা'ছাড়া প্রচুর জল"।

বলিদত্ত মালী নয় ; এক ব্যবসাদার কোম্পানীর ছোক্‌রা কর্মচারী সে।

সকালেই গিয়ে কাজ করে করে বেলা বারোটার সময় সায়েবের নন্দনকাননের ধার দিয়ে নিজের বাসায় ফেরার সময় মালীর ওপর মেম্‌সায়েবের এ ফর্মাস্ সে শুনেছিল ; তারপর গায়ে পড়ে সে নিজেই ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা করেছিল "শুয়োরের গু' চাই ? এনে দেব যার যত চাই। এই আমি চল্‌লাম।"

মেম্‌সায়েবের ঠোঁটের কোণে খেলে গিয়েছিল স্মিত হাস্য। সেইটুকু সম্বল করে, মজুর জোগাড় করে বলিদত্ত চলেছে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে, পরণে স্যুট, টাই আঁটা, রোদ্দুরে সেদ্ধ হওয়ার জোগাড়, সকালে পেটে পড়েছে ক'মুঠো পান্তা, তা'ও জল হয়ে গেছে এতক্ষণে। ময়লা রুমাল বের করে যতই ঘাম মুছছে, তবুও তা' বইছে দর দর করে। নোংরা পাড়ার দুর্গন্ধ আঁস্তাকুড় ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে সে সংগ্রহ করে চলেছে শুয়োরের গু'। এত পরিশ্রমেও একটা জয়ের আশা মাঝে মাঝে তা'কে অধীর করছে ; বলিদত্ত দেখছে স্বপ্ন।

"অনেক হোলো, আজ্ঞে ; ঝাঁকা ত ভর্তি। আর কেন ?" মজুরটি বললো।

"যাঃ যাঃ, হোলো কৈ ? মন্দিরের মত উঁচু চূড়ো করে নিয়ে

যেতে হবে ; দেখিস্ নি, কত গোলাপ গাছ ?"

মজুরটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো ; রোদ্দুরে সে হয়রান হওয়ার দাখিল। ঘামে সট্‌সটে তা'র পিঠে হাত চাপড়ে তা'কে ফুস্‌লাবার জন্য নরম গলায় বলিদত্ত বল্‌লো "মজুরী ত পাবি, পিছোচ্ছিস কেন তবে ? চল্ ভাই, চল্ না ?"

বোঝা নিয়ে ফেরার সময়, সাইকেল চড়ে যাচ্ছেন মহাপাত্র মশায়। মহাপাত্র স্যুট-পরিহিত, কোম্পানীর এক বড় কর্মচারী।

"কি হে বলিদত্ত বাবু, এই রোদ্দুরে, কোথায় ?"

মহাপাত্র সাইকেল থেকে নামলেন ; বলিদত্ত প্রমাদ গনল। অনেকবার মহাপাত্র তা'র পিছু নিয়েছেন ইতিপূর্বে—খবর নিংড়ে নেবার জন্য।

"কি ব্যাপার ? সব ভাল ত ?"

"আজ্ঞে, চলে যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ, আমি যা লিখে পাঠিয়েছিলাম, সায়েব তা'র ওপর কি লিখল ?"

"সায়েবের কাছ থেকে এখনো ফেরে নি, আজ্ঞে। আমি কি করে জানব ?"

"আজ সকালে আমি গিছলাম, বুঝলে বলিদত্ত বাবু ; সায়েব যে কত ভাল, জান ত' ? বললে—'বসুন'। 'বসুন' বললে ; আর নিজের সিগারেট কেস থেকে বের করে একটা সিগারেট দিলে। অগত্যা তা টানতে হোল ; আমি ত' আশ্চর্য !"

"আজ্ঞে আপনি ত' আর আমাদের মত নন। এ সায়েব কোন্ গুণে আপনার সমান ? বিদ্যেয়, না কাজে, না কিসে ? শুধু গোরা কোম্পানীর সাদা চামড়াওয়ালা লোক চাই—এই ত ! জেনে রাখুন, এই চোখে দেখব—আপনি আসবেন আমাদের সায়েব হয়ে। কোম্পানীর শেকড়'ত কোন্ দরিয়া পাড়ে, আপনিই চালাবেন এই ডিপো।"

"নাও হে, একটা পান খাও ; কিন্তু হুঁশিয়ার, কড়া দোক্তা।"

"আজ্ঞে, আপনার পান ; ব্যাঙের পেটে কি ঘি সইবে ?"

"আরে, খাওই না ; ছোক্‌রা বয়েস। আমার না হয় এখন চালশে ; তোমাদের মত যখন পঁচিশ ছাব্বিশ ছিল, আমি যা খেতাম না ?—শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে।"

ইনি শোনাবেনই, রেহাই নেই। ওদিকে মেমসায়েব হয়ত কোথায়

বেরিয়ে যাবেন, দেখতে পাবেন না যে বলিদত্ত বাঁক্ বোঝাই করে এনেছে।

রাস্তা আটকে বাঁকওয়ালা দাঁড়িয়ে পড়েছে ততক্ষণে; কিছু বলাও যায় না।

"যা, যা, রাস্তা আটকালি কেন?" বলিদত্ত তা'কে বললে।

"ও সব কি হে বলিদত্ত বাবু?"

"আজ্ঞে, একটুকু শাকের ক্ষেত করেছি; তা'ই একবাঁক সার নিয়ে যাচ্ছি।"

"কতয় পেলে? আরে, আমি ত একফালি বেগুন ক্ষেত করেছি; তা পাতাগুলো হলদে হয়ে যাচ্ছে। সার পাচ্ছ কোথা থেকে? ওরে বাঁকওলা, দু'বোঝা আমার বাসায় দিয়ে আসিস, বুঝলি?"

স্বর্গে যাওয়ার সিঁড়ি নেই; বড়লোকের কথার উত্তর নেই!

বলিদত্তের সারা মুখ বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে দর দর করে; থুতু গিলতে গিলতে সে বললো "আজ্ঞে, সে কথা আর বলতে! আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব।...সায়েব আপনার ওপর সবচেয়ে খুশী, আজ্ঞে।"

"তুমি কি করে জানলে? কেউ বল্‌ছিল নাকি? কি লিখেছে, দেখেছ তাহলে? —এঁ্যা, বল না হে। আঃ, রোদ্দুরটা বড় কড়া। এস না, যাওয়া যাক আমার বাসায়। হুঁ, তুমি ধুরন্ধর দেখছি; এস হে বলিদত্তবাবু, আমার বাসায়।"

"আপনি নিজেই জান্‌তে পারবেন, আজ্ঞে, শুধু এ গরীবের জন্য মিঠাই রেখে দেবেন। সায়েব ফের কেন ডেকেছে, তাই ভারী তাড়াতাড়ি আছে, আজ্ঞে..."

"আচ্ছা, তা হলে যাও। তুমি ভারী চৌকস বলিদত্তবাবু; ছোকরা বয়সে এত দায়িত্বজ্ঞান আমি খুব কম দেখেছি। যা হোক্, মোটামুটি সব ভাল তা হলে, না? সেইজন্য সিগারেট দিল, আমি ত আশ্চর্য! কই, কাউকে ত' সে এমন করে বলে না। বুনো জানোয়ারকে পোষ মানানো বড় কষ্ট।"

বলিদত্ত মুচকি হাসি হাসছে। এ হাসি পরের মনে অঞ্জন বুলিয়ে দেয় যেন, নিজে থেকেই আসে। মহাপাত্র মশায় সিগারেট পাওয়ার বিজয়বার্তা প্রচার করতে সাইকেল চড়ে সাঁ করে উধাও। বলিদত্ত মনে মনে তা'কে গাল পাড়তে পাড়তে হাঁটছে।

বাঁহাতি একটা স্কুল; তোরণশোভিত গেট। আজ বিকেলে

এখানে উৎসব হবে, সায়েব আসবেন। সায়েবের উদ্দেশে গাইবার জন্য তরুণ শিক্ষক অরুণবাবু ছেলেদের গানের মহড়া নিচ্ছেন—

"জনগণমন অধিনায়ক জয় হে——"

বলিদত্ত বিরক্তভাবে চেয়ে দেখল ; মনে হল—এ বাঁদরামি। মনের গভীরে ঈর্ষার রাগ, এমন সুবিধা তা'র নিজের নেই। সচেতন মনে এখন সে খাঁটি স্বদেশী—এ কি অপমান, অরুণবাবু কাণ্ডজ্ঞান খুইয়েছেন নাকি ?

"আরে বলিদত্ত বাবু যে—"

"আচ্ছা অরুণবাবু, সায়েব কি ভাববেন বলুন ত' ? আপনি কি যে, সত্যি..."

"বুঝ্ছেন না, এ যেন এক ঢিলে দুই পাখী। সায়েব ঠিক বুঝ্বেন। কত বড় তিনি—ভারত ভাগ্যবিধাতা। আবার বাইরের লোক খুশী হবে তাদের সেই প্রিয় গান শুনে। গান ত' গানই, তাতে কি আপত্তি ? বুঝ্লেন ত, এ হচ্ছে অয়েলিংএর যুগ। আমাদের আর কে আছে ?"

বলিদত্ত ফিক্ করে হেসে ফেলল। তার কি যায় আসে ? অরুণ বাবুর বেশ বুদ্ধিসুদ্ধি আছে বলে মান্তে সে নারাজ। বুদ্ধি থাক্লে মানুষ নিজের মতলব অন্যের সামনে খুলে বলে না।

বাঁকওয়ালার সঙ্গে আবার পথ চলা। বেলা একটা, ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। মেম্সায়েব নেই। মালীও গা এলিয়েছে। সারের বোঝা নামিয়ে দিয়ে গেলে, সে বাহাদুরী নেবে নিজে এনেছে বলে। অগত্যা বলিদত্ত অপেক্ষা করল।

চারদিকে ফুলবন, খাঁ খাঁ দুপুরে ঘন ছায়া গায়ে লেগে পিছলে যাচ্ছে মিষ্টি হাওয়ার ছোঁয়া। প্রকৃতির অলস শোভা। ওদিকে ছোট কুঠরীর সামনে খোলা জায়গায় একপাল ছানা নিয়ে মুরগী চরছে। আস্তাবলে ঘোড়া বিরহী যক্ষের মত আর্তনাদ করছে। এক হাত জিভ বের করে দাওয়ায় পড়ে পড়ে বড় কুকুরটা হাঁফাচ্ছে। অন্যধারে তরুণী আয়া জামাকাপড় শুকোতে দিচ্ছে ; তার এলো চুল রঙীন ব্লাউজ্ ও তরল চাউনি যেন এক জন্তুর মত, দেখতে চমৎকার ! কিন্তু বলিদত্ত দূরে উন্মুক্ত প্রকৃতির শোভা দেখছে না ; ছায়ার নীচে ঘাম মুছতে মুছতে সে ভাবছে নিজের কথা। ছোটখাট শরীর, কষে সাজালেও তা বাড়ে না ; অল্প বিদ্যা, নামের পিছনে আর বিদ্যার বিজ্ঞাপন জুড়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। দূর দেশের অজানা এক

পাড়া, সেখানে ধারকর্জ ধূলপরিমাণ ; চালাঘরের ছাউনিতে খড়ের অভাব, দাওয়ায় খুক্ খুক্ কাশছে বেতো বুড়ো বাপ। অখ্যাত সেই পাড়ার অখ্যাত মানুষ সে—"বলিয়া"।

কিন্তু তার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই নিজের পিতৃপিতামহের গোড়াপত্তন সে কখনও স্বীকার করেনি ; ধূ ধূ মাঠে পড়ে চিমসে শুঁটকো হয়ে সে লড়তে শিখেছে। আগাছার মত জন্মিয়ে সে আগাছার মতই লতিয়ে উঁচুতে চড়তে শিখেছে। হাতের নাগালে যা কিছু পেয়েছে, সবই তা আত্মসাৎ করে সে সবার ওপর ভর দিয়ে মাথা তুলেছে ; নিজের মাপেই বলিদত্ত বেড়েছে। সে আরও বড় হতে চায়।

বাঁক্‌ওয়ালা হাঁকলো "এবার যাই, বাবু।"

"আচ্ছা, তা হলে চল্, এইখানে গাদা করে ঢাল্।"

বলিদত্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অবসন্ন হয়ে ফিরে যাওয়ার সময় খেয়াল হল—কড়া রোদ্দুর, খিদে পেয়েছে।

□

সরোজিনী তাঁর স্ত্রী, নববিবাহিতা। কাঁধে "পতি পরম গুরু" মার্কা ক্রচ্, সিঁথিতে বিবাহের শীলমোহর—সিঁদুরের রেখা, আঙ্গুলে একটা আংটি, তাতে বলিদত্তের নাম লেখা। শোবার ঘরের দেয়ালে ফটো একটা—ঝুলন্ত কালো কম্বলের সামনে দুটি চেয়ারে বলিদত্ত আর তা'র স্ত্রী।

এক সারি একই ধরনের ছোট ছোট বাড়ী, তার একটিতে ওদের সংসার ; সামনে রাস্তা ; রাস্তার উল্টো দিকে আর একটু বড় বাড়ী একসারি।

ছোট বাড়ীতে বলিদত্ত ও সরোজিনীর ঘরকন্না। খুদে উঠোনে ছোট বাগান ; শাক, বেগুন, ঢ্যাড়স। বাইরে পায়খানার কাছে আমগাছের ছাওয়ায় দু'চারটি কলাগাছ। নীচে একগোছা গাঁদাল লতা ; উঠোনে একটি কাগজী নেবুর গাছ। কাগজের মত বোগেন্‌ভিলার গাদা। শোবার কামরায় দুটি তোরঙ্গে যাবতীয় সম্পত্তি ; ছাত থেকে দড়িতে বাঁধা যে বাঁশটি ঝুলছে, তাতে সরোজিনীর শাড়ী ও বলিদত্তর জামাকাপড় মেশামেশি। ভাঁড়ার ঘরে ক'টা হাঁড়ি-কলসী, গেরস্থালী

গোছানো ; তারপর রান্নাঘর, তার বাইরে জ্বালানী কাঠ।

সরোজিনীর সব ঘুরে ঘুরে দেখার প্রচুর অবসর ; সে ঘুরে ফিরে আপনার সম্পত্তি দেখে—সব তা'দেরই, ভাবতেও ভাল লাগে। ঝাঁটা হাতে, চাবি ঝন্‌ঝনিয়ে সাতবার করে ঘর নিকোতে গিয়ে তার মন ভরে ওঠে গিন্নীপনার কর্ত্রীত্বে, ঝাঁটাটা শক্ত মুঠোয় ধরে।

কিন্তু সরোজিনী মোটেই বলিদত্তর মত নয়, না দেহে, না মনে। উচ্চতায় সে স্বামীর চেয়েও চার আঙ্গুল লম্বা, স্বাস্থ্যে ডৌল আছে ; স্বামীর যদি বা ছুঁচলো মুখ, তার মুখ গোল, বড় বড় দাঁত। নিজের সম্বন্ধে তার ধারণা তার সবই বড়, সব বড়! মনটা নিজের ঘরকন্নায় শুধু আটকে থাকতে পারে না ; বাসায় কাজ-কর্ম বেশী নেই, ঝঞ্ঝাট কম। অজানা কোন কিছুর প্রতীক্ষার মত জানালার পাশে বসে সে দূরে চেয়ে থাকে, ভাবতে থাকে। দিনে দু'বার কাজ থেকে ফেরার সময় সেই অবস্থায় তাকে বলিদত্ত দেখে। তার মাপাজোখা খোলের পোষাক ঠেলে একটা পুলকের অনুভূতি জাগে, শরীর শিহরিত করে। খুব লম্বা নিঃশ্বাস টেনে টেনে বলিদত্ত ভাবে—সরোজিনী তারই অপেক্ষায় বসে আছে ; চোখে চোখ পড়ে, ঝাড়ের বেলফুলের কুঁড়ির মত হাসি খেলিয়ে সরোজিনী দৌড়ে গিয়ে সদর দরজা খুলে দেয়।

বেলা দু'টো বেজেছে, বলিদত্ত বাসায় ফিরছে। এ পর্যন্ত সে তার দানাপানির ধারণায় ডুবে ছিল। এই জীবন—কঠোর, কর্কশ পথ, তবুও পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে হবে। তা'র পর, তা'র পর ?

সামনের বাসায় রাস্তার ওপাশে একটি যুবক কলেজ-ছাত্র ; ও বাড়ীর নীরদবাবুর ভাইপো। ছুটিতে এসেছিল। একগাদা বইয়ের সামনে বসে পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ এপাশের জানালায় তার নজর পড়ল। বেলা দুটোর সময় মনে পড়ল তার ব্যায়ামচর্চার কথা। বাহু বেঁকিয়ে, বুক ফুলিয়ে, জোরে চেপে ডাম্বেল দুটো দু'হাতে ধরে সে শুরু করে দিল ভীমবিক্রমে। কী ভীষণ দেখাচ্ছে ভালুকের মত ছাতি ; সারা গা এঁকে বেঁকে ফোলা ফোলা, পাথরের মত। সরোজিনী প্রথমে অভ্যাস মত মুখে কাপড় দিয়ে হাসল। ঠোঁটের হাসি ঠোঁটেই গেল মিলিয়ে, মুগ্ধ হয়ে সে চেয়ে রইল। ক্রমে দেহ শিহরিত করে বারংবার দীর্ঘশ্বাস ; দেহের শিরাপ্রশিরায় কি যেন ঝন্‌ ঝন্‌ করছে ; সেও যেন গলে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে। হেলান

দিয়ে, শরীর এলিয়ে সরোজিনী বসে থাকে, মুখ সামান্য খোলা, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, চোখের মণি দু'টি যেন দাউ দাউ জ্বলছে, তা'র ওপর উদাস কালো ঢাকনা।

ব্যায়ামচর্চা চলছে। কলেজ ছাত্রের তেরছা চাউনিতে ধরা পড়ল এ পাশে চিত্রপ্রতিমা জানালার পাশে। কিন্তু কৈ ? সে ত চাইছে না। নিত্যই এমনি এরা দুজন, বন্ধ্যা কাদা, কবিতা নেই। তার আত্মসম্মানে ঘা লাগল, ঘৃণায় ঠোঁট কুঁচকালো, সে প্রতিজ্ঞা করেছে বিয়ে করবে না। তার চেয়ে ব্যায়াম যথেষ্ট ভাল। দুপুরের নিরর্থক শ্রমের ঘাম মুছতে সে তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে গেল।

কিন্তু সরোজিনী বসে আছে একইভাবে। মুখ সামান্য খোলা, যেন হাসছে, দূরে অর্থহীন দৃষ্টি, ভিতরে বায়োস্কোপ। রাস্তা থেকে সেই দৃশ্য বলিদত্ত দেখল। মুহূর্তের জন্য সে বিচলিত হ'ল। কেমন যেন সব ভুল হয়ে গেল, নিজের উচ্চাশা, নিজের অবস্থা, এমন কি চাকরী ও সায়েবের কথা। শুধু সে যেন এক হ্যাংলা হাঁ-করা কুকুর, নাক কান বুঁজে গিলছে ত' গিলছে। চোখে সারমেয় সুলভ কৃতজ্ঞতা আর আত্মগ্লানি।—

তার দিকে চেয়েই সরোজিনী বসে রয়েছে।

"কি গো, জপ করছ না কি ?" বলেই বলিদত্ত হেঁ হেঁ করে হাসল। সরোজিনী চম্‌কে উঠে পড়ল। হঠাৎ মাথার ওপর রাখা কলসীর জলের মত ঢেলে দিল জগতের যত কর্তব্যজ্ঞান, আত্মত্যাগের প্রায়শ্চিত্তবোধ। কোথা থেকে নেমে এল "পতি পরম গুরু" প্যাটার্নের হাসি ও চাউনি। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিতে গিয়ে কাঠের খিল লাগল আঙ্গুলে ; মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল ; পোষা বেরালের মত লাফিয়ে লাফিয়ে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে সরোজিনী অভিমান করে বলল—"এত দেরী ? সেই কোন্ ভোরে কি যে দু'মুঠো খেয়েছিলে, আর খিদে পায় না ? শরীর ত পোড়া কাঠের মত হয়ে গেছে। মাগো ! পোড়া চাকরি কি স্বর্গে নিয়ে যাবে ?"

"আচ্ছা আচ্ছা, আনো, যা দিচ্ছ দাও, খুব তাড়াতাড়ি, ফের এখুনি বেরোতে হবে—"

সরোজিনী তাড়াতাড়ি সাজিয়ে দিল—আসন, জল, ভাত, তরকারী। বলিদত্ত খেতে বসল। মাছি তাড়াতে তাড়াতে সরোজিনী বলল "রামবাবুর বাসায় আবার ডালা এসেছে।"

"তাই নাকি ?" রামবাবু ওদের পড়শী।

"গেঁয়ো লোক দু'তিন জন এসেছিল, সঙ্গে একটা মুটে—চাল, ঘি, কলার কাঁদি, জালে মোড়া এতবড় এক মাছ। রামবাবুর স্ত্রী চোখের পলকে সব জিনিষ ঘরে ঢুকিয়ে দরজা এঁটে দিল। তারপর খালি শুনছি ছ্যাঁক্ ছোঁক্।"

মুখভর্তি ভাত নিয়ে গঁ গঁ করে বলিদত্ত বলল "ছাড় বাপু, ও কথা। আমাদের কি যায় আসে ? সবাই ত' আর রামবাবু নয়।"

"না, মানে আমি এমনি বললাম ; আমি কি বলি, জানো ? দিন দুপুরে লোকে এ অধর্মের ধন কি করে হজম করে ? তাদের কি কিছু হয় না ?"

"হয় হয় ; না হবে কেন ? সময়ে সব হবে।" এই ক'টা কথা খুব জোরের সঙ্গে বলে বলিদত্ত এক গ্রাস জল খেয়ে ফেলল। সরোজিনী দেখল স্বামীর গলায় প্রকাণ্ড একটা শামুক ওপর নীচে ওঠানামা করছে। সে হেসে ফেললো। বলিদত্ত চমকে বলল "হাসলে কেন ?"

"এখনি তুমি যা বললে—সময়ে সব হবে। তোমার সায়েবের কানে দু'কথা পৌঁছলেই রামবাবুর স্ত্রীর অহংকার ভেঙ্গে পড়বে। ওঃ, মুটকীর কি নাচ ! গয়না গড়াচ্ছে ত' পাঁজা পাঁজা। আচ্ছা, এ যুগটা কি খালি রামবাবুদের জন্যই হয়েছিল ? তুমি ত' বলছিলে—অত লেখাপড়া জানা নন্ রামবাবু। তোমার এনট্রান্স ত, তাঁর শুধু ফাষ্ট ক্লাশ পর্যন্ত। আর তোমার সায়েবকে বললে···"

সরোজিনী স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল স্বামীর মুখের দিকে এবং সেই মুখের পিছনে কোন্ দূর ভবিষ্যতের দিকে—সেখানে ডালা আসে, গয়না গড়ানো হয়, নিত্য মাছ ভাজার ছ্যাঁক্ ছোঁক্ শোনা যায় ; সরোজিনীর পায়ে জোর আসে।

বলিদত্তর হাসি পায়, বলে "সবুর কর, মেওয়া ফল্‌বে"।

সরোজিনী পান সাজতে বসে। বলিদত্ত বাইরের ঘরে যায়। ভাবে—'বলব নাকি আজকের কথা।' বহুদিন থেকে ভিতরে ঢুকবার রাস্তা সে খুঁজছে, খালি মাথা ঠুকছে কিন্তু পথ পাচ্ছিল না। আজ সে একটু সুবিধা করে এনেছে। ভাবল—সরোজিনী শুন্‌বে, হয় ত' পাড়ায় গল্প করবে ; তবে ? বিশ্বাসের কাজ করে করে সে কথা গিল্‌তে জানে, অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। তাই সব কথা স্ত্রীকে বলে না। আবার সে সাতপাঁচ ভাবনায় ডুবে যায়—সেই দানা-

পানির অশেষ যোজনা। সরোজিনী পান দিয়ে, বাসন তুলে নিয়ে গেছে। দূরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ, মনের চেতনায় একটা শব্দ ধ্বনিত হোল "সায়েব"। অভ্যাস মত আধচিবানো পান মুখ থেকে ফেলে দিল, মুখের ঢং, দেহের ভঙ্গী বদলে গেল, দাঁতে দাঁত চেপে ইঞ্জিনের হুস্ হুস্ করার মত ফিস্‌ফিস্ করে সে চিৎকার কর্‌ল "এই সরোজ, সায়েব, সায়েব।"

"মাগো, কি আর দেখব? সেই টাকমাথা বাঁদরমুখো ত—"

"ধ্যেত্, এই সরোজ্, এস না, সায়েব, সায়েব।"

হাসতে হাসতে সরোজিনী কাছে এল। খটাখট্, খটাখট্, ঘোড়ার শব্দ এগিয়ে আসছে। জানালার লোহার শিকের ওপর শরীর ঢেলে দিয়ে সরোজিনী চেয়ে দেখছে বন্দিনী যৌবনের মত, অন্যদিকে কলেজ ছাত্র একটা বই হাতে কি যেন মুখস্ত করার মত, ঠোঁট কাঁপিয়ে এদিকে চেয়ে আছে; সরোজিনীর পিঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বলিদত্ত, ফাঁক্ দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে প্রতীক্ষায়।

সায়েব আসছে।

রোজ সে এই রাস্তায় ঘোড়া দৌড়ায় দু'বার, সকলকে দর্শন দেয়। আজকের পালা এখন।

কিন্তু এ কী? খালি ঘোড়াটা ছুটে যাচ্ছে তীরবেগে, জিন্ বাঁধা তার পিঠে, কিন্তু সওয়ার নেই। বলিদত্ত চিৎকার করল—"সরোজ, সরোজ, আমার পোষাকটা বাড়িয়ে দাও, শীগ্‌গির।" খুব তাড়াতাড়ি, চোখকান বুঁজে সে পোষাকের খোলস কি করে যে শরীরে চড়িয়ে ফেল্‌ল তা'র খেয়াল নেই। দরজা খুলে সে পাগলের মত দৌড়ে গেল ঘোড়া যে দিক্ থেকে এসেছিল তার বিপরীত দিকে। কেউ কেউ তখন কৌতূহলে তাকাচ্ছে কেউ বা জিজ্ঞাসাবাদ করছে; কিন্তু সে সবের আগে বলিদত্ত হাওয়া। উৎসাহের চোটে একপাল রাস্তার কুকুর তা'র পিছু নিল। বলিদত্ত মনে মনে ডাকছে "তারা, তারা, মা।" প্যাণ্টের নীচের অংশ বাঁ হাতের মুঠোয় ধরা, বোতাম লাগাবার সময় নেই; জুতো জোড়া ঢিলে, ফিতে বাঁধা হয় নি; কিন্তু এ যেন ভাগ্যের সঙ্গে দৌড়, 'তারা, তারা'—বলিদত্ত দৌড়চ্ছে।

খুব বেশী দূর যেতে হ'ল না। রাস্তার একধারে, ধুলো থেকে উঠে আসছে সায়েব। সারা গায় ধুলো, জখমের চিহ্ন, সে যে কী রূপ! উত্তেজিত হয়ে নানারকম বক্ বক্ করে বলিদত্ত সায়েবের চারপাশে চক্কর দিতে লাগ্‌ল; জবাবে সায়েবের মুখ থেকে বেরুচ্ছে অনর্গল

গালাগালি। হুঁশ হোল বলিদত্তর—সায়েব সহানুভূতি ঘৃণা করে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সায়েব চলছে ঘোড়া যেদিকে গেছে সেই দিকে। বলিদত্ত লোক পাঠাল ঘোড়া খুঁজতে, সহিসকে খবর দেওয়ার জন্য লোক দৌড় করাল; তারপর সায়েবের পশ্চাদ্‌গমন ছাড়া আর কিছু করার না থাকায় গম্ভীরভাবে পা গুনে গুনে সায়েবের পিছু পিছু চলল।

এ যেন একটি ছোট শোভাযাত্রা! আগে সায়েব, পিছনে একটু দূরত্ব বজায় রেখে খাটো মানুষ বলিদত্ত বীরদর্পে চলেছে, সগর্বে জনতার দিকে চেয়ে হাস্‌ছে একটু আধটু, মনে মনে বুঝে ফেলেছে—ভাগ্য এনেছে পরম সুযোগ। সায়েবের পতনে নিজের উত্থান। আর তা'কে পায় কে? দূরে দূরে দলে দলে সহকর্মীরা দেখছে, তা'দের চাউনিতে ভীতি, আজ তা'রা দারুণ দেরী করে ফেলেছে। বলিদত্ত যা খুশী হুকুম দিচ্ছে, তেরছাভাবে তাকাচ্ছে, সায়েবের মনের কথার আঁচ পেতে। কিন্তু সায়েব যেন মুখোশ পরা!

সহিস ঘোড়া নিয়ে আস্‌ছে। ঘোড়া পেজোমী করছে। ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে, পায়ে হাত বুলিয়ে সায়েব নীচু হয়ে ঘোড়ার খুরের দিকে তাকাল।

"কি আশ্চর্য, ঘোড়ার ওপর এত স্নেহ!" জনতার মধ্যে অস্ফুট গুঞ্জন। বলিদত্তও নুয়ে পড়ে ঘোড়ার পা দেখছে। ঘোড়ার পায়ের প্রতি জীবনে এই তা'র প্রথম কৌতূহল; সত্যই, এ একটা ঘোড়ারই পা—এতে সন্দেহ নেই; কিন্তু সায়েব যা দেখছে তা'ত দেখতেই হবে। সায়েব চিৎকার করল—"পশুডাক্তার" এবং বাংলোর দিকে হাত দেখাল। বলিদত্ত পাশে দাঁড়ানো একজনের কাছ থেকে সাইকেল ছিনিয়ে সাঁ করে উধাও; লোকটা আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল।

সাইকেল চড়ে হাওয়ার গতিতে যাওয়ার সময় মনের ভিতর হেসে উঠছে—এই সুযোগ, এই সুযোগ। হাঁস্ ফাঁস্ করতে করতে ছুটবার সময় পা কন্ কন্ করছে। মুখ আঠা-আঠা, মাথার মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ ডাক্‌ছে, সে যেন ভোরের পাখীর ডাক—এই সূর্যোদয়, এই উষা। এম্‌নি মোহগ্রস্ত ভাবে পশুডাক্তারকে ডেকে সঙ্গে এনে সায়েবের কাছে ফিরতে দেখে, ঘোড়া উঠে দাঁড়িয়েছে। সায়েব ঘাসের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে তাকিয়ে আছে, ঘোড়ার খোঁড়া পায়ে হাত বুলোচ্ছে।

কেন যে তা'র অমন বুদ্ধি হ'ল তা জানে না, কিন্তু আনন্দে ও

উল্লাসে বলিদত্তের ইচ্ছে হোল—ঘোড়ার পিছনের পা'টা ভালভাবে নজর করতে, সত্যিই যেন কিছু আবিষ্কার করা যাবে। ঘোড়ার কাছে তাই যেতে না যেতে চোখের পলকে ঘোড়া মার্ল লাথ্; ভাগ্যে, গায়ে লাগে নি; তবুও পিছনের দিকে লাফাতে গিয়ে বলিদত্ত এক আছাড় খেল। সায়েব গর্জে উঠল; তা'র চোখে তখন সর্ষে ফুল। মুখ নীচু করে সে উঠে দাঁড়াল; যেন তা'র সৌভাগ্যের শকট উল্‌টে পড়েছে এক ধাক্কায়।

সহকর্মীরা সমবেদনায় মুচকি হাসছে—"বলিদত্ত, এদিকে এস।" এমনি করে গেল মিনিট পাঁচেক; কিন্তু তা'র মন হার মানার পাত্রই নয়। বাঁ পাশ কাটিয়ে সে বাগানের দিকে গেল—বেশ, বেশ, মেমসায়েব পায়চারী করছেন।

"গুড্ মর্নিং!"

"গুড্ ঈভ্‌নিং, ব্যাবু।" সেই মুহূর্তেই জিভটা টেনে কামড়ে দিল সামান্য; সত্যি ত, সন্ধ্যা কাছাকাছি। মেমসায়েব লক্ষ্য করেছে তার অপ্রস্তুতভাব। কিন্তু না, আটকানো চলবে না, যে আটকায় সে মটকায়। হাত নেড়ে সকালের কারসাজি সে দেখিয়ে দিল—কত ঘোড়ার গু, কত শুয়োরের গু। পড়ি মরি করে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা চালাল। মেমসায়েব মাথা নাড়ছে—ওঃ, সে কী আনন্দ! কী আনন্দ! আরও উচ্ছ্বসিত ভাষায় সে অনর্গল উপুড় করে দিল তার ভুলে ভরা ভাষার ভাণ্ডার।

"ও, আই সি; মালী, এসব লাগিয়ে দাও।"

দূরে সরে মেমসায়েব কোলাকুলি করে ফুলগাছকে সোহাগ জানাচ্ছে। সহকর্মীরা দেখছে দূর থেকে।

সায়েব তখনও ঘোড়ার কাছে হাঁটু গেড়ে।

একগাদা ফাইল নিয়ে অপেক্ষা করছে তিনজন কর্মচারী।

"জরুরী ফাইল, হুজুর!" কুলমণিবাবু বললেন।

"জরুর্, জরুর্"—সায়েব খেঁকিয়ে উঠল—"ব্যাবু, ব্যাবু, ও ড্যাম—।" বলিদত্ত দৌড়ে এসে সেলাম ঠুকল।

"ব্যাবু, লিখে দাও এবার আমি কাউকেই যোগ্য দেখছি না। আঃ, ঘোড়াটাকে ভাল করে দেখ, ডাক্তার।"

দূরে প্রতীক্ষারত কর্মচারীদের মুখ কালো হয়ে গেল। বলিদত্ত কাগজপত্র নিয়ে চলে যাচ্ছে। নানা দিক থেকে ইশারা—সকলেই তা'কে ডাকছে। কিন্তু অচঞ্চল পায়ে সে চলে যাচ্ছে।

□

"তোমার উনি কেমন ঘোড়ার মত দৌড়ে গেলেন।" রামবাবুর স্ত্রী বললেন "হ্যাঁ গা, আমি ত' অবাক! ভারী পরিশ্রমী লোক যাহোক, সাক্ষাত্ ফড়িং, না?" সরোজিনী একটু ভেবে নিল—কি জবাব দেবে; হেসে বলল, "সবায়ের ত' আর নেয়াপাতি ভুঁড়ি ঝোলে না যে দৌড়তে পারবে না।"

"হ্যাঁ লো, দৌড়ও, দৌড়ও, মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। গিরগিটির দৌড় কেয়া ঝোপ তক্। লোক হাসিয়ে যতই দৌড়ও না কেন, মাস গেলে সেই ষাট টাকা। না, আর কোথা থেকে বাড়বে? অ্যাঁ, তবে এমন করে দৌড়লে কি হবে? যা হওয়ার তা হবে, তবে এমন ব্যাভার কেন?"

"কোথা থেকে হবে দিদি, সবায়ের কি ভাগ্যে আছে যে, দেউড়ী, খিড়কী সব দিকেই আমদানী কুড়োবে? চেষ্টা করলে ত' হবে।"

"কার দেউড়ী খিড়কীতে আমদানী দেখলে গা?"

"যারই দেখি না কেন!"

"হ্যাঁ, কলিকাল ত! পরের কেরামতি দেখে লোকে নিজের চুল ছিঁড়ে মরছে। কথা শোনো মেয়ের?—কেরামতি দেখাতে কে মানা করেছে? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শরীরটাই শুকোবে, কার ভাঁড়ার ভর্তি হবে?"

"মাথার ঘামে আমাদের দরকার কি দিদি?"

"এই ত, দেখো সবাই; আঁতে ঘা একেই বলে। হ্যাঁ লা, তাহলে আমাকেই খোঁটা দিচ্ছিলি?"

ন' ছেলেটি ততক্ষণে চিল্লাতে শুরু করেছে "মা, ও মা?"

"যাচ্ছি রে, যাচ্ছি", রামবাবুর স্ত্রী চলে গেলেন।

কথা নয়ত তাঁর, মুখে যেন ধারালো কাটারী, ঘা দিচ্ছে ত দিচ্ছেই। রামবাবুর স্ত্রী গায়ে পড়ে খুঁড়তে আসেন, পিষে চলেন এ বাড়ী সে বাড়ী। তিনি চলে গেলে সরোজিনী হাঁফ ছেড়ে বসল, ইচ্ছে হ'ল খানিক্টা ডুক্রে কাঁদতে; কিন্তু কান্না শুনবে কে? সান্ত্বনা দেবে কে? সব বৃথা।

একটা কথা তা'রও মনে খেলছে। তা'র স্বামী লোক হাসিয়েছে।

এতক্ষণ যে কথা নিজের মনে শুধু ঘুরপাক খাচ্ছিল, তা শুনিয়ে গেছে মুখরা রামবাবুর স্ত্রী ; এখন থেকে সে যেন আরও কদর্য, তাকানো যায় না, ভাবা যায় না। কিন্তু না ভেবে উপায় কি ? এই দূর বিদেশে ভাবনাই তা'র বড় সঙ্গী।

মা বাপ ধান্দায় ছিলেন, জোটাবেন ভাল ঘর, ভাল বর।

চাষাড়ে গ্রামে খানদানী বংশে চার বোনের সব চেয়ে ছোট সে।

দুপুরবেলা পুঁতি খেলার সময় কান পেতে শুনত—'ভাল ঘর, ভাল বর।' সঙ্গীসাথীদের কানাকানিতে তার ইশারা পেতো।

বাবা জিদ ধরেছিলেন—জামাই হবে দশজনের মধ্যে একজন—লেখাপড়া জানা, চাকুরে। তাই তিনি জামাইকে দেওয়ার জন্যে সোনার ঘড়ি আর সাইকেল যৌতুক হেঁকেছিলেন ; অন্য কোনও বোনের কপালে তা' জোটে নি।

সোনার ঘড়ি ও সাইকেল বরাত দেওয়া হল, গাঁয়ের বাটে বর এল—চারিদিকে হৈ চৈ সারা গাঁ জুড়ে, 'বর এসেছে' ; বাজি নেই, বাজনা বেসুরো লাগছে, তার পর বরের রূপ ও চেহারা নিয়ে টীকা-টিপ্পনী—"আহা হা, আমাদের সরো'র এই বর, যেন সোনার বাটিতে কালোজাম !" বিয়ের আগে এক খণ্ডযুদ্ধ ; শহুরে আর গেঁয়ো লোকদের মধ্যে কাজিয়া, মারপিট ; কত লোক রাগ করে চলে গেল। সব খবরই তার কানে পৌঁছাল। শেষে যখন পাল্কীতে চড়ল, বাপের হাত ধরে সে কাঁদল "বাবা গো, আমাকে সাত সাগরের জলে ভাসিয়ে দিলে বাবা— ।"

তারপর জীবন গড়িয়ে যাচ্ছে, কল্পনার রাজপুত্র ও আশা-উচ্ছ্বাসের মূর্তিমান রূপ এই চার ফুট ন' ইঞ্চি—বলিদত্ত !

মনে ঝেঁপে আসে অভিমান ; যা হয়, হোক ; এ লোকটার ওপর ত' শুধু তারই অধিকার ; এমন কি হয় না ? সংসারে সবাই কি সমান ? এই ত' তা'র সম্পত্তি, এ সব বাড়বে, বাড়ী হবে, নাম হবে, ঈশ্বর দয়া করলে সবই হবে। সাঁঝ সকালে সরোজিনী প্রণাম জানায়, সগর্বে পা ফেলে। স্বামীকে সুখে রাখার চেষ্টায় বোনের মত স্নেহ দিয়ে তা'র সুখ-দুঃখ বোঝে। সেই খাটো লোকটির দিকে নিজের মুখ নামিয়ে এনে জীবনের নৈবেদ্য তুলে দেওয়ার সময় মনে মনে পায় মাতৃত্বের আনন্দ।

কিন্তু যত সুখের যত হাসির উপকরণ থাক না কেন, মাঝে মাঝে তা'র মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। দেহে, মনে আগুন লাগে। সারাদিনের

কাজের ক্লান্তি ও সন্ধ্যায় সুখ-প্রকল্পের পরে বলিদত্ত যখন খুশী হয়ে ঘুমোয়, ভোঁস্ ভোঁস্ করে নাক ডাকায়, তখন সরোজিনী নাগিনীর মত ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, ছটফট করে, বারবার উঠে পড়ে, চঞ্চল হয় ; সুষুপ্ত স্বামীর দিকে তাকাতে তার মনে থাকে না ঝক্‌ঝকে 'পতি পরম গুরু' ক্রুচের ছায়া ; জটিল, ফুটন্ত মনের মধ্য থেকে চোখের পথে ঝরে পড়ে বিষাক্ত, হিংস্র দৃষ্টি। মনে মেঘ খেলে, দেরী করে ঘুম আসে। পরদিন সকাল থেকেই আবার সে মুখে হাসি মনে আশা নিয়ে ঘরকন্নার তদারক করে।

রামবাবুর স্ত্রীর নিষ্ঠুর ঠাট্টা আবার তা'র ভাবনা পালটে দিয়েছে। সরোজিনী উনুনের সামনে বসে ধীরে ধীরে চোখের জল মুছছে ; ভাবছে লোকে এমন নিষ্ঠুর হয় কেন ? অন্যকে ঘা দিয়ে কি সুখ পায় ? ভগবানের সংসারে এত দুঃখ কেন ?

জীবনের যত জটিল আবর্তে ভগবানকে ডাকলে মনটা উড়ে যায় সেই গাঁয়ের কোলে। বাপের বাড়ীর সেই সাবেকী খড়ের ছাউনির ধাওড়াতে অন্ধকার এক মণিকোঠা ; কাঠের টুলের ওপর পিতলের রাধাকৃষ্ণ মূর্তি, নীচে লাল বনাতের ওপর শালগ্রাম শিলা ; ঘণ্টা বাজে, ধূপধুনা জ্বলে, কলা কিংবা মুড়কীর ভোগ পাবার জন্য বাচ্চারা জড়ো হয়, মিষ্টির গন্ধে পিঁপড়ে ভীড় করে ; ভক্তিভরে মা করেন প্রণাম, বাবা দরাজ গলায় দুঃখের আর্তি জানান, সরোজিনী করে ভূমিষ্ঠ নমস্কার।

জলে টলটল চোখ, চোখের জলের মধ্যে দিয়ে উনুনের আঁচ দেখা যায় ; আবার নজর ফিরে যায় মনের গভীরে। সেই পরিচিত দৃশ্য, পরিচিত শব্দ, ফুটন্ত চালের টগ্‌বগ্, চেনা গন্ধ, টুলের ওপর বিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে চোখে ভাসে অতীত জীবন—যা সে হয় নি, কিন্তু হতে চেয়েছিল। চোখে পড়ে দুর্জয় অভিমান, মনের গভীরে গুম্‌রানি ; আশা-আকাঙ্ক্ষার আড়ালে, প্রত্যয়ের পৃষ্ঠপটে রাশি রাশি ভাঙা সাধের স্বপ্ন, ঠিক যেমন পুকুর পাড়ে চালতা গাছের গোড়ায় কতক-গুলো ভাঙা হাঁড়িকুড়ি খোলামকুচির ঢিবি !

কেউ নেই কোথায়ও, কী ভীষণ নির্জন।

উনুনে কাঠ জ্বলে জ্বলে একটার পর একটা ছাই হয়, ক্ষণে ক্ষণে একটার পর একটা রান্নাঘরের বেসাতি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ; একই পুরনো চিন্তা, সেই একই পরিস্থিতিতে একই রকমের হাঁসফাঁস করা, হয়রানি ভাবনা—কখনও ছুটে আসছে তারা সারি বেঁধে,

আবার মিলিয়ে যাচ্ছে, মন ক্লান্ত, অবসন্ন। ফের জান্তব মন সহজেই সাজাচ্ছে ভাল হওয়ার, ভবিষ্যৎ গড়ার, কুদিনের পর নতুন কালের স্বপ্ন ; নিজের জঠর থেকেই সুতো বের করে জাল বুনছে মাকড়সা। সেই জালের বাসাতে সে ঘুমোয়, আবার সুখের স্বপ্ন দেখে। সরোজিনী ধীরে সম্বিৎ ফিরে পায়—যেন তার জন্ম থেকেই জীবনের এই পরিবেষ্টনী। এও ত' জীবনের কড়ার, গোড়া থেকেই তার শপথ যে এর ওপরেই গড়বে সে, এই দুটি পাতার চারার ওপরেই ভবিষ্যতের মহীরুহ।

রান্নাঘরে বসে বসে সে মাথা ঝাঁকায়, চোখ বুঁজে পড়ে থাকে। ওঃ, কত দেরী রো—জ, কখন উনি আসবেন, কী যে একলা লাগে।

রান্নাঘর ভেজিয়ে সরোজিনী বাইরের ঘরে আসে। রাস্তার ওপাশে নীরদবাবুর বাসায় সেই কলেজ ছাত্র টেবিলের কাছে বসে বই পড়ছে। সরোজিনী বসবার ঘরে ল্যাম্প জ্বেলে দিল ; আলোর কোনও দরকার ছিল না। সে জানে, আলো জ্বাললে শুধু নিজেকেই জাহির করা হবে। তবুও তার খেয়াল হওয়ায় পা টিপে টিপে গিয়ে সেই দেয়াল ল্যাম্পটা উস্কে দিল। মনের ভিতরে এক অজানা পাপবোধ তার ব্যক্তিত্বকেও তাড়া করছে ; এক অপরূপ ভঙ্গীতে সরোজিনী জানালার কাছে হেলান দিয়ে দাঁড়াল—দৃষ্টি তার সুদূরে ; এবং রাস্তার ওধারে হঠাৎ যেন বই খাতায় ফিতের বাঁধন পড়ল ; কলেজ ছাত্র লণ্ঠন কমিয়ে দিল। জানালার পাশে চুপচাপ দাঁড়ানো দেখা গেল তার ছায়ারূপ ; আলো তা'র চাই না, সেই ছায়া—অন্ধকারেই তার প্রকাশ।

□

এংকটু রাও বলিদত্তর সহকর্মী ও বন্ধু ; শ্যামল রঙ, ঢ্যাঙ্গা, পাতলা খেলোয়াড়ী চেহারার মানুষ। এংকটু রাও পাৎলুন পরে। তার ছিমছাম মুখ, ফিটফাট পোষাক পরেই সে বাইরে বেরোয়, সর্বদা প্রস্তুত হয়ে ; চকচকে জুতো, চিরুণ করে আঁচড়ানো মাথায় টেরি। মুখ সর্বদা সাফসুফ ও মসৃণ। ব্যবহারে ভদ্রতা ও বিনয় তার সহজ গুণ ; কথা বলে অল্প, মিষ্টভাষী, অপরের দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝে সমঝে নিজের কথা বলা তার স্বভাব। ওঁছা, দায়িত্বহীন গল্পে মাততে

তাকে কেউ দেখে নি; কাউকে আঘাত দেওয়া তার নীতিবিরুদ্ধ। গোড়া থেকেই সে এমন ভাবে মানুষ হয়েছে যে, পাৎলুন পরে, কোথায়ও খট খট শব্দ না করে ধীরে পথ কেটে আগে চলতে অভ্যস্ত।

তার ঘরোয়া জীবনের কথা সবার সামনে গল্প করতে সে বসেই না। নিজের বিষয়ে সে অত্যন্ত চুপচাপ। আপনার অভাব-অভিযোগের তালিকা তৈরী করে সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়িয়ে বিলি করতে নারাজ। সে খায়নি? সে ক্লান্ত? বাড়ীতে তার কিছু অসুবিধা চলছে? অন্যের এসব জল্পনা-কল্পনা বৃথা, এংকট্ রাও এসব কথা হেসে উড়িয়ে দেয়। তার অধ্যবসায় অন্তহীন, উপরওয়ালার সামনে সর্বদা তার নুয়ে পড়া দাস্যভাব। তার ব্যক্তিত্ব আঁটসাট, শত খোঁচালেও তাতে স্ফুলিঙ্গ নেই; সে কুস্তির আসরে নামে না; এভরেডি ব্যাটারীর বিজ্ঞাপনের মত সে সর্বদা প্রস্তুত, মুখে একই সুরে সেই "য়েস্ স্যার।"

মূর্তিমান্ "য়েস্ স্যার" নিরপরাধ, নীরবে প্রগতিশীল এংকট-রাও-এর প্রতি বলিদত্তর গভীর শ্রদ্ধা; কারণ বলিদত্ত সেখানে দেখে— একটা পরম্পরাগত পরিশীলিত আদর্শ যার জন্য সে সাধনা করে কিন্তু যার কাছাকাছি যেতে পারে না। এংকট্ রাও মিতব্যয়িতার চরম আদর্শ। কাজ থেকে ফিরে সে তার ছোট বাসায় ঢোকে, সেখানে তার বাপ্ মা, স্ত্রী, বোন, ভগ্নীপতি এতগুলি আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে সে থাকে। ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দেয়। লোকচক্ষুর আড়ালে তার গরীবখানার বাস্তবরূপকে আলিঙ্গন করে সে নিজের রূপ বদলায়; ঘরের ভিতর ছোট অন্তর্বাস, বাইরে দাওয়ায় বেরোতে হলে —লুংগী। রান্না প্রায় হাতে হাতে সাঙ্গ হয়, সেদিকেও ঘটা নেই; এক বেলা জোয়ারের জাউ, আর একবেলা ভাত, 'চারুপানি,' যা হোক্ একটা সেদ্ধ; দই-এর জল ভিটামিন্ জোগায়, তাও খুব পান্‌সে, তাই হজমে কষ্ট নেই। কাঠ জ্বাল্‌তে হয় অল্পই, এক ঘণ্টায় তামার পাত্রে রান্না শেষ। অন্য কোন বদখরচ আদৌ নেই। রাত্রিতে কেরাসিন্ জ্বালার প্রয়োজন বিশেষ নেই, খাওয়া-দাওয়া সন্ধ্যেয়ই খতম্। কখনও দরকার হলে কদাচ ছোট ল্যাম্প; সন্ধ্যায় দু'ঘণ্টা ক্লাব-ঘরে, সেখানে পেট্রোমাক্স জ্বলে, খবরকাগজ পড়া হয়। এত লোক একসঙ্গে থাকায় কোন অসুবিধা নেই; আলাদা করা আছে এক ছোট কাম্‌রা, অর্ধরাত্রে লাল কাগজে জড়ানো ল্যাম্প জ্বলতে দেখলে আর

কেউ সেখানে ঢোকে না।

বাসায় লেফাফার ওপরে 'ইকনমি স্লিপ্', বাইরে "য়েস্ স্যার", হাসিমুখে এংকট্রাও তার প্রতিকূল অবস্থা ও দারিদ্র্যকে জয় করে জীবন যাপন করে। বলিদত্তর ইচ্ছে হয় তাকে অনুকরণ করে, সে লালায়িত হয়ে স্ত্রীকে বলে "দেখ্‌ছ সরোজ, ওরকম পার না?"

সরোজিনী হাসে। এংকট্-রাওয়ের স্ত্রীকে দেখেছ? কী পরিশ্রমী, অথচ সর্বদা সাফ্‌সুফ্, চুল আঁচড়ানো, খোঁপায় ফুল।

"আঃ, ভারী ত' এংকট্রাওয়ের স্ত্রী। একখানা শাড়ী পুতু পুতু করে ছ'বচ্ছর পরে চলেছে; আর চুল বাঁধার কি ছিরি, বাজার থেকে পরচুলা কিনে এনে জুড়ে দিয়ে বাহার দেখানো। ফুলের কথা যা বল, তা মান্‌ছি; রাত্তিরে ফুল মচকে যাবে বলে খুলে রেখে জলে ভিজোয়, সকালে আবার তা চুলে গোঁজে।"

"আবার জান ত, সে কী সুন্দর গান গায়—"

"আমরা বাপু অমন ঢং দেখাতে পারব না। এংকটকে বল্‌লে না কেন, তোমার জন্য ওই রকম একটা কনে ঠিক করে দেয়—"

"ধ্যেৎ, যাই বলি না কেন, তুমি ঠাট্টা কর; ভাবো—তোমার এই ওড়িষা দেশের বোঝা বোঝা কড়া দোখ্‌তামেশা পানের খিলি এক একটা মুখে ভরে রান্নাঘরে কোমর বেঁধে সকাল থেকে মাঝ্‌রাত পর্যন্ত রগড়ালেই কর্তব্য শেষ, একেই বলে জব্বর ঘরকন্না। জানো, বাঙ্গালীরা বলে—বাঙ্গাল মানুষ নয়, উড়ে এক জন্তু! লম্ফ দিয়ে গাছে ওঠে লেজ নাই কিন্তু। আর তেলেঙ্গারা বলে—কি এমন রান্না বাড়ায় তোমাদের রোজগার শেষ হে, কি সোনারূপোর তরকারী খাও? 'ওড্‌ড ওয়াল্‌ড্'। আর বিদেশে গেলে যখন তোমরা গাদা গাদা পানে মুখ ভরে, ঝমর্ ঝমর্ গয়না বাজিয়ে, আঁচলে আঁচলে গিঁট দিয়ে শোভাযাত্রায় বেরোও, আহাহা চিড়িয়াখানার জন্তু আর কি; কাছেই আছ, কি করে ঘরকন্না করতে হয়, এংকট রাওয়ের বাসা থেকে শিখে নাও, সরোজ, বুঝ্‌লে?"

পরস্ত্রীর প্রশংসা নিজের স্ত্রী পছন্দ করে না, সরোজিনী বহু কষ্টে কান্না আটকায়। বলিদত্ত ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।

সেই এংকট্রাও তার বন্ধু, কফি খাওয়ায়, ইড্‌লি খাওয়ায়, এক আনায় এক প্যাকেট ভালুক কিংবা ঘড়িমার্কা সিগারেট কেনে ত, তারও ভাগ দেয়। এই নীরব বন্ধুত্বের মধ্যে চলে দু'জনের চুপিসারে আলাপ, শাস্ত্রচর্চা; ঢ্যাঙ্গা ও বেঁটে একই পথের পথিক দু'জন।

তাদের শাস্ত্র আপিসের কার্যপ্রণালী, কে কি লিখ্‌ল, কোন্‌টা কিভাবে লেখা হয়. কোন্‌ ব্যাপার কতদূর গড়াল এবং নীরবে এংকট-রাওয়ের হাত দেখার চর্চা।

এংকট্‌ রাও দেখে চাকরীর চার দেওয়ালের ভিতর তার ভাগ্য নিবিড়ভাবে বাঁধা ; তারই ভিতরে আটকে পড়েছে তার সমগ্র জীবন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। সে বিষয়ে তার আক্ষেপ নেই ; বরং নিজের পরিষ্কার বস্তুবাদী দৃষ্টির জন্য সে গৌরবান্বিত ; সেই সাফ্‌ পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সে হিসেব করতে বসে—চাকরীর মাইনে ও সংসারের কলেবরের সম্বন্ধশীল রূপ ; আজ এমনটি আছে—পাঁচ বছর পরে পাঁচ টাকা বাড়লে সংসারের অমুক ফাটলে একটু মাটি ঠেসে দেওয়া যাবে ; তখন তার চেহারা হবে এইরকম ; তারপর দশবছর ; মাইনে অনুপাতে তার পরিবর্তনও লক্ষ্য করা সম্ভব ; এংকট্‌ রাও অংক কষতে থাকে। পথে ঘাটে যেতে আসতে যদি কাউকে নিজের চেয়ে ভাগ্যবান মনে হয়, দুঃখ করে না ; তার দৃষ্টি চলে যায় রাস্তা ছেড়ে রাস্তার ধারে, দেখে মুটে, ধাঙড়, মজুর, কৌপীনপরা ভিখারী, পঙ্গু—তাদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানায়, হাঁটতে হাঁটতে শিস্‌ দেয়।

কিন্তু নিজের মধ্যে তার আছে অতৃপ্ত আদর্শবাদ, বস্তুবাদের বরফের বোঝার নীচে অনির্বাণ শিখা ; অংক কসা সারা দুনিয়ার পরিকল্পনার আড়াল থেকে তবুও তা' উসখুস করে, বিছানায় একটা ছোট ছারপোকার মত। তারই তাড়নায় এংকট্‌ রাও তুলে নেয় হাতদেখার বই, ভারতীয়, ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান্‌ বইয়ের অনুবাদ ; 'কিরো'তে তার গোড়াপত্তন ; ছোট লেন্‌সে দেখে পেনসিল্‌ দিয়ে কাগজে এঁকে মত্ত হয় সে তার ভবিষ্যতের প্রকাণ্ড কুলুপে চাবি ঘোরাতে।

ভাবে—সে দেখতে পাচ্ছে।

হাত দেখা শাস্ত্র বলে, হাতের রেখা বদলায় এবং সেই সঙ্গে ভাগ্যও ; এবং ইচ্ছাশক্তি ও কার্যবলে মানুষ 'নিজের হাতের রেখার বাঁক বদলাতে পারে। তাই অনেক সময় এংকট রাও ছোট লেন্‌স ধরে তার হাতের পাতার দিকে চেয়ে চেয়ে সম্ভাব্য পরিবর্তন লক্ষ্য করে। প্রধান রেখা ও প্রধান গ্রহ-ক্ষেত্রগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে—ভাগ্যরেখার শেষ দিকের এই দাগটা যদি একটু বাঁকৃত মধ্যমার মূলে শনিক্ষেত্র ছেড়ে অনামিকার গোড়ার মাঝখানে বৃহস্পতিক্ষেত্রের দিকে ! হাতের মাঝ বরাবর মঙ্গলক্ষেত্রটি

যেন পুকুরের মত, আহা যদি একটু তা টোল খেত ! তা'হলে এংকট রাও কোথায় উঠে যেত, পাশের ঘরের চেয়ার আর তার কাছে দূর মনে হোত না। ইচ্ছাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ! 'ঘটুক্, ঘটুক্, ঘটুক্ !'

নতুন লোক দেখলেই তার নজর চলে যায় তার হাতের পাতায়। এবং ওপরওয়ালাদের হাতের পাতা অলক্ষ্যে নজর করে তা থেকে জানার মত স্বভাব, চরিত্র ও তাদের ভবিষ্যৎ আদি সে একটা খাতায় টুকে রাখে ; সেই অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ। সঙ্গী সাথী হাত দেখাতে আসে ; এংকট্ রাও অভ্যাস করে দক্ষতা বাড়ায় সেই সুযোগে।

কিন্তু এ বিদ্যার মূল্য বিচার করে সে নিজের ভবিষ্যৎ-দেখা দর্পণের মত ; দিন আস্‌বে, দক্ষতা বাড়বে, উজ্জ্বল হয়ে উঠবে নিজের ভাগ্যের ছোট ছোট প্রতিটি ঘটনা, চোখের ঠুলী খুলে যাবে ; এংকট রাও জানতে পারবে সে কোথায় দাঁড়িয়ে।

এ বিষয়ে বলিদত্তর সঙ্গে তার মতভেদ। খুদে বলিদত্ত দীর্ঘকায় এংকট রাওয়ের উদ্দেশ্যকে উপহাস করে ; সকলের উদ্দেশ্যকেই সে মনে মনে উপহাস করে বিশেষ করে সেইখানে যেখানে অন্যের অভিমত তার নিজের মতের সঙ্গে মেলে না। মহাজন যেমন কারিগরের কাজ দেখে, বলিদত্ত তেমনি দেখে এংকটু রাওয়ের হাত দেখা বিদ্যাকে ; ভাবে —ঠিকমত ব্যবসায় লাগাতে পারলে কী মুনাফাই না হত ! ব্যবসায় যদি নাই লাগ্‌ল তবে ত' উৎপাদন শুধু গাধাখাটুনী ! এংকটু রাও যদি বড় বড় কর্তাব্যক্তির হাত দেখত, আর তাঁদের বাড়ীর লোকেদের হাত, তবে তার প্রতিপত্তি হত, প্রতিপত্তি থেকে উন্নতি। এই উপায়ের সার্থকতা ভাবলে মন তার ভরে ওঠে ; কিন্তু নিজের সে জ্ঞান নেই, বইতে চোখ রেখে দাগ কেটে কেটে তা পড়ে অংক কষে ফল যাচাই করা তার কাছে বিষম ব্যাপার ; পরের মুখে ঝাল খাওয়ার মত সে এংকটু রাওকে বারবার উস্কায় "শত বল্‌লেও তুমি বোঝ না, এংকটু-রাও ! চুপ করে ঘরের কোণে রইলে, কে তোমার খবর নেবে ? যাও, বেরিয়ে পড়, নিজেকে প্রচার কর বাপু, এ যে প্রচারের যুগ। উপর-ওলাদের হাত দেখে ফল বাৎলাও। যাবে ত ?"

এংকটু রাও হেসে ওঠে। বলিদত্তর বুদ্ধির স্বল্পতাকে সে অনু-কম্পার চোখে দেখে। ভাবে, ভাগ্যের বাস্তবতাকে যে না চেনে সে মানুষই নয়।

সেদিন সন্ধ্যায় আবার সে-ই গিয়ে ধরেছিল এংকটু রাওকে "কাল

একটু কষ্ট করে দেখবে নাকি এংকট রাও, তুমি যা বলেছিলে তা ঘনিয়ে আস্‌ছে নাকি ? খাতাটাও দেখো।”

“আচ্ছা।”

“এইবার তোমার গণনার সত্যাসত্য জানা যাবে।”

এ কথা সে বহুবার শুনেছে ; এংকট্‌ রাও হেসে উঠল।

□

সন্ধ্যাবেলা আলো জ্বলছে একটা সাফসুফ অথচ খুব ছোট পাকা বাড়ীর ভিতর, দরজা একদম খোলা। খোলা জানালা ও দরজার ভেতর দিয়ে বাইরের অন্ধকারকে গ্রাস করে তেড়ে আস্‌ছে যেন সেই ঘরের আলো, তা'র সঙ্গে মিশে যাচ্ছে নানা কণ্ঠের উচ্চরোল, হাসি, চিৎকার ; সামনের রাস্তার স্রোতের ওপর শহুরে গন্ধটাকে ছাপিয়ে উঠছে সেই বাড়ীর কাছাকাছি মধুমালতী ফুলের উড়ন্ত আতর ; চামেলীর খসে পড়া পাপড়ি, কোথা থেকে মাঝেমাঝে ফিনিক্‌ হানছে হেনার উত্তেজক সুবাস। এ সবই আছে সেই ছোট বাড়ীটির দেয়ালের ধারে। চওড়া রাস্তায় গাড়ী ও হাটুরের শোভাযাত্রা লেগেই আছে। ওপাশে প্রকাণ্ড এক দোতলা বাড়ী, রাজনীতিজ্ঞ উকীল-বাবুর মহল, ওপরে টাঙ্গানো চিকের পর্দার আড়ালে একটি মেয়ে গলা সাধছে, নীচে যেন মেলার মত লোক জমেছে, কেউ টহল দিচ্ছে, কেউ বসে আছে, কেউ উদ্বিগ্ন হয়ে বারংবার দরজার দিকে তাকাচ্ছে, ভিতরে বিজলী আলোর নীচে গম্ভীরভাবে বসে আছেন বাড়ীর মালিক, কাছে দু'তিন জনের বেশী নেই ; কেবল মাথা নাড়ানো থেকে বোঝা যায় যে, আলোচনা চলছে। এ পরিস্থিতির প্রতি আদৌ সচেতন নয় জ্বলজ্বলে ছোট ঘরটির লোকেরা, তা'দের অস্তিত্বের প্রচার তা'দের গলায়—।

এ পথে যাওয়ার সময় বলিদত্ত সামান্য দোনামনা হয়ে পড়ে। চেনাবাড়ী, এখানে থাকে তার সহকর্মী বনবিহারী পট্টনায়ক ; কিন্তু সহকর্মীর ত' ছড়াছড়ি প্রতি গলিতে, রাস্তায় ; প্রত্যেকের দরজায় আটকাতে গেলে, দিন পেরিয়ে রাত হ'য়ে যাবে, রাতের পরে দিন। বলিদত্ত হিসাবী লোক। অনর্থক সময় নষ্ট করা সে পছন্দ করে না।

কিন্তু এখানের কথা আলাদা ; 'বন্ধু'র বাড়ীর সামনের পথে হেঁটে

যাওয়ার সময় রাস্তার পথিকের গায়েও শহুরে বিমূঢ় ভাবের ধাক্কা লাগে; সেই মুহূর্তে সে তখন গ্রামীণ, হারিয়ে যাওয়া জীবনের সরল, স্বাভাবিক উপাদানকে নতুন চোখে নতুন মূল্যে দেখে, আর দু'পা এগিয়ে গিয়ে অবশ্য তা পরে ভুলে যায়। হাসির লহর, কথার তোড় যেন উপছে পড়ছে, সেই জোয়ার ভাঁটা যেন বলিদত্তকে ভিতরে টেনে নিয়ে গেল। সময়ের জ্ঞান, কি সার্থক আর কি অনর্থক —এ ভেদ সম্বন্ধে তার যে স্থূল ও কড়া ধারণা সে তা ভুলে গেল। যা কখনও হয় নি এমনি একটা মুখের ভাব করে সে ভিতরে গেল, আরও ভিতরে, আরও ভিতরে। প্রকৃতি ও পরিস্থিতি যেন তা'কে করুণা করছে—আহা, বেচারা যন্ত্রজীব, এই ক'টা মুহূর্ত সহজ হোক্। গেটের কাছে কালো কুত্তীটা যেন্ সেই করুণার সংকেত পেয়েছে, ঘেউ ঘেউ করল না, বরং লেজ নাড়াতে লাগল। ভিতর থেকে বন্থুর মিষ্টি ঝঙ্কার—"হ্যাল্লো, মিষ্টার দাস, অনেকদিন পরে যে, নাও বিড়ি টানো, এই টুনু, আর এক কাপ চা আন্।"

গম্ভীরভাবে টেবিলের পাশ থেকে সন্টুবাবু:—"কি হে, কি মনে করে?" বন্থু বলিদত্তর মুখে হাত বুলাচ্ছে, নাটক করার মত বল্ছে "আহা, মুখটি শুকিয়ে কালো কাঠ হয়ে গেছে, আপিসে সায়েব্ মেরেছে বুঝি? ওরে, ব্যাটা! এখানে এলে যে হাস্‌তে হয় তা জানিস্ না? ভাল চাস্ ত, হাস্ হাস্; নইলে, এই দেখ্।" গলার কাছে কামিজটা সে আঁকড়ে ধরেছে। বলিদত্ত চ্যাচাচ্ছে—"ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ছিঁড়ে যাবে ছিঁড়ে যাবে।"

"তবে কি ভাবছিলি 'মাঝে মাঝে কোমল পেলব পরশখানি দিও'? না, কি ঠাউরেছিস্? না হাস্‌লে আমি ছাড়্‌ব না, এই দেখ্।" বলিদত্ত যন্ত্রণায় অধীর হ'য়ে হাসছে। কখনও হাসে নি এমন লোক শুক্‌নো মুখ ভেঙচে দাঁতের ওপর ঠোঁট তুলে দিয়ে হাসির যেন একটা প্রেতরূপ দেখাচ্ছে। তারই দিকে চেয়ে সারা ঘরের লোক হাস্‌ছে। বন্থু তবুও ছাড়্‌ল না "আহা হা, এ কি হাসি? বাড়ীতে কেউ না থাক্‌লে ত' এই হাসি দেখাস্; হ্যাঁরে বউছেলে ভয় পায় না?"

"ছাড়্, বখাটে!"

"আচ্ছা, বোস্, গেল্ এবার গরম চা, এই ভাজা দু'টো চিবো; মাঝে মাঝে হাস্"—মাথার পিছন দিকে আল্‌তো ঘুষি মেরে বন্থু তাকে বসিয়ে দিল। মুখে মুচমুচে ভাজা, গলায় গরম চা, বলিদত্ত যেন বাড়ী ফিরেছে, কথা বলতে তার আগ্রহ ও উৎসাহ যেন বেড়ে যাচ্ছে, বল্‌ছে

"বুঝলি, বনু, তোর এখানে এলে তোর কুকুর যেমন দু'হাত তুলে আছড়ে, ঝাঁপিয়ে নখে আঁচড়ে, জিভে চেটে সম্ভাষণ জানায়, তোর সম্ভাষণও ঠিক্ তেম্নি ভাই, না হ'লে কি সাধে বলে—বনুঃ, বনু, বানরঃ ?"

"এই শুরু কর্‌ল রে, ছোঁড়া শুরু কর্‌ল। কিন্তু বানরঃ আর কুকুরঃ ঠিক্ এক কথা নয়।"

"তারপর, বলিদত্ত" সন্টুবাবু বললেন্ "ক্যামন্ চল্‌ছে ?"

"কি আর চলবে সন্টুদা, সংসারের জঞ্জাল লেগেই আছে।"

"সংসার ? ক'টা সংসার তোমার ? শোন, ওহে বনু ? জয় জগন্নাথ।" এখন সন্টুদা শুন্‌তে প্রস্তুত, আগন্তুকের কথা উল্‌টে দিয়ে একটা সরস প্রশ্ন করে তিনি চুপ করে যান্, চোখে হাসি ঝিলিক দেয়, ঠোঁট্ ঈষৎ কোঁচ্‌কানো, আর, কথা নেই।

বছরের পর বছর গড়িয়ে গেছে, পৃথিবী বদ্‌লায়, লোকটির চিক্কণ কালো চুল পাঁশুটে হয়, কানের ওপর দিকে যেন ঘুণ-ধরা ধূলো ; কিন্তু সন্ধ্যার পর রোজ, প্রত্যহ বনুর ছোট কামরাটিতে টেবিলের পাশে বসে থাকেন্ সন্টুদা—সংযত, ভদ্র, প্রায় নীরব ; কপালের পরিসর বাড়িয়েছে অর্ধেক মাথার চক্‌চকে টাক। ঈষৎ অবসন্ন, সুন্দর চেহারা। সন্টুদা বনুর কুঠ্‌রীর মতই। তাঁর দিকে তাকালেও চল্‌তি দুনিয়ার হিসাবের পাল্লা হাত থেকে খসে পড়ে ; সবাইয়ের থাকে পরিচয়, যেন শুধু তাঁরই নেই।

অবশ্য তাঁর সম্পর্কে মোটামুটি কয়েকটি কথা সবাই জানে, বনুর মুখ থেকে ও তাঁর হাবভাব, কথাবার্তা থেকে তার আভাস মেলে। বনু বলে—তিনি কি যেন একটা ঠিকাদারী করেন, বাড়ীতে সচ্ছলতা না থা[illegible]ও, বেশ স্বাচ্ছন্দ্য আছে। দার্জিলিংএও নাকি তাঁর বাড়ী ও ব্য[illegible]ছে। বনু আরও বলে যে, তিনি এক ধরনের আজব লোক, গোপনে উত্তর এশিয়া ও ইউরোপের অনেক অঞ্চল ঘুরে এসেছেন ; হিমালয়ের ও প্রান্তে বিপদসঙ্কুল গুপ্তচরের কাজও করেছেন, জীবন বিপন্ন করেও। বন্দুকে হাত অব্যর্থ, নিজে মেরেছেন বহু গুপ্তচরকে, তিনি নাকি তান্ত্রিক, অলৌকিক ক্ষমতাশালী ইত্যাদি।

অবশ্য বনু দিনরাত অবিরাম খুব গোয়েন্দা উপন্যাস পড়ে ; কয়েকটি বিষয়ে গোড়া থেকেই তার আশ্চর্য সব অভিজ্ঞতা আছে—যথাঃ— সে বলে, অষ্ট্রেলিয়ায় একরকম ফুল আছে যা মাটির নীচে গাছে থাকে, বর্ষার প্রথম বাজের শব্দে মাটি ফেটে তার ওপর ফুটে ওঠে সেই এক ও একমাত্র ফুল। এইসব কারণে বন্ধুরা বনুকে বলে 'ভুঁই-

ফোড়' ও তার কথায় ৭৫'৮ দশমিক ছাঁটতে অপরে উপদেশ দেয়।
কিন্তু সণ্টুদার হাবভাব ও কথাবার্তা থেকে আন্দাজ করা যায় তাঁর গভীর জ্ঞান, গভীর দার্শনিকতা, প্রচুর মানব-অভিজ্ঞতা। মুখ দেখে কিছু ঠাওর হয় না—তাঁর দৃষ্টি সুঁচের মত বেঁধে অন্যের মুখ-চোখে। তর্কে যেন তাঁরই শেষ কথা, তা'র উত্তর নেই। জাগতিক ফলপ্রাপ্তিকে মূল্য দেয় না ; এক ধরনের খুব উঁচু মার্গের ভাগ্যবাদই তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। যখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলেন, 'সবই গোবিন্দের ইচ্ছা', তখন তাঁর কথার ভঙ্গীতে, ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনায় পৃথিবীটা জ্বলে উঠে একবার ঘুরে গিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার তা দেখায় খুব কাছে, চিরশ্যামল, চিরসুন্দর।

তিনি উড়িয়া ও বাংলা তুইই বল্‌তে পারেন। বাংলা বল্‌লেও তাঁর মানবিকতায় আড় আসে না ; তিনি সেই একপ্রকার তুর্লভ মানুষ যাঁর পরিচয় শুধু মনুষ্যত্বে, জাতিতে নয়, ভাষাতে নয়। যে ধরনের লোকের সঙ্গে কেবল 'বঙ্গ আমার' মার্কা বাঙালীকে ভুল করা অসম্ভব।

হঠাৎ বলিদত্তর মনে পড়ল, চাকরীবাকরীর বিষয়ে বন্ধুর সঙ্গে একটা আলোচনা আরম্ভ করে দিলে হয়। কাজকর্মের পর বাড়ী ফিরলে তার মন তা'ই ত' চায়। ছটফটে মন নিজে থেকেই বাঁধা গতে ফিরে যাওয়া, তা'ই ত তার মনের খোরাক। আলোচনা সত্যি দরকার। যে আপিসের কাজ গোটা জীবনের শিল্পকর্ম, যা নিয়ে কাটে জীবনের জাগ্রত সময়ের বেশীরভাগ, যা জীবন ধারণের অবলম্বন, ভবিষ্যতের সিঁড়ি ও পিঁড়ি, তুই-ই—তারই বিষয়ে উন্মত্ত চর্চা !

"ওরে বন্ধু, আজ সায়েব—" কিন্তু সণ্টুদার দৃষ্টি খোলাখুলি বিঁধছে মুখে এসে, বিড়ির তু'পাশে বন্ধুর ঠোঁট বাঁকছে। তু'জন শ্রোতা জগু ও রাধু অতিশয় মনোযোগ দিয়ে তার দিকে তাকাতে শুরু করেছে, এবং নন্দ—যে এতক্ষণ একটা সচিত্র মাসিকপত্রে নারী চিত্রের তারতম্য লক্ষ্য করতে ব্যস্ত ছিল, সেও হঠাৎ মুখ তুলে দেখছে। বলিদত্তর কৌতূহল উবে গেল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে চা সাবড়াতে মন দিলে ; তার মগজে খেল্‌ছে—এরা সত্যিই কি ? জীবনের সমস্যাকে এত হাল্‌কা করে খালি বিড়ি ফুঁকে উড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াসী, প্রগতির জন্য এদের পরিকল্পনাই নেই !

এই যে বন্ধু, ভাবলে তুঃখ হয়। ছোক্‌রার কি সুন্দর হস্তাক্ষর, কি প্রচণ্ড ইংরেজী জ্ঞান, কত চট্‌ করে কাজ বুঝে নিতে পারে, কি

শীগগিরই না তা শেষ করতে পারে, সকলের সম্মান অর্জন করে শেষে সে উপরওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে। একটাও কথা যদি সইতে পারে? এক কথায় দশ কথা শুনিয়ে দেয়। বলে, তা'র মর্যাদায় ঘা লেগেছে; আচ্ছা, উপরওয়ালার কি আত্মসম্মান নেই, খালি তা'রই আছে? আরে বাবা, চাকরী করতে গেলে···; ছাড়, সে শুনবে না, এখানে বলা বৃথা। সর্বদা ফিটফাট চেহারা, কাঁধ উঁচু করে, ছাতি ফুলিয়ে চলা, যেন চাকরী করতে যাচ্ছে না ত' যাচ্ছে যুদ্ধ করতে।

আঃ, তার নিজের যদি এত ক্ষমতা থাকত—বলিদত্ত ভাবে। বাড়ী ফিরে—কেন, মাঝে মাঝে উপরওয়ালার বাসায় গিয়ে, একলাটি দেখে সেবা-কার্পণ্য উপায়ে মন জুগিয়ে সম্পর্ক পাতালে কি হয়? না, ঘরের চা পরকে খাইয়ে, ভ্যালা এই বসে বসে আড্ডা মারা। নয় ত'বই পড়া, গাদা গাদা বই, ঘামে-ভেজা পয়সা দিয়ে বই কেনা, মাসিকপত্রের চাঁদা জোগানো, খবর কাগজ রাখা! আশ্চর্য, আরে বাবা, চাকরীতে একবার ঢুকলে পরে এ বই পড়ার দরকার কি? তখন ত' একমাত্র বই—কার্যশাস্ত্র। নাঃ, চোরা না শোনে···

ফের দেখ, উপরওয়ালার মতের বিরুদ্ধে নিজের মত খাড়া করা, আবার তা'দের ভুল বের করা—এসব কি পাগলামি! বর্ষা দেখে ছাতা না দেখিয়ে···অসম্ভব, এ কিছুতে বুঝবে না। বুঝলে নিজেই একটা কেও-কেটা হয়ে বসত। কত লোকই ত' উঠে গেল, আরও কত ওপরে উঠবে—এ গুণ্ডা যেখানে, সেখানেই।

বন্ধু বলে, তার পূর্বপুরুষ ছিলেন নাম-ডাকওয়ালা জমিদার, এখনও গাঁয়ে প্রতিপত্তি আছে; কিন্তু এ ত' প্রভুত্বের মনোভাব, হয়ত প্রভুত্বের পতনের বড় কারণও। রাজ্যের যত বড় বড় পরিবার—মন্ত্রী, ব্যবসায়ী, তুঙ্গ-কর্মচারী—বন্ধু বলে, কেউ তার ভাই, কে নাকি মেসো; যদি কেউ তা নিয়ে তর্ক করে, বন্ধু তাহলে বংশতালিকা হেঁকে দেয়।

এ এক নিপাট সামন্তবৃত্তি; উড়ন্ত পাখীকে আত্মীয় মনে করে তা'র সঙ্গে মিতালী পাতবার জন্য দু'পাশে কুলো বেঁধে উঁচু ঢিবির ওপর থেকে লাফালে মানুষের কি উপকার হয়? বরং বুদ্ধি থাকলে সেই সব বড় বড় লোকের পিছু নিয়ে বন্ধু কি নিজের আখের গোছাতে পারত না? একটু হাসি মুখ করে, দাঁত কেলিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে, একটু নুইলে, একটু দমলে—যেতে দাও, হবে না—। তুচ্ছ অহমিকা, মূর্খ আর কি!

কিন্তু তবুও রাগা যায় না বন্ধুর ওপর। কেন? সেখানে কি অজানা শক্তি, কি অজানা মোহিনী বিদ্যা, সেই তক্তকে ফর্সা পাতের মত লেলিহান লম্বা শরীরে ত'ার প্রাচীন পূর্বপুরুষদের কোন্ অজানা চুম্বকশক্তির পরিচয়? সে সহজেই সহানুভূতি জন্মায়। এই ছোট কুঠরীটিতেও সে পায় নেতৃত্ব।

তা ছাড়া, মনে পড়ে—সে সারা দুনিয়ার স্বয়ংনিযুক্ত বেগার-ঠেলা লোক। কার বাড়ী ব্যারাম্, রাতে জাগবার লোক দরকার, ডাক্তার ডাক্তে হবে, বাজার থেকে কারুর কিছু আনতে হবে? আর কারুর কিছু কাজ করতে হবে? সঙ্গীসাথী চাই? মন খুলে দুঃখ শোনা-বার শ্রোতা প্রয়োজন? বন্ধু সবেতেই হাজির।

বাজারে দেখা হলেই তা'র ডান হাত অম্নি ডান পকেটে সেঁধোয়, বেরোয় একটা বিড়ি; সরু সরু, ছোট ছোট বিড়ি, সেগুলোর মাথা সেঁকা। আগে সিগারেট বেরোত, এখন কাল পাল্টেছে। আবার বাঁ পকেট থেকে সঙ্গে সঙ্গে বের হয় এ ব্যক্তির আভিজাত্যের অভি-জ্ঞান—একটা ছোট মেটাল্ লাইটার, তার ভেতরে একটু পেট্রোল। খচ্ করে হাড্ডিসার বুড়ো আঙ্গুলে টিপে বন্ধু তার পাথরের চাক্তিটা রগড়ায়, বন্ধুর মুখে বিড়ি গুঁজে দিয়ে আগুন লাগায়, কাঁধের কাছে হোক্, হাতের কাছে হোক্, কামিজটা খাম্চে বলে "কোথায় চল্লি, থাম্।"

বলিদত্ত চুপ্চাপ্ চা খাওয়া শেষ করল। ঘরসুদ্ধ সকলের চায়ের কাপ খালি, সকলের মুখে জ্বলন্ত বিড়ি, গল্প চল্ছে, যা যার খুশী। খবর কাগজের কথা, রাজনীতি, সাহিত্য, সন্টুদার দর্শন।

বলিদত্ত ওসব বোঝে না, বারংবার হাই তুল্ছে। তাক্ ভর্তি এত কি বই রেখেছে বন্ধু? মানুষ মিছিমিছি এত পড়েও! অপছন্দের নজর ঘোরাতে ঘোরাতে, চোখে পড়ল নীল্চে মলাটের ছোট একটা বই—তার ওপর লেখা "ব্যবসায়ের চিঠি লেখার প্রণালী।" মহাতথ্য আবিষ্কারের মত জ্বলে উঠলো বলিদত্তর চোখ, অতি আগ্রহে কুড়িয়ে নিল বইটা। বন্ধুর তা নজর এড়াল না এবং হঠাৎ কোন স্মৃতি যেন মনে পড়ে গেল, তাই তার মুখের ভাবও বদ্লে গেল, আধপোড়া বিড়িটা জোরে দূরে ছুঁড়ে সে উত্তেজিত ভাবে বল্ল—"জানো সন্টুদা, আজ কি হোল? কাজ সেরে একখানা বই নিয়ে যেই বসেছি, অম্নি ঘরপোড়া হনুমান এসে বল্লে 'আবার জরুরী কাজ এসেছে, এটুকু করে দিতে হবে'—সে সব হবে আবার গাড়ীখানেক কাজ।

রাত ভোর হয়ে যেত। বল্‌লাম্‌—'এখানে কেন, আজ্ঞে! এ ত' আপনার নতুন জামাইয়ের কাজ, আমার কাজ ত' আমি শেষ করেছি; যান্‌, তার কাছে দিন্‌; সে করলে না বলে আমার মাথায় চাপাবেন না কি?' 'তখন সে বল্‌লে 'সায়েব জিদ ধরেছে, করে দিতেই হবে।'

"কি বল্‌লাম, জানো? বললাম, 'আজ্ঞে, আপনার নতুন জামাই-য়ের এই কর্তব্যটুকু আমার ওপর চাপাবেন, না আরও? তা'হলে সোজাসুজি আমাকেই জামাই করে নিন, আর কেন? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—"

সকলের হয়ে একজন জুত্‌সই জবাব দিয়েছে, সারা ঘরে তাই হো হো হো হো; এ যেন রুদ্ধ হিংস্র চিন্তার জন্তু, চিৎকারে আত্মপ্রকাশ!

এদিকে অজ্ঞাতে বলিদত্তর চোখ জ্বলে উঠেছে, সেও হাসিতে মেতেছে, ক্ষণেকের জন্য ভুলেছে যে সে উন্নতির উপাসক। উদগ্র আগ্রহে একসঙ্গে বন্টুর মুখ থেকে কথা চেটেপুটে নিতে সকলের চিৎকার—"তারপর, তারপর?" বলিদত্ত, নন্দ, জগু, যে ঠুকঠুক টাইপ করে; রাধু, যে দিনরাত হিসাব কষে। "তারপর?"

"তারপর? তারপর লঙ্কা জ্বালানো কালামুখো একদম লঙ্কা মরিচের মত লাল হয়ে গেল। বল্‌ল 'কাজের সময় বই পড়া হচ্ছে, কাজ বাত্‌লালে জবাব, না? কোম্পানী মাগনা মাইনে দিচ্ছে, না?"

"আমার ত'হাত নিস্‌পিস্‌ শুরু করেছে, আর থাকতে পারি না। বল্‌লাম 'গেটাউট্‌'—তারপর—"

গেট্‌ আউট বলেই বন্টু তড়াক্‌ করে এক লাফ্‌ দিয়েছে, ছোট টেবিলটা কাৎ, খালি চা কাপ প্লেট মেঝেতে পড়ে ঝন্‌ ঝনাৎ। আস্তে সে সব কুড়োতে কুড়োতে নিজের মনেই সে বলে চলেছে "নয় ত কি? সব সময় কচর্‌ কচর্‌; সে কি ধর্মের ষাঁড়? তার কি দরকার?"

সণ্টুদা গম্ভীর। বল্‌বার প্রয়োজন থাক্‌লে, তিনি নিশ্চয় বলতেন—"উত্তেজনা মানুষের ক্ষতি করে, আয়ু নষ্ট করে—শাস্ত্রে বলেছে।" কিন্তু অন্যেরা তবুও আগ্রহে অধীর। এ ভীষণ উপদ্রবে বলিদত্ত শিউরে উঠে সেঁধিয়ে পড়েছে নিজের খোলসের ভিতর; কিন্তু তা'র আগ্রহ দমেনি। নন্দ বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে বসে গেছে, গোছা গোছা চুল তা'র কপালে ঝুল্‌ছে, নন্দ বল্‌ছে—"তারপর?"

"হ্যাঁ, বলছি, শোন্‌। কুঞ্জ আর্দালী এসে বললে—'ছোট সায়েব জানতে চান—এ ঘরে কি হচ্ছে? গোলমাল কিসের? বললাম

'যা বল্‌গে যা, এ ঘরে হোম হচ্ছে'। ছোট সায়েব যজমানী পুরুতের ছেলে কিনা—"

চারদিক থেকে—"বাঃ—বাঃ—বাঃ—"

"এখন বাহ্ বাহ্ করবে না কেন?" সণ্টুদা বললেন "নিজের গায়ে ত' লাগছে না। কিন্তু এই বাহ্ বাহ্ শুনবার জন্যে নিজের সর্বস্বে আগুন লাগিয়েছে যে, সেই বনু পাবে শুধু ছাই পাঁশ। সবাই বাঃ বাঃ বলে, আবার দিব্যি খোসামোদ করে এগিয়ে যাক, আর বনু যাক চুলোয়। ওরে পাগল, এ পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। চাকরী না করিস ছেড়ে দে; চাকরী করবি ত'কর্—"

"আপনি একথা বলছেন না, সণ্টুদা; একথা বলছে আপনার পরম্পরা" তিক্তভাবে মুখ বিকৃত করে নন্দ বলল, "সবাই জানে, বাঙালীরা ভাল চাকরী পায়; ইংরেজ আগে সেখানে পৌঁছেছিল, তারা আগে ইংরেজী পড়েছিল। তা বলে আমাদের ত' তা রপ্ত হয় নি, আমরা ত' তা পারব না—"

"না পারবি, ত' মর্ তোরা; অত বক্ বক্ কিসের?"

"ইস্, এমনি মরব না কি? আফটার ইউ, স্যর।"

"শোন নন্দ," সণ্টুদার গলা গম্ভীর; তিনি বিশেষ কিছুই করেন নি, শুধু কোটের নীচে হাতটা ছ'বার আড়াআড়ি রেখেছেন; তাইতেই তাঁর মধ্যে জেগেছে যাদুকরের ভঙ্গী, কিছুটা ভয়ঙ্কর দেখতে, নাটকে যেমন কাপালিকের রূপসজ্জা, মনে হচ্ছে যেন বগলের নীচে বোমা আছে! সবাই চুপ।

"শোন নন্দ, শুধু গায়ের জোরে বীরত্ব ফলায় না, বুঝলে?...আরে, সবাই মৌনী হয়ে গেলে যে," তারপর তাঁর আছোলা, শান্ত হাসি... মনে পড়ে বনু বলে 'উনি তান্ত্রিক'। আবার ঘরের আবহাওয়াটা সহজ করে দিয়ে তিনি বলে চললেন স্বাভাবিক গলায়—"বুঝলে নন্দ, অপ্রিয় কথা বলা তত কষ্ট নয়, অপমান করা আরও সহজ। তুমি যেমন ওড়িয়া বলে গর্ব কর, আমিও তেমনি বাঙালী বলে গৌরব করতে পারি; অথচ আমরা একই ধূলোমাটি, একই ছাইপাঁশ, গর্ব করবার যে কোনও একটা গুণ মনের সামনে ধরে রাখলেই হোল। তুমি গর্ব করতে পার যে, চোখ থেকেও তুমি অন্ধ আর আমি গর্ব করতে পারি এই বলে যে, আমার চোখ আছে। আমাদের গর্বে কিন্তু পৃথিবী ওলটাবে না। বাঙালী আগে চাকরী করতে শিখেছে? বেশ ত, তোমরা সে পরিস্থিতিতে থাক্‌লে, সেই দেড়শো

বছরের ষ্টার্ট পেলে, তোমরাও তা শিখতে আরও ভাল করে, আঙুর টক্ বলার দরকার হোত না তোমাদের পক্ষে। এ হ'ল অর্থনৈতিক সমস্যা, এতে সংকীর্ণতা জাগিয়ে প্রাদেশিক লড়াই লাগালে তুমিও যেমন গোপবন্ধু দাশ হবে না, আমিও তেমনি হব না চিত্তরঞ্জন দাশ! এ সব কেন? ছাড়, যেতে দাও। আমাদের যে কথা হচ্ছিল, বুঝলে বন্ধু, তোমার কিস্সু হবে না। গুড্ নাইট।"

"নীট্", বন্থু বলল; সে গোয়েন্দা উপন্যাস পড়ে! হাসতে হাসতে কপালে তিন টোকা মেরে সে "—নীট" বললে; কল্পনায় অবশ্য লণ্ডনের একটা ঘিঞ্জি গলি, ককনী ড্রাইভার গোয়েন্দা সেক্সটন্ ব্লেকের কাছ থেকে ট্যাক্সি ভাড়া পেয়ে বিদায় জানাচ্ছে।

ঘর জুড়ে হাউ হাউ। বলিদত্ত চুপ করে বসে, বিবাদ-বিতণ্ডা থেকে সে বহু দূরে। এখন তার মুখ আহত, বিরক্ত।

"সন্টুদাকে এত উত্তেজিত আমি কখনও দেখি নি" রাধু বললে।

"ধ্যাৎ, নন্দ, তুই যা নয় তাই বললি" বন্থু বললে।

"উঃ, বললাম ত' বেশ করলাম। সন্টুদার সঙ্গে আমার বিবাদ নেই; ওঁর কথা কে না জানে? আমি বললাম ওঁর জাত ভাইয়ের কথা। আমাদের ঠাট্টা করবে, সবাইকে টিটকারী দেবে; ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের জ্বেলে পুড়িয়ে খেলে, সব জমিদারী, যত চাকরী—এখন আবার আমাদের আপিসে যে মেজো সায়েব এসেছে, জানিস ত' তার কথা?"

অস্বাভাবিক করুণ-কণ্ঠে বন্থু বললে "আহা, সবই দানাপানির কোঁদল রে, শুধু দানাপানির কোঁদল; ভিক্ষের ভাঙা সানকিতে একমুঠো ভাত, তারই জন্য—" সত্যিই যেন সে উগ্র বন্থু নয় যে একটু আগে পা ঝটকে বলেছিল 'গেটাউট'। তার ভিতর থেকে কথা বলছে জগন্নাথের দেশের সর্বত্যাগী উদারতা-মাখা তারই কোন পূর্ব-পুরুষ যে নবীন, যে সদানন্দ—দূরে দৃষ্টি বিছিয়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাসের পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে মনে মনে বলতে লাগল "কী সুন্দর দেশটা ছারখার হয়ে গেল, হাঃ—"

হঠাৎ তার সহজ স্বর ফিরে এল, বললে "নেঃ, বিড়ি খা, মাথাটা ঠাণ্ডা কর্। আজকের খবরের কাগজটা পড়েছিস না? দেখ্, ওই খাটের ওপর আছে।"—"তোমরা শালারা নিজের নিজের গোবরগাদা

আগলে আপনার প্রদেশ, আপনার রাজ্য বলে চ্যাঁচাবে, তাহলে জগৎটা কার ? জবাব দে, ভারতটা কার ?"

সভা ভাঙ্গল। হঠাৎ সকলের মনে চেপে বসল সময়বোধ। রাষ্ট্রচিন্তা, রাজনীতির ছায়া—এ সমাজে সচেতন মনে এসব যেন আশংকার রূপ ; খোলাখুলি কথা কানে শুনলে চেতন মনে প্রতিঘাত জন্মে, চোখে পড়ে আপিসের ঘড়ি, ঘড়ির কাঁটায় সাড়ে দশটার বেশী সংকেত। ঘড়ির হাত নয় ত', যেন সেই গোড়ার দানাপানি সংস্থানের ওপর আক্রমণের অদেখা হাত ; তাই তার আশ্রয়নীড় সেই আপিস ঘর। মনের গভীরে তা যেন ভাবপ্রবণ সোচ্ছ্বাস সংগীত। বন্ধ দেউলের সামনে যেন কয়েকটি হরিজন। আলো ফুটলে যে যার কাজে যায়। তবুও অন্ধকারে তাদের সেই গুনগুনানি এক হয়ে ওঠে বাজারের হট্টগোল। তাই জাগ্রত প্রহরী।

বন্ধু দরজায় খিল দিল। দিন গতে পাপক্ষয়। ভিতর দিকে চেয়ে দেখে—চেয়ার সব এদিক ওদিকে পড়ে, খাটের ওপর এঁটো চা-বাসন, এলোমেলো খবর কাগজ ছড়ানো, টেবিলের বই ইতস্তত গড়াচ্ছে, মেঝেতে অপর্যাপ্ত বিড়ির টুকরো, ছাইয়ের গুঁড়ো, এসব সাফ করতে হবে।

অভ্যাস-বশে সে গেল ড্রয়ারের কাছে মাথা আঁচড়াতে। ঘরে কেউ না থাকলে, সে মুখ দেখে আয়নায়, মাথা আঁচড়ায়। এক মানুষ উঁচু চেষ্ট্ অব্ ড্রয়ার্স্, তাও দেউলে আভিজাত্যের গৃহদাহের অবশিষ্ট একটা কুটো ; তার ওপরে পাতলা সেগুন কাঠের শেল্ফ্, তাতে দুই থাক্। ওপরে এক পাঁজা এনসাইক্লোপীডিয়া, নীচে গাদাখানেক্ বুক্ অব নলেজ।

আয়নার কাছে ফটো একটা—সেও তার স্ত্রী ; পরীর মত তার স্ত্রী—শেফালী, বন্ধু ঠাট্টা করে ডাকে—'ঝিঙে ফুল।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বন্ধু মাথায় চিরুনী চালাল ; মনে পড়ল নানা কথা—চারমাসের খবরের কাগজের দাম বাকী, দোকান থেকে চা আসছে বাকীতে। ধার কর্জে ডুবে আছে, মাথা বিকিয়ে গেছে ঋণে। পোয়াতী শেফালীকে রান্নাও করতে হচ্ছে, ঘর ঝাঁট দেয়, বাসন মাজে, তার ওপরে আছে ছেলেপুলে সামলানো।

দশ বছর হতে চলল, শেফালীকে ও কি দিয়েছে ? একখানা দামী শাড়ী ? প্রসাধনের জোরে বাঁদরীও উর্বশী হয়ে যায়, মটর চালায় ; প্রসাধনের অভাবে মেনকা কুঁজো হ'য়ে শতচ্ছিন্ন তাপ্পী-মারা কাপড়

পরে উঠোন ঝাঁট দেয়, কপালের টিপ ধেবড়ে এঁটো বাসনের কালি ওঠায় রগড়ে রগড়ে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বনু ভাবে—আঃ, তার সোহাগের 'ঝিঙে ফুল' শুকিয়ে যাচ্ছে।

বনুর দু'চোখে আগুনের আঁচ, উদাসভাবে চেয়ে আছে সে, চওড়া কপালে থেকে থেকে যেন কালো ছায়া পড়ছে, সরু সরু সমান্তরাল রেখা ফুটে উঠছে। ওপরের দিকে চাইলে সোনার জলে লেখা 'বুক্ অব নলেজ'। "ড্যাম্" চিৎকার করে বনু এক লাফে উঠোন পেরিয়ে হাঁকল "ভাত বাড়ো।"

□

অন্ধকারে একা একা চলেছে বলিদত্ত; নিজের ওপর রাগ হচ্ছে। কেন সে এত সময় নষ্ট করল? রাগ হচ্ছে বনুর ওপর। খুঁটে খুঁটে যতই সে বিশ্লেষণ করছে ততই তার হিংসে বাড়ছে। মনে পড়ছে নিজের সমস্যা, নিজের আদর্শ; এক দিকে এংকট্ রাও, আর একদিকে এই বনু। ভবিষ্যতের তারতম্য চোখের সামনে জ্বল্ জ্বল্ করে; যে যেমন, সে তেমনি অবশ্যই ফল পাবে। মধ্যিখানে যুক্তি তর্ক হিসাব কষা শুরু করলে ওলটপালট হয়ে যায়। ভাগ্য কখনো কখনো দেখা যায় না; কিন্তু তা ক'বার? প্রগতিবাদী মানুষ ভাগ্য-বিশ্বাসটাকে অত বড় করে দেখতে রাজী নয়, কাজের হিসাব কষে গুনে দিচ্ছে যা দেওয়ার, আবার হিসাব কষে সুদে-আসলে গুনে নিচ্ছে নিজের মেহনতের পাওনা। বনু নিজে নিজের পায়ে কুড়ুলের ঘা মেরে চলেছে, এতে ভাগ্যের কি দোষ?

ছোট ছোট পদক্ষেপে তরতর করে রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে বলিদত্ত যেন ভবিষ্যৎ মাড়িয়ে চলছে; হঠাৎ সে যেন বড় হয়ে গেছে; মাথা উঁচু করে আকাশ না ছুঁলেও, আকাশ যে নেমে এসে তার মাথা ছুঁই ছুঁই করছে। চারপাশে ফুলফোটা তারা; পায়ের তলায় অন্ধকারে পৃথিবী লুটোচ্ছে। এমনি করেই সে দুম্ দাম্ পা ফেলে জগৎ জিতে পিষে মাড়িয়ে এগিয়ে যাবে অভীষ্টের দিকে, সে যাত্রা-পথের ধারে ছোট ঢিবির পাশে, খুদে কাঁটা ঝোপের কাছে ভেঙ্গেচুরে নুয়ে দলা পাকিয়ে বসে থাকবে বনু, দাঁত কেলিয়ে বসে ওপরের

পানে চেয়ে ; আরও ওপরের পানে। না, দয়া নেই, মায়া নেই। নিজের কর্তব্য করতেই হবে। বলিদত্তর ভিতর থেকে আওয়াজ দিচ্ছে সায়েবের স্বর—নির্মম, কার্যকুশল।

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—বলিদত্ত হেসে উঠল।

একটা মনের খেয়াল, মুহূর্তে, আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ান, হিটলার। না, আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট্ From Log Cabin to White House। সচ্চরিত্রতার জন্য সে একবার প্রাইজ পেয়েছিল একটা মোটা বই—ঠিক ঠিক, ওই বইটাই। কিন্তু তার হোয়াইট হাউজ একটু আলাদা ধরনের যে—তা হ'ল একটা বড় আপিসবাড়ী যার মালিক সে নিজে। একধারে সারি সারি টাইপরাইটার ঠকাঠক্ বাজিয়ে চলেছে মালিকানার নহবৎ যন্ত্রসঙ্গীতে ; কাজে ব্যস্ত অনেকগুলি মুখের গুঞ্জন ; সেখানে যেন সঙ্গীতের আলাপ ; এ মাথা থেকে ও মাথা যাওয়ার সময় পাকা ধানের শীষের মত নুয়ে পড়ছে ধারে কাছে সকলে ; এদের ফসল তুলে সে পাবে কর্তব্যসাধনের অমোঘ তৃপ্তি, অক্ষয় যশ। তারপর—বেলুন উড়ে চলছে তার, পদবীর মাত্রা বাড়ছে। নিরেট বাড়ী সব সারি সারি, জোত জমি—যতদূর চোখ যায় ; খানচারেক গরুর গাড়ী চাষের জন্য, ভাড়ার জন্যও। শহরে ভাড়া খাটার জন্য চার ছটা রিক্সা। এবং নিজের জন্য একটা মটর ; আরে মটর ত' নিশ্চয়, একখান্ জীপও, তীরবেগে চলবে।

তবুও সুস্থির কল্পনা না হয় শৃঙ্খলাময় বা সমন্বিত।

অভ্যাস নেই, হবে ধীরে ধীরে।

বাঁশ বড় হলে, সাঁকোও স্বতঃ বড় হবে।

হঠাৎ সামনে পড়ল এক পুলিশ। স্থির, গম্ভীর উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসছে, কি শীগগির, ওঃ ! নিদেন পাঁচহাত লম্বা ! কেন, হে ভগবান, অন্ধকারে তার দিকেই কেন ? বেচারা, নিরীহ বলিদত্ত, কোম্পানীর চাকর মাত্র ; রাজনীতি থেকে সে বহুদূরে, চুরিচামারি তেমন কিছুই ত' করেনি। অথচ তারই মাথার ওপর এগিয়ে আসছে মোটা একজোড়া কালোহাত ; আত্মারাম প্রায় খাঁচাছাড়া, ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে সে, মুখে ঘাম আর যেন আগুনের তাত, গলায় আওয়াজ বেরোচ্ছে না। সাঁড়াশীর মত হাত দুটো প্রায় জাপটে ধরেছে গলার কাছটা, মুখের কাছে মুখ এগিয়ে আসছে, কামড়াবে নাকি ? পিঠে পড়ল গুম করে ভাদ্রের তাল, বারুদ ফাটার আওয়াজ যেন—

"শা... আরে, এমন কাঁপছিস কেন বাপধন, কিছু ফাঁসিয়ে এসেছিস কোথাও নাকি রে ব্যাটা, হাম রাস্তা নেহি ছোড়েঙ্গে তোকে, জানিস এটা আমার বীট ?"

"কে, রাজু নাকি ? ওঃ, এত ছ্যাঁচড়া হ'লি কবে থেকে ?"

"হ্যাঁরে, কোন্‌দিন আবার ভাল ছিলুম ? শ্লা, কাঁপছিস কেন বল্ ? ভয় করছে ত' আমার গায়ে ঠেস দে। বান্দা যা ছিল তাই আছে, এভরেডী। তুই শা না হয় আকাশে উঠে গেছিস, 'পূর্বপ্রীতি আছে কি গো মনে, না কি বল্ ?'

ভারী রাগ ধরছে বলিদত্তর, কিন্তু মনে মনে হুঁশিয়ার যেন অভদ্রতা না হয়। এ হ'ল রাজু, ছেলেবেলার বন্ধু; ছোটবেলার স্মৃতি যেন বড় বয়সের খোঁচা ভরা গালে লজ্জা মাখাচ্ছে। ওকে মুখোমুখি কিন্তু বাৎলাতে সাহস হচ্ছে না, ওর লাগামছেঁড়া মুখে কিছুই আটকায় না, ব্যাদড়াটা যা নয় তাই বলে বসবে।

এই রাজু এক বিখ্যাত জমিদার বাড়ীর ছেলে, হালে পুলিশ কনষ্টেবল। ফন্দী এঁটে বলিদত্ত বললে—"জমিদার বাড়ীর ছেলের পুলিশী চাকরী রুচছে কেমন রে, রাজু ? সব ভাল ত' ?"

"আরে, সে জমিদারীকে মারো গোলী। চাকরীতে আমরা সবাই জমিদার।"

"কি রে, জমাদার বনেছিস নাকি ? আচ্ছা, তুই না মফস্বলে ছিলি ? বদলী হয়েছে বুঝি ?"

"হ্যাঁ, বদলী হয়ে এসেছি; জমাদার হলেই বা কি, আর না হলেই বা কি ? যা হোক করে পেট ত' চলছে, না কি ? বাপ পিতেমোর সঙ্গে জমিদারী ত' গেল, ফুর্তি লুটে পড়াশুনোও হ'ল না। তবে বাপদাদা একটা চীজ দিয়ে গেছেন—তা এই বপুখানি ; দেখা হলে সায়েবও বলে "তুম্ বহুৎ খুব।" বাস, তাই বেচে, ভাঙ্গিয়ে জীবন নৌকো ঠেলছি আর কি। কিছু আটকাচ্ছে না ত'। আচ্ছা, তুই এতদিনে কতদূর গেলি, বল্ ত'। বেশ ত' গোলগাল দেখাচ্ছে তোকে, দাঁড়া ব্যাটা, যাচ্ছিস কোথা ? হ্যাঁ, আর কিছুদিন বাদে পুরো ফুটবল ; কালোবাজারে পাঁক মাখছিস না কি রে ? বেশ খানিকটা, না ?"

"ধ্যেৎ, তোর সেই ত্যাঁদড়ামি গেল না।"

"আর, গেলেই বা হ'বে কি ? তুই ত' ভারী ভদ্র বনেছিস ; আমাদের ত' ভাই, যত চোরাবাজারী আর বদমায়েসের সঙ্গ, আমাদের কথাই আলাদা ; আর—যাহোক বহুদিন বাদে দেখা, যেভাবে

অন্ধকারে মিশে দৌড়াচ্ছিলি, আমি ত' ভাবলাম, কোথায় কি যেন ফাঁসিয়ে এসেছিস ; সন্দেহী চোখ কি না। ওঃ ভাই, বলি দুনিয়া কি বদলাল না বদলাল ; যেতে দে সে সব কথা।"

"দেখছি, তুই খুব খুশী ; নইলে সবাই যখন চিল্লাচ্ছে ; মাইনে কুলোয় না, তখন সামান্য কনষ্টেবলের কাজে…"

"আরে, কনষ্টেবলের কাজ সামান্য নয় রে, সামান্য নয়। সব কাজের মতই সেও একটা কাজ ; তুই যদি কারুর জুতো মুছছিস ত' আমি তা'কে স্যালুট লাগাচ্ছি। কাজ ত' কাজই, সবই এক।"

"বাস্তবিক রাজ, তোর স্পিরিটকে বলিহারি। এত বড় বিপত্তি এল গেল, তুই যেমন ছিলি তেমনি। তোর প্রতি ভাই, আমার ভক্তি হচ্ছে।"

"ভক্তি হচ্ছে ? প্রণাম কর্, প্রণাম কর্। গাঁয়ে তোর চৌদ্দ পুরুষ ত' আমার চৌদ্দ পুরুষের সামনে হাঁটু গেড়ে গেছে, আজ তুই প্রণাম করলে কি আর নতুন করবি ? আর, তুই আমার জন্য এত দুঃখ করিস না। তোর নিজের বহুৎ দুঃখ হয় ত' বাকি।"

"আমার নিজের দুঃখ ?"

"আরে, যে যত বড়ই হোক, দুঃখটা যাবে কোথায় ? দুঃখ আসবেই আসবে। এ পাশ দিয়ে এলে ওপাশ দিয়ে যাবে। মাইনে বাড়লে মাগ্‌গী ভাতা বাড়বে। এদিকে ওঠ ত' ওদিকে পড়বে। আসতে থাকবে, যেতেও থাকবে ; যেতে থাকবে ত' আসতে থাকবে। আসতে থাকবে…"

"তুই আর আমার হাতটা এমন করে খিঁচড়াস নি ভাই। যদি কেউ দেখে ত' ভাববে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের চেষ্টা চালাচ্ছে। যা লাগছে না ?"

"রাইট, কৃত্রিম নিশ্বাস তোর দরকার। এ দুনিয়া যা হয়েছে, তোমরা লেখাপড়া জানা বাবুরা যা হয়েছ, তা'তে নিশ্বাসের ভারী অভাব। আনন্দের বীজই নেই, তা তৈরী করার শক্তিও নেই। দুঃখে দম ফেটে যাচ্ছে ; এই হাত পা ছিটকানোতেই বিজনেস, বিজনেস।"

"ভাবুক কনষ্টেবল, কবি কনষ্টেবল…"

"ভাবুক ? হ্যাঁ, কবিতা আর জন্মাবে কোথা থেকে ? তুই ত' আর পাশে নেই।"

"সত্যি, তোর কথাগুলো কবিতার মত শোনাচ্ছে।"

"জানিস না, আমার দাদামশাই 'ভারতলীলা' পদাবলীর ভণিতা করতেন। ছাড়্ সে কথা। সুখে থাক্ ভাই। দেখা হলে এই স্নেহসম্ভাষণটুকু যেন বজায় থাকে। যাই, ডিউটি আছে—"

"নমস্কার।"

"ধুত্তোর নমস্কারের নিকুচি"—চলে গেল সে; লেফ্ট রাইট, লেফ্ট রাইট—খাঁটি মানুষটা এই রাজু।

কত পুরোনো জমিদার বংশের ছেলে, খানদানী ঘরের সন্তান কনষ্টেবলের কাজে ঢুকেছে; ছেলেবেলা গেছে আদরে সোহাগে; তারপর সর্বস্ব গেছে তৌজী নীলাম, দেনায়, বাকীতে; শুধু রয়েছে পিতৃকুলের চেহারার ছিটা, লোহাপেটা গড়ন, চরিত্রের বুনিয়াদ। পরম্পরাগত শাসক প্রবৃত্তি তবু চায় শাসন করতে। কাজও জোটে তেমনই।

মনে পড়ে রাজুর কথা, ওর পিছনেই দু দু'টো চাকর বাঁধা ছিল।

মনে পড়ে, বেয়াড়ামি করলেও পাঠশালায় সে হত সর্দার পোড়ো। তারপর?

না, তলিয়ে যাক্ সে অন্ধকারে কুয়োর ভিতরে, তলিয়ে যাক্, তলিয়ে যাক্।

বলিদত্ত ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ীর পথে হাঁটে। কিন্তু সে চিন্তিত, ক্ষুব্ধ।

মনে পড়ে, রাজুর মুখে হাসি ত' নেভে নি; কোথায় যেন সে পুরোনো হিসাবের অনুপাত সমান রেখেছে, কোথায় যেন তা'র উৎকর্ষ!

□

হঠাৎ যেন এংকট্ রাওয়ের গণনা ও বলিদত্তর ভাগ্য সমান্তরাল অবস্থান থেকে পরস্পরের দিকে চলেছে, দুটিরই মন ঝুঁকেছে একত্র মিশতে। সেদিন সকালের কথা—এংকট্ রাও বললে—"এবার, দাস, মিঠাই রাখিস।" অথচ সকলে জানে উঁচু হয়ে আছে সবার মুখের ওপর ওপরতলার একটিই উন্নত পদের চাকরী; প্রার্থী এংকট্ রাও, বলি ও অন্যান্য অনেকে। বলিদত্ত সন্দেহভরে তাকালো—এংকট্ রাও ঠিক বলছে ত'।

তখন কথাটা বলে ফেলে এংকট্ রাও লেনসের তলায় নিজের ডান হাতের পাতায় ঢালু জায়গাটার দিকে মনোযোগ দিয়েছে নিবিষ্টভাবে ; বুড়ো আঙুলের নীচ থেকে খুব জোরে রগড়ে চলেছে কালো দাগটাকে। তা'র মুখ উদাস। বন্ধুর প্রশ্নে মুখ তুলে বললে— "কি বললে ? ঠিক কিনা জানতে চাও ? অবশ্যই ঠিক, যদি এ সায়েন্স ঠিক বলা যায়।"

এংকট্ রাও নিজের 'ঘড়ি' ছাপ সিগারেট প্যাকেট থেকে শেষ সিগারেটটি টেনে নিয়ে মুখে গুঁজে দেশলাই জ্বালার সময় বলিদত্তর হাত কাঁপছিল ; মনে হচ্ছিল যেন আসন্ন ভাগ্যের দূরবর্তী ঢেউ এসে তার গায়ে লাগছে।

□

সেদিন দুপুরবেলা—

হঠাৎ সায়েবের হুকুম—সঙ্গে যেতে হবে বলিদত্তকে। সায়েবের বড় মোটরে সায়েবের সঙ্গে একসঙ্গে বসে এক জায়গায় যেতে হবে, কাজ আছে। বলিদত্তর মাথা ঘুরে গেল।

আপিসের কাঁচের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে আগে নিজের চেহারাটা দেখল। দেয়ালের কোণে খোলা কপাট অন্ধকারে আয়নার মত। সব কিছু দেখা যায় তা'তে। দাঁতে পানের দাগ নেই, কিন্তু জিভে আছে। কসের দাঁত দিয়ে তা ঘষে ঘষে তুলে ফেলল। রগড়ে রগড়ে কপালের ঘাম, কানের পিছনের ময়লা, নাকের সিকনি, সবই সাফ করল। পরনের পোষাকে হাত ঘষে ঘষে পদস্থ করল, খুব তাড়াতাড়ি। আয়নায় নিজেকে শেষবারের মত দেখে নিয়ে 'মা'র নাম স্মরণ করে তর তর করে ছুটল।

সায়েব তখন ঠিক গাড়ী চড়ছেন ; ঢুকেই তিনি ষ্টিয়ারিং-এ হাত রেখেছেন মাত্র ; পিছনের সীটে বসে গিয়েছে সায়েবের পরাক্রান্ত আল্‌-সেশিয়ান, জিভ তার লক লক করছে। মহা সম্ভ্রমভরে বলিদত্ত গাড়ীর পাশে পাশে এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত যাতায়াত করতে লাগল। কি যে করবে, ঠিক করতে পারছে না কিছুই। সায়েব এ পাশে একবার মুখ ঘুরোলেন ; সেও নুয়ে পড়ে স্যালুট দিয়েছিল। কিন্তু তখনই সায়েব অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কি করা যায় তাহলে ?

কি করে আবার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়? ভারী ইচ্ছে করছে জানতে; মনে পড়ল—জুতোর শব্দ করা যায়। কিন্তু যদি সায়েব তা'তে রেগে যান? ইঞ্জিন বিড়ালের মত ফুঁসতে শুরু করেছে; কি দুঃখ! স্বর্গের দরজা বারেকের তরে খুলে আবার মর্ত্যে তাকে গলাধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে কে দিব্যি দিয়েছিল? অথবা 'মেল' ট্রেন চড়তে গিয়ে দেখে দরজা বন্ধ, গাড়ী ছাড়ো-ছাড়ো, ভিতর থেকে কারা জোরে ঠেলছে। সেই দু' মিনিট তার কাছে এক যুগ!

তারপরেই সোনার রোদ্দুর যেন ঝলকালো! বড়বাবু দৌড়তে দৌড়তে এসে এক তাড়া কাগজ সায়েবের হাতে বাড়িয়ে দিলেন, সায়েব এদিকে মুখ ঘোরালেন; খুব জোরে এমাথা ওমাথা আকুল হয়ে যাতায়াত করতে থাকা বলিদত্ত ফের আভূমি নত হয়ে সেলাম করল। সায়েব পিছনের সীট দেখিয়ে হুকুম করলেন 'বোসো'।

বসতে না বসতে গাড়ী ছেড়ে দিল। গাড়ীর দরজা সে ভাল করে টেনে বন্ধ করতে পারে নি, খোলা আছে; তাই সে প্রাণপণে টেনে ধরে আছে। আবার দুশ্চিন্তা, এবার তার ঘাম বেরোল। হঠাৎ সায়েবের বিরক্ত নজর, বাঁ হাতে এক ঝটকা, 'খুট'—দরজা ঠিক বন্ধ।

এতক্ষণে বলিদত্ত পরিস্থিতির প্রতি ধ্যান দিল—বিকটাকার কুকুর, যেন একটা গৃহপালিত বাঘ—প্রকাণ্ড। হিংস্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, হাঁ করে, জিভ দেখাচ্ছে; একটা গম্ভীর গজরানি শুরু করেছে। বলিদত্তর বুকের রক্ত শুকিয়ে আসছে, গলায় আটকে আছে একটা "বাবা গো, মাগো" চিৎকার, খুব জোরে যদি সে চ্যাচাতে পারত—"খেয়ে ফেললে রে।" অতি প্রাচীন আদিম ভাবপ্রকাশের সনাতন পন্থায় বুকের বোঝা হালকা করে সচিৎকারে পালাত, ছুটে পালাত; কিন্তু চিৎকার খাটো হয়ে বেরোচ্ছে একপ্রকার সূক্ষ্ম কোঁথানোর শব্দ, ভয়ার্ত ছোট জন্তুর আওয়াজ। এতে কুকুরের মেজাজ গেল আরও গরম হয়ে। এতক্ষণে তা'র গম্ভীর গর্জন সামনের সীটে পৌঁছল এবং সায়েবের গলায় শোনা গেল—"শাট আপ, ডিক।" ডিক কুকুর এই হুকুমের অপেক্ষায় ছিল। তার গুমরানি বন্ধ; কিন্তু এখন থেকে সে বন্ধুত্ব চায়। তার প্রকাণ্ড মুখ আগের পানে গুঁজে বলিদত্তর পা থেকে মাথা তক্ শুঁকে শুঁকে সে আবিষ্কার করে গেল। তার প্যান্টের পায়ের ভাঁজ নখে আঁচড়ালো ও তার কোলের ওপর নিজের একটা ভারী পা রেখে চুপ করে শুল।

যা হোক এও একরকম সন্ধি, আশঙ্কা পদে পদে; মনটা একটু

উড়ে গিয়ে মেঘে মেঘে হারাতে না হারাতে ধীরে কে যেন ঝুঁটি ধরে ঝাঁকিয়ে দেয়, জানিয়ে দেয় "তুই এখানে, এই মাটিতে।" এইটুকু খুঁত বাদ দিলে, চেতনা উন্মুক্ত আকাশে উঁচুতে ঘুড়ির মত উড়তে সক্ষম। গাড়ী চলেছে, ত্রস্তে লোকেরা পথ ছেড়ে তটস্থ, অসংখ্য সেলাম, চেনা লোক আশ্চর্য হয়ে বলিদত্তের পানে চাইছে, যারা তাকে মশা মাছির মত মনে করে, তারাও মুখ তুলে খানিকক্ষণ তাকাচ্ছে। গাড়ী চলছেই। বাস্তবিক, চলন্ত গাড়ী থেকে পৃথিবীটা দেখায় ভিন্ন রকম। সেই একই রাস্তা, একই গলি, একই দোকান বাজার; কিন্তু ভুঁয়ে হেঁটে হেঁটে যাওয়ার সময় সেগুলো যেন চেপে বসে মনের ওপর; ঘোড়াগাড়ী চড়ে যাওয়ার সময় অন্যরকম লাগে সেগুলোই; মোটরগাড়ীতে ভিন্ন ধরনের, রেলগাড়ী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, সত্যি যেন চলন্ত সরাইখানা।

আসনের উচ্চতা ও বাহনের গতির সঙ্গে ভাগীদার হয় যাত্রীর ব্যক্তিত্বও তা'র চোখ খোলে, ভাবনা বদ্‌লায়; বদ্‌লে যায় পরিবেশের সাজসজ্জায় সামান্য রকমফের হলেও :—যেমন টেবিলটা সরিয়ে রাখলে বা লণ্ঠনটা কমিয়ে দিলে।

বলিদত্ত ভাবছিল—কি আশ্চর্য! নেশা করলেও তা'র মনটা এত ফুলে উঠত না; রাস্তায় প্রথম আধঘণ্টা সে ফুলে ফেঁপে বাইরে নজর ফেল্‌ছিল, নিজে উঁচুতে ওঠায় সবাইকে নীচে মনে করছিল। দ্বিতীয় আধ-ঘণ্টায় মনে জেগেছে উদার, সমন্বিত পরিকল্পনা, বিস্তৃত বিশ্লেষণ। নতুন ধারণা মনে ভীড় করছে, নতুন অনুভূতির স্বাদ, নতুন কল্পনা। সে যেন সত্যিই নিজের চারফুট ন' ইঞ্চি খোল ঠেলে, শালগাছের মত বেড়ে চলেছে। এখন থেকে সে নিজের দুঃখ ভুলে পরকে সহানুভূতি দেখাতে পারে।

সামনে এই সায়েব; নিশ্চয় বড় দরের মানুষ, কিন্তু ভাবলে দুঃখ হয়। কেন সে মদ, কুকুর ও ঘোড়াতে মন দিয়েছে? চুপচাপ বসে গাড়ী চালাচ্ছে, কিন্তু কী নিঃসঙ্গ, একাকী দেখাচ্ছে! কাজে ডুবলে সে কলের মত চলে, কিন্তু কাজ শেষ করে উঠলে সে জীবনের মুখোমুখি হতে পারে না, বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এই ত' সেদিন বাংলোয়—টেবিলে একগাদা কাগজপত্র পাহাড়ের মত রাখা, দোরের কাছ থেকে বন্দুক উঁচিয়ে সেই কাগজের পাঁজা লক্ষ্য করে সায়েব ঘোড়া টিপেছিল আর কি! মেম্‌সায়েব কেড়ে নিল বলে ত' না হলে কি কাণ্ড ঘটত? ও ধারে বুড়ো বেয়ারা বসে ঝিমোচ্ছিল, ধড়ফড় করে উঠে

এল। সে কি শুধু নেশার ঝোঁকে? না, তা'র গোটা জীবনের ওপরে বাড়তে থাকা বিরক্তিই সেদিন উঁকি মেরেছিল বন্দুকের মুখে?

আর মেমসায়েব? তার মধ্যেই কি মিলবে সায়েবের মনের চাবির ব্যবহারে দুর্বোধ্য, বিদ্ঘুটে জালের খেই? ভগবান জানেন। বন্ধুমহলে মেম্ নেশায় মেতে খুট্খাট্ নাচে, সায়েবের হাতে যেন তা'র ওজন মাপা হয়। আর মদ? সেদিন সে কি অবস্থায় মেঝেয় ঢলে পড়েছিল, তা'র পোষাক দু'ফালা হয়ে খুলে পড়েছিল, বেয়ারা বাচ্চার মত কোলে তুলে খাটে শুইয়ে পাখা খুলে দিল।

ছবির মত মেমসায়েব; কিন্তু ছবির মতই সে আসে যায়। গরমে তা'র চাই উটি বা দার্জিলিং, শীতে বোম্বাই, কল্কাতা। সে যেন মরশুমী চড়ই, উড়ে আসে, উড়ে যায়—একলা।

অদ্ভুত এদের দিগ্বিজয়ী সংসার। বাচ্চা দু'টি বিলেতে। বুড়ো বাপ গাঁয়ে, সেখানে ভেড়া পোষে, বঁড়শীতে মাছ ধরে অবসর পেলে। এক ভাই আফ্রিকায় উঠিয়ে নিয়ে গেছে তার বাস, সেখানে সে চাষ-আবাদ করে। বোন? হ্যাঁ, বেয়ারা বলে, একটা বোনও আছে; আগে সে জার্মানীতে গান গাইত, এখন হংকংএ এক পাদ্রীর বৌ। দিগ্বিজয়ী পরিবার বটে! গোটা দুনিয়া এদের ঘর। মরে, বেঁচে, পড়ে, উঠে চল্‌ছে এরা; বোমার ঘা'য়ে গাঁ শহর জ্বলে যায় বারংবার, থেকে থেকে যুদ্ধের শ্মশানচণ্ডীর পীঠে বলি পড়ছে উঠ্‌তি বয়সের তাজা যত তরুণ, তবুও এদের সংস্কৃতি জীবনলোভী; তা ডাক্ পাড়ছে—কাদা খাও, রক্ত খাও, বাঁচো, বংশ বাড়াও; আর ক্ষত-বিক্ষত যুদ্ধের ঘনঘটার মধ্যেও হাঁক্‌ছে পাকা বুড়োর দল, মুরুব্বী মাতব্বরেরা—এগোও, এগিয়ে চল, দুঃখের কলিজা নিংড়ে তবুও আমরা ছিনিয়ে আনব আনন্দের রস, এই আঁধার থেকেই জন্মাবে আলো; দলে', পিষে, মাড়িয়ে চল, হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে, লং লিভ দ্য কিং।

তবে সায়েব কেন উদাস, কেন ক্লান্ত?

বলিদত্ত ভাবে, কারণটা সে বুঝে ফেলেছে। সায়েবের কল্পিত দুঃখ নিজের ওপর টেনে নিয়ে সে ভাবছে বুড়ী মা'র মত—আহা, হাত বোলাই, সান্ত্বনা দিই ওর ঘাবড়ানো মনকে। প্রেয়সীর মত ভাবছে—সুখ দিই ওকে। সেবকের মত ভাবছে—মর্জি মাফিক সেবা করি।

কিন্তু চেতনায় বাধা ঘটায় সায়েবের কর্কশ প্রলাপ। একবার, দু'বার—বলিদত্ত বুঝতে পারে না, চমকে উঠে সামনে তাকাল, ঝুঁকে

পড়ল। সায়েব চুপ করে গেছে, কি ভেবে চটছিল কে জানে!

কিন্তু বলিদত্তর চেতনা পিছনে ফিরেছে, এবার সে গর্বিত, কেবল নিজের জন্য।

সামনে রাস্তা আটকে চলেছে একটা মোটরগাড়ী, পথ দিচ্ছে না পাশ কাটাতে। ড্রাইভারের কাছে বসে একজন—প্রকাণ্ড টিকি, গলায় ক'সারি মালা ও কণ্ঠি, বগল থেকে ঝুলছে লাল বটুয়া। উবু হয়ে যেন বসেছে, খুনখুনে বুড়ো মুখে খ্যাকাচ্ছে, হাতে ইশারা করছে, ড্রাইভারকে হাঁকছে "আরও জোরে, আরও জোরে।"

ভুবনী সাউ—ইটের ভাঁটির মালিক, ঠিকাদার। লড়াইয়ের মৌকায় তাঁবুর খুঁটি জুগিয়ে টাকার স্তূপ করেছে—খুঁটি পিছু এক টাকা। নতুন ধনী—টিপসই করে, খাটো ধুতি পরে।

দানাপানির যুদ্ধে জয়ী ভুবনী সাউ। থোড়াই পরোয়া—হেঁঃ—সায়েবের গাড়ীর পঁক্ পঁক্ না মেনে প্রচুর ধুলো উড়িয়ে, মাতালের মত তা'র মোটর পালাল আগে আগে।

সায়েব রেগে লাল; বাঁ আঙ্গুলের মোটা নখটা কামড়াচ্ছে।

"হেই ব্যাবু, ও গাড়ীর নম্বর নোট করেছ?"

গড়গড় করে বলিদত্ত হেঁকে গেল ভুবনী সাউয়ের নাম, গাঁ, গাড়ীর নম্বর। উচ্ছ্বাসের চোটে ভুলে গেল যে, মোটরে মালিকের নাম, তার গাঁয়ের নাম লেখা থাকে না। আর নম্বর টুকলেই বা সায়েব করবে কি? সায়েব ত' আর সরকার নয়, কোম্পানীর সায়েব। কিন্তু তা'তে ক? জিজ্ঞেস করা মাত্র সব খবর সে দিতে পেরেছে—জয় মা কালী!

"হুঁ, আচ্ছা, টুকে রাখ," সায়েব চিন্তিতভাবে বলল।

এবার ভুবনী সাউয়ের এক চোট হবে যে! কিন্তু সায়েব চিন্তিত কেন? ফের সন্দেহ, ফের অবিশ্বাস।

ভুবনী সাউ ধুলো উড়িয়ে উধাও। বলিদত্তর থার্মোমিটারের পারদ দপ্ করে নেমে গেছে, খসে পড়েছে নীচে, কোথায় সে লুকাল! সে বিশ্বজয়ী নয়, সে কিছুই নয়, সে শুধু বলিদত্ত, দানাপানির ছিটে-ফোঁটা কুড়োতে একটা পিঁপড়ে।

লোকে কি বড়লোকই না হয়েছে—ওঃ। নদীর ধারে যা'রা এককালে হাওয়া খেয়ে পেট ভরাত, আজ তা'রা কত উঁচু ডালেই না চড়েছে! ওঃ!

কুকুরটা তার ওপর অর্ধেক বপু চাপিয়ে ঘুমোচ্ছে। মনে পড়ছে—বুড়ো বাপু কি করছে। কুকুর দেখলে প্রথমেই তাঁর মুখ থেকে

বেরোত—"মার, মার, ছুঁয়ে দেবে, অশুচি করবে—"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সীটের পিছন দিকে ঠেস দিয়ে বলিদত্ত বসে রইল।

□

সন্ধ্যা।

সারা দিনের ক্লান্তির শেষে শুকনো মুখে সদর দরজায় কড়া নাড়তেই বাসি কাপড়ে ব্লাউজ পরা মাথায় পরিপাটি সিঁথি নিয়ে সরোজিনী হাসি হাসি মুখে দোর খুলে বললে—"মহাপাত্র মশায় এসেছিলেন।"

"মহাপাত্র মশায়! কোন্ মহাপাত্র?" রহস্যের ভঙ্গীতে বলিদত্ত বলল। "দই মারে মহাপাত্র, চেয়ে থাকে অন্যে, কে সে মহাপাত্র?"

"হুঁ, জানো না যেন! ধাঁধা করছ। তোমার সেই, গো! যার কথা এত বলেছ, তোমাদের মেজ সায়েব না ছোট সায়েব, না কি সায়েব বাপু, বলে গেছেন তুমি যেন যাও ওঁর ওখানে।"

"এসেছিলেন, অ্যাঁ, এসেছিলেন? তুমি কি করে জানলে? আর কি বলে গেছেন?"

"কি বলব, ছেঁড়া কাপড় পরে ঘর ঝাঁট দিচ্ছি, দেখি—কে এক মিন্‌সে বাইরের দাওয়ায়, বললেন 'আমি মহাপাত্র' কি সায়েব যেন বললেন। ফের বললেন 'বাড়ীতে কি কেউ নেই? ভারী তেষ্টা পেয়েছে।' ভাবলুম—ইনি আবার সায়েব, হুঁঃ লোকটা কী অন্ধ গো! ঘরে ঢুকে জামাকাপড় বদলাতে কিছু সময় গেল; ফের চেয়ে দেখি, লোকটা সেই দাওয়ায় পাহারাওলার মত টহল দিচ্ছে। ভাবলুম, খুব তেষ্টা পেয়েছে হয় ত! সাহস করে, কাঁচের গেলাসে নেবু নিংড়ে জল দিলাম, দরজার কোণের পিছনে থেকে দাওয়ায় রাখলাম। ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে বললেন, 'ওঃ! আমাদের বাসার দিকে আপনারা বেড়াতে যান না কেন? বলিদত্ত বাবু এলে বলবেন তাঁকে যেতে, জরুরী কাজ আছে তাঁর চাকরীর বিষয়ে—'আচ্ছা, তোমার সায়েবের চোখ কি বেড়াল-চোখ, অন্ধকারেও গন গন জ্বলে?"

সবই ঠিক্ ঠিক্ বলেছে; চোখ জ্বলাটা পর্যন্ত ঠিক। শুধু বলে নি একটা অদরকারী ছোট কথা—তেষ্টার শেষে মহাপাত্র মশায়

বলেছিলেন 'জলে কী সুগন্ধ !' মাগো ! কি কথার ছিরি ! আর জল খেয়ে তাঁর হিসাবী স্বভাব-মত কাচের গেলাসটা নীচে নামিয়ে না রেখে হাতে হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'মাটিতে যদি ভেঙে যায় ?' আর, সেই সময় নিজের আঙ্গুলের টিপ দিয়ে একটা দেহ-শীতলকরা চাপ দিয়েছিলেন তার হাতে ; গেলাসটা বাড়িয়ে দিতে গিয়ে পড়ে যাবে ভয়ে, নিশ্চয় তিনি ওটা শক্ত মুঠোয় ধরেছিলেন।

কথাগুলো বলিদত্তর কাছে একটু বেয়াড়া লাগল। মনের কোণে কোথায় যেন কালো মেঘ, তা যেন নোংরা ভাষায় খুঁচিয়ে বলতে চায়—"শুঁটকি মাছ দেখলে বেড়ালের চোখ জ্বলে।" কিন্তু সরোজিনী আজ কত খুশী, পা মাটিতে পড়ছে না, স্বামীর সাফল্যের অনুভূতি নিশ্চয় তাকে ফুলিয়ে দিচ্ছে। একই আত্মা, সহধর্মিণী ত' !

মহাপাত্র মশায় চাকরীর বিষয়ে ডেকেছেন ; চাকরীতে উন্নতি কিছু হ'বে, নিশ্চয় হ'বে। একটু রাও-ও তা বলেছিল। চাকরী, চাকরী ; আজ সব সুন্দর। সরোজিনী কী সুন্দর ! বাড়ী ফিরলে মানুষ ত' এইই চায় ; সাফ্‌সুফ্, সুবেশিনী, হাস্যময়ী। নইলে, ঘর-লেপা, গোবর-মাখা হাত, মাথায় হাঁড়ির কালি, এলোমেলো ফুর্‌ফুরে চুলে উনুনে ফুঁ-দেয়া ছাই উড়ছে, ছিঃ। সরোজিনী সুরভিতা, মুখে সুগন্ধ একটু স্নো, eclat, যা কচিৎ কখনো বেরোয় !

আজ নিশ্চয় কোন বিশিষ্ট দিন—বৃহস্পতির দশা চলছে। কৈ সে কালো মেঘ ? মনের কোন্ কোণে লুকাল ? বলিদত্তর পাথরের বাঁধ ধসিয়ে চেপে আসছে জোয়ারের বান, গুরু গুরু গর্জনে দানবী বন্যা তার ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ সমাচ্ছন্ন করে।

সরোজিনীকে তার প্রয়োজন—এই মুহূর্তে। গহন মনের দখল, অধিকার জারী করতে, খোলা চোখে নিজেকে জাহির করতে সে চায় সরোজিনীর ওপর, আর তারপর—

বেড়াতে যেতে হবে মহাপাত্রের বাসায়—সস্ত্রীক।

তখন ত' সবে সন্ধ্যা, জাগ্রত জগৎ। তা হোক্ ; দরজায় খিল দেওয়া ঘরে সে অনুভব করতে চায়—মালিক সে ছাড়া আর কেউ নয় ; একটা উগ্র হিংসার তুফান, খিদে-না-থাকা পশুর আক্রমণ।

সরোজিনী চিৎকার ছাড়ে—'আরে, ছাড়ো, একি।' আনন্দে না বিরক্তিতে, বোঝা মুশকিল।

বলিদত্ত হেসে চলেছে—হি হি ; সে হাসি বিজয়ের উল্লাস, না

আহতের আর্ত চিৎকার !

রাস্তার ও পাশের ঘরে কলেজ ছাত্র আওড়ে চলেছে শেকসপীয়রের কয় ছত্র, বীরদর্পে "হাউল্, হাউল্ য়ী উইণ্ডস্— ."

□

"পা চালিয়ে চল, দেরী হয়ে যাবে যে" ; বলিদত্ত তাড়া দিল। সে চটপট তার বেড়াতে যাওয়ার ভেক পরে ফেলেছে—ধোপ দুরস্ত ধুতি, কামিজ ; ভিজে গামছায় মুখ রগড়েছে, মাথায় জলহাত বুলিয়ে পালিশ করেছে। সরোজিনী আলসেমি করে পান সাজছে, যেতে তত ইচ্ছে নেই। বললে "আমি ভাবছি, আজ না গেলে কি হয় ? তাছাড়া, দেরীও হয়েছে—আজ বরং থাক, বুঝলে, ফিরতে রাত হয়ে যাবে।"

"তা কি হয় ? তিনি বলে গেছেন, ওঠ—"

"তুমি যাও ; আচ্ছা, যাঁরা ডেকে পাঠান, তাঁরা গাড়ী পাঠান না কেন ? ওঁর গাড়ী নেই ?"

"আচ্ছা আচ্ছা, ঠাকুরকে ডাক—গাড়ীতে চড়বে। এখন চল ত', মাথা আঁচড়াও।"

"মাথা ত' আঁচড়েছি"—

"চল না ; কেবল কথা—"

পাঁচ মিনিট পরে সরোজিনী তৈরী ; হাই তুলে বললে—"আচ্ছা, চল।"

"এ কি? তোমার ভাল শাড়ীটা কি করলে ?"

"ধোপায় দিয়েছি।"

"আর চটি, চটি জোড়া ত' পর।"

"নাঃ, জ্বালিয়ে মারলে তুমি ; যাও ত' এগোও ; নইলে আমি চললাম, কাজে লাগি।"

"জানো সরোজ, কাজ ত' সর্বদাই আছে ; অদিনেই অকাজ করে ; আচ্ছা, বেরিয়ে পড়।"

বলেই সে ভারী খুশী হ'ল, মনে করল খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটা কথা বলেছে। বাসায় তালা দিয়ে দু'জনে বেরোল।

আজ রাস্তায় জীবনের জোয়ার বইছে ; রোজ রাতের শেষের সেই

আঁধারে রাস্তা আজ যেন নতুন ! আজ জীবন অনুভূতি আর নিরাশায় জ্বলে পোড়েনি। অভাবহীন প্রাচুর্যে অচেতন হ'য়ে ঘুমোচ্ছেও না। আজ পদে পদে মনে জাগে "অহং" ভাব। আশা চকিত করে। বলিদত্ত জীবন চাখ্‌তে চাখ্‌তে হাঁটছে ; পথে সরোজিনীকে লক্ষ্য করে বলে চলেছে বড় বড় কথা, ঠাট্টা করছে, নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিচ্ছে। যেন কথা কইছে নিজের মনের সঙ্গে।

সরোজিনী চলেছে মৌন হয়ে, গরুর মত তাকে যেন কে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মনে অজানা বিফলতার করুণ ধ্বনি, দেহে ক্লান্তি, বিরক্তি। এ জীবন তার কাছে যেন এক তিন-পা বাঁধা দৌড়, যে করে হোক চলতে হবে, উঠে পড়ে।

সামনেই মহাপাত্রের বড় বাড়ী ; সরোজিনী দমে যাচ্ছে, বলিদত্ত উঠছে তেজিয়ে। সরোজিনীর ব্যক্তিত্বে লঘিমা—এখানে তার পরিচয় কি ? বলিদত্ত পরিস্থিতির প্রতি চেতনাহীন। ফটক এসে গেল ; এই ফটক চেনা জীবনের একটা প্রতীক ; সেখানে ওপর, নীচ ; বড় ছোট ; দায়িত্ব···। সিলিনড্রিকেল চশমার কাঁচের মত আবার জীবনের দৃষ্টি ঘুরে গিয়ে দেখা যাচ্ছে নতুন রূপ। শ্যাওলা লাগা দু'টো মোটা মোটা থাম, মাঝে আলকাতরা মাখানো শালকাঠের ফালিগুলো জালি করা ফটক ; তা যেন জীবনের দাঁত বের করা হাসি—কালো, মিশ্‌কালো। সে দিকে চাইলে বলিদত্ত দেখতে পায় নিজের চেনা ব্যক্তিত্ব, মহাপাত্রবাবু বা উপরওয়ালাদের সঙ্গে তারতম্যে সে ব্যক্তিত্ব বাঁকা, সোজা নয় ; সরু, মোটা নয় মোটেই ; খাটো, লম্বা নয়। দেহ বেঁকিয়ে, মুখ নুইয়ে, একজোড়া আঙ্গুল চুলে বুলাতে বুলাতে, কৃতজ্ঞ কোণাচে চাউনি, সভয় মুখে একটু ফাঁক, এক সারি দাঁত—তেরছাভাবে খুলছে বুঁজছে ; বুঁজছে আবার খুলছে—সে এক কিম্ভূত হাসি। সেখানে বীরত্ব নেই ; আছে দানাপানির চেতনা ; এক বিঘৎ পেটের জন্য সহজ দাস্যভাবে সুবিধা ভিক্ষা ! বলিদত্ত দাঁড়াল ; বাইরে তার দ্রুত পরিবর্তন চলেছে—ভিতরের জন্তুর বহুরূপী প্রকৃতি রক্ষাকবচ পরাচ্ছে, পরিবেশ থেকে রঙ্গরস টানছে।

সরোজিনী বললে "এই মহাপাত্রের বাড়ী ? ভেতরে চল, দাঁড়ালে কেন ?"

"থামো", বলিদত্ত বললে "প্রস্রাব করি।" তার গলায় যেন ঢাকনী !

সরোজিনী এদিক ওদিক তাকালো। স্বামীর রূপ পরিবর্তনের কথা সে আদৌ বোঝে না। ভাবছে, এই ঘরে থাকেন তিনি যিনি

আজ এসেছিলেন।

গেলাস বাড়ানোর সময়—ছিঃ।

এই তার স্বামী, তার গর্বের শিরোপা!

কিন্তু মানুষের চামড়া ত' পাথর নয়, তা স্পর্শ গ্রহণ করে!

গোপনে একটা ছবি কল্পনা করা যায়, তার জন্য স্থূল নিদর্শন প্রয়োজন নেই, নারী মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিই যথেষ্ট।

তা হোল একটি অশান্ত পুরুষের ছবি, দুঃখী, দরিদ্র, পিপাসু, হ্যাঁ, তাঁর খুব তৃষ্ণা ; দয়া হয় এ রকম লোকের ওপর আর—

এই ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে মনে জড়ো হয় কৌতূহল—এই বাড়ীতে তিনি থাকেন ; তিনি, তাঁর স্ত্রী, তার ছেলে মেয়েরা। কি রকম সে স্ত্রী? সরোজিনীর মনে দুঃসাহসিক আবিষ্কারের কৌতূহল—নীরবে সে হাসছে।

অতি সন্তর্পণে এগোয় বলিদত্ত, পিছু পিছু সরোজিনী ; তা'র চলনে অহেতুকী যৌবনের মাধুরী।

খালি গায়ে একটা লুঙ্গি জড়িয়ে, এক দলা গুড়াখু দাঁতে ঘষতে ঘষতে পায়চারী রত লোকটি, রাত্রি তখন সাড়ে আট ; দুই কস বেয়ে ধারাস্রাবী তার মুখ থেকে প্রলাপ বকার মত ছিটকাচ্ছে কতকগুলো কথা—তার মানে আন্দাজ করা কষ্ট ; আলোয় ঝক্‌ঝকে সেই বসবার ঘরে আর একজন প্রতিধ্বনি করার মত সেই কথাগুলো উচ্চারণ করে যাচ্ছে—তার স্বর বিনীত।

"আরে ঝটপট লেখ ; কি যে এটা বলতে ওটা বুঝছে—লেখ ত' কচু। জল্‌দি কর। হেঃ ; তোমার উন্নতির আশা নেই, নেহাৎ বাড়ী পালানোর মতলব। কোম্পানী মুফৎ মাইনে দিচ্ছে, না? চট করে লেখ, শুনছ?"

ইতিমধ্যে সস্ত্রীক বলিদত্ত।

"কে, কে ওখানে? ওরে গোপালিয়া, বলেছিলাম না কাজ হচ্ছে, কাউকে আসতে দিবি না, এ্যাঁ। দাঁড়া, দিচ্ছি ঠাণ্ডা করে। কে ওখানে? কি চাই? এখানে কিছু হবে না, চলে যাও। ভাগো! আপিসে দেখা কর। চুপ করে দাঁড়িয়ে যে। কথা বল না কেন? কে?"

"স্যার—"

"ওঃ, মিষ্টার দাস, আর কে সঙ্গে?"

"স্যার, বাড়ীর ওরা এসেছে।"

"ও, আই সি, আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন, এই যে এইদিকে, কি ভাগ্য! কি করি বলুন? কাজের জ্বালায় মানুষ একেবারে অন্ধ! এই যে, এধারে—আলো আন্‌রে—"

মহাপাত্র বাবু সরোজিনীকে এগিয়ে দিতে গেলেন অন্দরে। বলিদত্ত দেখে ঘরের ভিতর—"কি বিনবাবু যে, এত দেরীতেও—"

বসবার ঘরে ফিস্‌ফিস্ করে বিনবাবু বল্‌লে "দেখছেন ত' স্বচক্ষে। সেই কোন্ দশটায় খেয়ে এসেছিলাম, আর বাড়ী যাই নি। পায়খানা চেপে চেপে বন্ধ। তবুও চলেছে কাজ। গুড়াখু ঘষতে ঘষতে কি যে বল্‌ছেন ভোঁদা মুখে, তা'ও এক একবার ঠিক ধরা যায় না। অবশ্য, সায়েবরাও মুখে পাইপ্ চেপে ডিক্টেশন দেন। কিন্তু সে সায়েবী শব্দ, ধাঁচ দেখে আঁচ করা যায়। এ বাবা, ওড়িয়ার আওয়াজে দাঁত মাজা ধ্বনি, তায় ইংরেজী লবজ, পিটম্যানের বাবাও হার মানে। যেতে দিন, কপাল আর কি? এক খিলি পান দিন ত'। আজ ত' সায়েবকে নিয়ে একসঙ্গে গিছলেন, কি হ'ল? আপনি মেরে দিলেন, এবার বলিদত্ত বাবু আপনি মেরে দিলেন—"

"হুঁ, হুঁ", গলাখাঁকারি শোনা গেল; উনি ফিরে আস্‌ছেন। বলিদত্ত বাইরে গিয়ে রুমালে মুখ মুছে পায়চারী শুরু করল, যেন সে কিছুই জানে না। বিনবাবু খাতার ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

মহাপাত্র বল্‌লেন—"কাজটা আধাখেচড়া রয়ে গেল যে, আচ্ছা বিনবাবু, তুমি বাড়ী যাও, তোমাকে দিয়ে কিস্‌সু হবে না। ধর ত' বলিদত্তবাবু; তোমার ত' চটপট হাত; তুমি ইচ্ছে করলে, এখনই শেষ করে দেবে। ওঃ, এই গয়ংগচ্ছ লোকগুলো এত হাবাগোবা! যাক্, ধর এবার। হ্যাঁ, জানো আজ আমি তোমার বাসায় গিয়েছিলাম। যাক্ গে সে সব কথাবার্তা পরে হবে। নাও, এখন লেখ—"

গুড়াখুর বাকীটুকু আগেই শেষ হয়েছে, এবার কাজ সহজ।

বলিদত্ত লিখছে। ঢং ঢং, ন'টা বাজল। লেখা চল্‌ছে। আবার সাড়ে ন'টা। তবুও লেখা চলেছে।

বলিদত্ত বেড়াতে এসেছিল।

আর তার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জীবনচেতনা নেই; সে এখন কলের মানুষ, কাজ করে।

লেখা শেষ হয়ে এলো; এবার বোধ হয় তা'র ছুটি।

□

মহাপাত্র কেন ডেকেছিলেন, জিজ্ঞেস করতে সে ভুলে গেছে। চোখের সামনে ভাসছে, আবার আসছে কালের পরিশ্রম, এইসব লেখা টাইপ করতে হবে।

হাত চলছে। মন মরেছে। বলিদত্ত কাজ করছে।

□

ও'দিকে সরোজিনী—

তার সব শখ্ মিটে গেছে, বাস্তবতার মুখোমুখি এসে, মহাপাত্রের প্রথম সম্ভাষণ শুনেই। তারপর ধোঁয়াটে আগুনে জল ঢালার মত হঠাৎ তাঁর কৃত্রিম ভদ্রতার এক আঁজ্‌লা—তা শুধু গুমোট্ বাষ্পে কুয়াশা সৃষ্টি করল, শান্তির নামও লোপাট্।

কি করলে মানুষ এখান থেকে ছুটি পায়? সরোজিনী চকিতে চিন্তা করল।

কিন্তু আগে আগে মহাপাত্র—'এই দিকে, এই যে এধারে।' একই রকম চট্‌পট্ চলার ভঙ্গী, গড়গড় করে কথা বলা—সব পুরুষই সমান ভীরু—সরোজিনীর মনে হল—কেবল উনিশ বিশ ফারাক। হাড়িকাঠের পানে হ্যাঁচ্‌ড়ানো পশুর মত সে হাঁট্‌ছে।

ভেতরে ঢুকে উঠোনের দরজা ঠেলে মহাপাত্র হাঁক পাড়লেন— "এই যে, বলিদত্ত বাবুর বাড়ীর ওঁরা এসেছেন।" বলেই উধাও। সরোজিনী গোল গোল চোখে তাকিয়ে রইল; কোথায় কে? ও ধার ঘেঁষে রান্নাঘর থেকে গলা শোনা যাচ্ছে, রসুই সম্বন্ধে সমালোচনা। অন্য পাশে পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার শব্দ। একটা ঘরে দু'তিনটি বাচ্চা চিল্ চিৎকার করে খেলছে। সব ঘরেরই দরজা খোলা, আলো জ্বলছে, সব দেখা যাচ্ছে—ঘরের জিনিষ, পালঙ্ক, বিছানা, দেয়ালগিরি, আলমারি—পদার্থবহুল বড়লোকের বাড়ী, সবাই এখানে কাজে ব্যস্ত। সে কে এখানে?

খেলতে খেলতে তিনটি বাচ্চা বেরিয়ে এল বাইরে, তা'কে দেখে থ' হয়ে গেল, ফের দৌড়ে গেল মা'র কাছে। একটা ঝি এসে বিড়বিড় করে বল্লে "কে যেন এসেছেন, ওমা?" দেখতে দেখতে সকলে এল—এ বাড়ীর গিন্নী, বাচ্চারা, ঠাকুর চাকর ঝি। একাধারে যৌথ পরিদর্শন!

গিন্নী জিজ্ঞেস করলেন—"কে?"

"আমি বেড়াতে এসেছি।"

ওদিক থেকে উৎসাহ দেখা গেল না; রাত্রিতে এ সময় অচেনা লোকের বেড়াতে আসা খাপ্ খায় না। আবার প্রশ্ন—"সঙ্গে কে এসেছে?"

"উনি এসেছেন, বাইরে গল্প করছেন।"

"ওঃ, সায়েবের কাছে আছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, এস ওপরে; ওরে মাদুরটা পেতে দে। কি, পান খাও না? সাদাপান না দোখ্তা? ওরে আমার বাটা আন্ত'। তোমাদের বাসা কোথায়? আরো সকাল সকাল এলে না কেন? আমি কোথায় বা যেতে পারছি, না কাকেই বা চিনি? ছেলেপুলে ক'টি? ও, তুমি ত' নেহাত্ ছেলেমানুষ। বাপের বাড়ী কোন্ গাঁয়ে? শ্বশুরবাড়ী? কি সব আনাজ পাও আজকাল?"

তারপর, প্রশ্নে ইতি।

সায়েবের ঘরণী পা ছড়িয়ে বসেছেন। সরোজিনী দেখ্ছে—বিশেষত্ব পাচ্ছে না কিছুই। নষ্টস্বাস্থ্য সাধারণ রমণী। অল্প আয়ের পরিবারে বিয়ে হলেও খাপ খেয়ে যেত। হাড়ের ওপর সোনার ছাউনি; সেই জোরে ও কথা বলার এক বিশেষ কায়দায় এখানে মানিয়ে গেছে। বল্‌বার ভঙ্গীতে আদেশের আভাস।

গোপন আদেশে চাকর গিয়েছিল, পরিচয় নিয়ে ফির্ল। রান্নাঘরে কাজের বাহানা করে গিয়ে সে খবর উনি বুঝে নিলেন। ছেলেমেয়েরা খাওয়ার জন্য কান্নাকাটি কর্ছে। "যাই" বলে তিনি উঠে গেলেন।

তারপর সঙ্গী বল্তে চাক্‌রানী—"হ্যাঁ গা তোমাদের বাবু কি করেন? তিনি কি আমাদের সায়েবের কাছে গোমস্তা? কত টাকা মাইনে?" কিন্তু দুঃখ সুখের এসব কথাবার্তায়ও বাধা পড়ল—ওধার থেকে এল ধমক—"এই মল্লী, বাসন্ মাজবি, না বসে থাকবি?"

আবার সে একা। গৃহকর্ত্রী কাজে ডুব মেরেছেন। সরোজিনী

মনে মনে জপছে—"আর কতক্ষণ ? কতক্ষণ আর ?"

এ বাড়ীতে ঘরকন্নার জোয়ার বইছে। সে এখানে কে ?

ভাবতে ভাবতে মাথা চাড়া দেয় ভিতর থেকে তার ব্যক্তিত্ব। মনে পড়ে—ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি-ভরা এ দুনিয়ায় সেও একজন মানুষ; তার আছে আকৃতি, আছে প্রকৃতি, আছে ধান্দা, বাড়ী আছে, আছে উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্য আছে! কি তার উদ্দেশ্য ? অপ্রত্যক্ষ মনে উদ্দেশ্যও গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ে, নাপাত্তা হয়; ব্যক্তিত্ব ক্রমশ ছোট হ'তে হ'তে মুখ লুকোতে কোন্ কোণে হারিয়ে যায়, কে জানে!

এখানে সে কে ? কেউ নয়। তবে কি সে দর্শক মাত্র ? মুঠো করে কিছু একটা ধরবার উগ্র ইচ্ছা মনে পুরে বারংবার দেখে—ফুঃ! মুঠো খালি সে কিছুই নয়; শুধু ধোঁয়াটে মনের লম্ফে সল্‌তে মাত্র, লাল হয়ে জ্বলে, দুর্গন্ধে ও ভুষির কালিতে মাখামাখি। সে তা'ই।

পালাবার জন্য ছটফট করছে, পলায়নী ব্যক্তিত্ব; কিন্তু যেতে অপারগ। পরিস্থিতির অর্গলে পথ বন্ধ। চেতনায় জন্মগত জগদ্দল!

খালি একটার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নাচার, নিরুপায়ের মত চেয়ে থাকা। দুর্বল মনে ঠাকুরকে ডাকা, মুক্তির জন্য। নিজের নির্যাতনের জন্য পরকে দুষে প্রাণ ভরে শাপান্ত করা।

সরোজিনীর চোখ খোলা, কিন্তু সে দেখছে না কিছুই। দম্ বন্ধ করে ভাবনায় ডুবে আছে, সাঁতার দিচ্ছে বারংবার, নিঃসন্দেহে সে অবহেলিতা। মনে মনে গালি পাড়ছে মহাপাত্রকে, স্বামীকে, নিজের নিবুর্দ্ধিতাকে।

তা-র-প-র, রাত তখন সাড়ে এগারোটা, ভিতর থেকে শোনা গেল :—"অ্যাঁ—যায় নি এখনও ?" দোর খুলে গিন্নী বের হলেন "মাগো! এতক্ষণ তোমাকে এখানে বসিয়ে রেখেছেন! কাজ করছেন! কাছে কে দাঁড়িয়ে থাকে বল ? ওরে গোপালিয়া, আরে অর্লি, অর্লি, কে আছিস ? যা ত' বল্‌গে যা সায়েবকে। আচ্ছা, তুমি এসো এখন, উনি উঠলেন বলে; পথ দেখা গোপালিয়া, অন্ধকার হয়েছে! আচ্ছা, যাও; এসো আবার, কেমন ?"

গোপালিয়া পথ দেখিয়ে চলেছে। সরোজিনী বেরিয়ে এল। আপিস ঘরে গোপালিয়া কি যেন বলছে। বিরক্তি ভরে উঠলেন মহাপাত্র।

"নাঃ! এরা কাজ করতে দেবে না। আর একটা চিঠি অক্লেশে

এখনই শেষ করা যেত ! যা হোক, বালদত্ত বাবু, যাও এখন। বোধ হয় বেশ দেরীই হয়ে গেছে। এগুলো নিয়ে যাও। কাল টাইপ করে এনো।"

বলিদত্ত নমস্কার করল ; প্রতিনমস্কার না জানিয়ে মহাপাত্র চটপট দরজায় খিল দিলেন।

আঁধার পথ। শুধু বলিদত্ত ও সরোজিনী।

"এত দেরী করতে হয় ?" সরোজিনী আর বেশী বলতে পারল না।

বলিদত্ত আড়ামোড়া ভেঙে বললে—"দেখলে ত।"

চুপচাপ তু'জনে বাড়ীমুখো।

একটা নতুন চেতনা—আটকানো বিদ্রোহ—একজন চাপছে তা পরিস্থিতি বিচার করে, অন্যজন গৌণ মনোবৃত্তির লোহার পোষাকের নীচে।

□

ভোরে উঠে বাসিমুখে জল দিয়েছে কি না দিয়েছে, বলিদত্ত গত রাতে আঁচড়-কাটা কাগজগুলো সাজিয়ে দেখছিল—এই তার জীবনের কাব্য। এ তুনিয়ায় রোজই ত' ফেল-মারা আছে ; তবু ভোর হয়, জন্তুর চোখও অনুভূতি দিয়ে কুড়িয়ে নেয় নিজের খুশীর জন্য আনন্দের সামগ্রী।

প্রত্যেকের জন্যই আলাদা ব্যবস্থা, যার যেমন রোচে ; কারুর কপালে কান্নাভরা চিন্তা, রাগ চাখ্‌তে চাখ্‌তে অনুভব করে একপ্রকার স্বাদ, চোখের জলের নোনা স্বাদ—সম্বর-হরিণের প্রিয় নোনা মাটি ! নিজেকে কোড়া মেরে অশ্রু রক্তে কেউ বা আনন্দ পায়। কারও বা আনন্দের সামগ্রী—হাসির চ্যাঙারী, ঝুরঝুরে সাদা ফুল যেন সুরভিত।

গোবর গাদায় কাক ডাকছে। রাস্তার পাশে একটা কুকুর মন দিয়েছে ছ্যাতাপড়া একখানা ছেঁড়া জুতোয়।

পথের ওধারে ব্যায়াম শেষে কলেজ ছাত্র হাত দিয়ে ঘাম মুছে, ছিটোচ্ছে। তার লম্বা চুল ছড়িয়ে পড়েছে কপালের ওপর। ঘাম মুছতে মুছতে আরাম লাগছে ভেবে যে, সে কী কসরৎই না করেছে !

ঘাম তার আনন্দের সামগ্রী।

অনুপ্রাসে অনুভূতির বিশিষ্টতা—সবই নিজের মনের কেরামতি; "যা নেই ভাণ্ডে তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে," "তাওয়া অনুযায়ী পিঠে, গুড় অনুযায়ী মিঠে"—এতেও আনন্দ। বস্তু মৃন্ময়, জড়; চেতনা চিন্ময়। ঘটনা পুরাতন, অনুপ্রাসের বৈশিষ্ট্যে, তায় নতুন আনন্দের বোধ।

বলিদত্ত ফাইল্ বগলে আপিসে গেল ঝটিতি, তারপর টাইপ করা—শেষ করতে সাড়ে দশ।

সরোজিনী বলেছিল বাসায় আনাজ বাড়ন্ত। না থাক্! গরম গরম দু'মুঠো ভাত, ফুটন্ত ডালের জল, গা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে এমন আলুভাতে, মিশ্ কালো খানিকটা নুন, রগরগে লঙ্কা দু'টি; দু'মুঠো গেলা নিয়ে কথা, বলিদত্ত ভাবে, খাদ্যই কি মুখ্য? না, সাফল্যের উদ্দেশ্যে এগোনোর আনন্দ?

অতএব, আনাজ না থাক্, কিছুই না থাক্; কাঠ হোক ভিজে, উনুন হোক স্যাঁতসেঁতে। বাড়ী ফিরে প্যাণ্ট পরে টেনেটুনে, বসে দাঁড়িয়ে চটপট দু' গাল্ সেঁটে চাকরী করতে ভাগে।

আপিসে পৌঁছে ঘড়ি দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে।

□

এই হোল দিনের শুরু।

প্রথমে—মহাপাত্রের কাছে।

তিনি বসে আছেন—কালো রংএর জুতো, তার এক পাটি সামান্য হাঁ করা ঢাউস ফিতে, লাল মোজা, হল্দে প্যাণ্ট, রং-ওঠা ফিকে নীল কামিজ, ডোরা-কাটা কোট, তার জমির রং মুগ, একপাশে ঝুলছে তিন রংএর ফুটকি-তোলা টাই-এর ফাঁস, মুখে স্নো চিক্ চিক্ করছে, চোখে চওড়া ফ্রেমের চশমা, মাথা আঁচড়ানো হয়নি, বসা দাঁড়ানো—নানা ভঙ্গীর উসকো খুসকো পাঁশুটে চুল, তা থেকে উৎকট গন্ধতেলের সৌরভ ছড়াচ্ছে। টেবিলের ওপর পা দু'টি উদ্যত ভঙ্গীতে আশ্রয় নিয়েছে, চেয়ারে বসে কোলে রেখেছেন লেখবার জন্য একটা পাতলা তক্তা, লেখা চলেছে খুব বড় সাইজের অক্ষরে। টেবিলে রাখা, জুতো-সুদ্ধ পায়ের কাছে গাঁটওয়ালা, শিক্ড়ে, বাঁকা ছড়ি; আর এক পাশে প্রকাণ্ড পানের ডিবে, খবরের কাগজের খোলা ঠোঙায় একমুঠো

দোখ্তা, তিনটে শিশি—একটায় পিপারমেণ্ট আরক্মেন্থল, অন্যটিতে কাঁচা যোয়ান ; আরেকটিতে লাল রংয়ের বড়ি—পানের মিষ্টিমশলা।

বলিদত্তর ধারণা—প্রত্যেক বড়লোক এক একটি অবতার। সময় বুঝে সেবা করতে পারলে বর পাওয়া যায়। এ হোল মহাপাত্র অবতার—মানুষের অহং-রূপ, বেপরোয়া, ড্যাম্ কেয়ার। দুনিয়ার দিকে জুতোর আগা। জ্ঞানী নিশ্চয়—উপাধিই তার প্রমাণ, কেবল পাঠে নয়, সাধ্যেও ; তাস, দাবা, পাশা, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথি, জ্যোতিষ, শ্লোকান্ত, চাকরী, কথাবার্তা, ট্যাক্ট। যা করবেন বলে ঠিক করলেন তাতে চটপট তিনি মেতে ওঠেন, সুতরাং তিনি জ্ঞানী ; কিন্তু সে জ্ঞানের আছে এক বিশিষ্ট রূপ ; জগতের চোখে তা দেখায় একটা বাঁকা ছড়ির মত—কিম্ভূত, অসম, টালমাটাল। এবং সে জ্ঞান-ধারণকারী ব্যক্তিত্বের রূপ সেই বিচিত্র পরিচ্ছদের সমষ্টির মত, তার হাবভাব পরিস্ফুট।

গোটা একটা বিড়ির অর্ধেক রামটানে উড়িয়ে দিয়ে বনু এই অসামঞ্জস্যের ওপর লেক্চার ঝাড়তে পারে—"আ-হা-হা, বলিদত্ত! ঠাকুরের পুজো কর্, বর পাবি ; হরিনাম নে, তরে যাবি, চটপট স্বর্গে যাবি। আর মহাপাত্র নাম মুখস্থ করলে কি পাবি ?"

বলিদত্ত এক হাত জিভ কেটে বলে—"ডোবাবি তুই বনা, কে শুনে ফেলবে। জানিস উনি কি রকম জ্ঞানী ?"

"বয়ে গেল, জ্ঞানী ত' কি ? অ-হ-হ, ব্রহ্মজ্ঞানী !"

"আরে, অমন ফুঁ দিয়ে জ্ঞানকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না রে। তুই যখন আড্ডা মেরে ঘুরছিলি, নয়ত ক্যারম পিটছিলি, তিনি তখন পড়ছিলেন।"

"তখন ওর বইপড়া থেকে তোর আমার যেমন এক ফোঁটা উপকার হচ্ছিল না, এখনও তার ব্রহ্মজ্ঞান থেকে তোর আমার কোন লাভ লোকসান নেই। দুনিয়া চায় পুরুষত্ব, আমরা চাই স্নেহ, সহানুভূতি, কিছু না হলে ভদ্রতা অন্তত—মানুষের প্রতি মানুষের, মানুষের মত ব্যবহার। যেখানে তা নেই—মারো গোলী—ড্যাম্—। ওরে বলীবর্দ দাস, কোন বিষয়ে দশটা কথা মুখস্থ করলেই জ্ঞানী হয় না। বড় হওয়া যায় না তোর এই মহাপাত্রের মত অহমিকায় পেট ফুলিয়ে নিজেকে বড় বলে জাহির করলে। এমন মহাজ্ঞানীরা জগতের যত অনর্থের মূল। আর এই যাকে জ্ঞান বলছিস, তাতে সত্যিই গভীর কিছু নেই ; এতে শুধু নিজের ঢোল বাজানোর একটা ভড়ং আছে।

ফ্রয়েডী ভাষায় লোকটা বড় এক রকমের এগজিবিশনিষ্ট। তলিয়ে দেখ্ মজা পাবি। যা—"

বেশ—ইনফিরিঅরিটি কম্প্লেক্স, বলিদত্ত ভাবে নিজের পণ্ডিতিতে বহু ভুল করে একটা কথা—এত বড় দুনিয়াতে, যেখানে এত প্রকার মানুষের বাস—অর্থাৎ ছাপ্পান্ন কোটি প্রাণীর বাস, সেখানে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে আমাদের চলতে হবে। সেখানে সকলের ব্যক্তিত্বের বিষয়ে সর্বদা সজাগ থেকে সবার রূপভেদ বিশ্লেষণ করে করে মাথা নাড়ালে মানুষ এক পাও এগোতে পারবে না।

মহাপাত্র এগজিবিশনিষ্ট! হোন না স্যাডিষ্ট, যা খুশী ইষ্ট্—তাতে বলিদত্তের কি যায় আসে? তার একটিই নীতি—কার্যাঞ্চাগে, কার্যাঞ্চাগে।

ওই, মহাপাত্র বসে আছেন।

বলিদত্ত ঘরের ভিতর এসে তিন মিনিট দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মহাপাত্র কি দেখেন নি তাকে? দেখেছেন অবশ্যই।

কিন্তু উপযাচক না হওয়া তক্, হঠাৎ কারও অবস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ হওয়া তাঁর নীতিবিরুদ্ধ; কারণ, তাতে আত্মসম্মান ক্ষুন্ন হয়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করুক বলিদত্ত, অপেক্ষা করুক দুনিয়া; মহাপাত্র কাজ করছেন। কাজের গুরুভার; তার কাছে ব্যক্তি কে? ব্যক্তিত্বকে পোছে কে?

ফাইল বগলে চেপে বলিদত্ত দাঁড়িয়ে। মহাপাত্র তার উপরওলা নয়; না হোন; হতে পারেন ত'! সে মনকে প্রবোধ দিচ্ছে সেই আশায়। মুখ নুইয়ে, পিঠে হাত রেখে, কোমর বেঁকিয়ে একজনের সামনে দাঁড়ানো, আপনার ব্যক্তিত্ব ভুলে পরের ব্যক্তিত্বে সেই সময়টুকু লীন হয়ে যাওয়া, অনুভব করা যেন নিজের অ্যানথ্রোপয়েড প্রপিতামহদের উত্তর-দায়িত্ব যে খুদে লেজটি তা চেপ্টে যাচ্ছে, চেপ্টে যাচ্ছে—

এ যেন এক ত্যাগের সাধনা, করা যায় আশাতে; কারণ, এর সঙ্গে জড়িত তার দানাপানির সমস্যা।

টেলিফোন বাজল; মহাপাত্র ফোন ধরলেন।

"আমি—আমি মহাপাত্র"—মহাপাত্র বলছেন—"হ্যাঁ—হুঁ, আচ্ছা, হুঁ, হুঁ, আচ্ছা। ইডিয়ট্!"

এবার বলিদত্তের দিকে—"হ্যালো, মিষ্টার দাস।"

বলিদত্তর সমুদয় ব্যক্তিত্বে প্লাবন বইয়ে আনন্দের জোয়ার নামছে,

মুখে হাসি, অঙ্গে অপূর্ব ভঙ্গী—এবার সে নিজেকে করবে সুরভিত নৈবেদ্য।

"স্যার, স্যার, এই যে এনেছি।"

"অ্যাঁ, এনেছ? এত শীগগির শেষ করেছ? বাঃ!"

"শেষ করব না, স্যার? আপনার জরুরী কাজ—"

"ঠিক, ঠিক। জরুরী, বড় জরুরী বলিদত্তবাবু, অনেক ধন্যবাদ!"

মহাপাত্র কাগজগুলো নিলেন, বলিদত্ত দাঁড়িয়ে রইল! ফের মহাপাত্র কাজে মন দিলেন। বলিদত্ত তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

মুখের জায়গায় জায়গায় চকচকে হাসি মাখিয়ে মহাপাত্র বললেন—"আচ্ছা, যাও মিষ্টার দাস; পারো যদি আজ সন্ধ্যায় একটু এসো।"

মহাপাত্রের না-বলা তারিফ মনে মনে কল্পনা করে নিয়ে বলিদত্ত নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করল, ভাবল—সকালটা ভালয় ভালয় শুরু; এ ত' বউনি।

তারপর আপিসের বড়বাবু। জবুথবু, প্রৌঢ় ভদ্রলোক; যে শরীর একদিন মাংসল ছিল, বয়স তার জায়গায় জায়গায় টেনে, ঝুলিয়ে কুঁচকে ফেলেছে। মুখের বিশিষ্টতা—এক প্রকাণ্ড থুতনি। নীচের চোয়াল সব সময় নাড়ানোর অভ্যাস। বড় বড় দাঁত; মোটা মোটা কানের ওপর থোকা থোকা চুল। চোখে চশমা, কিন্তু তার ফ্রেমের ডাঁটির বদলে আপিসের ডবল সুতলির ডোর—হলদে ও লাল দুই খেই পাকানো! মুখ একটু হাঁ করে আছে; কান পেড়ে আড়ি পাতার মত নুয়ে পড়ে তিনি যখন কাছের ও দূরের টেবিল-গুলোর দিকে তাকান তখন টেবিলে টেবিলে চাঞ্চল্য খেলে। হাত চলে চটপট, কাগজপত্র ফরফর করে, কর্মরত মুখগুলি টেবিলের ওপর ঝুঁকে থাকে শুকিয়ে আসা শাপলার মত।

এই ব্যক্তিত্বের জোরে তিনি বড় বাবু—নয়ত লোকে বলে, তাঁর ওপরতলা ফাঁকা, ঘটে বুদ্ধি নেই। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? চেহারায় প্রয়োজনমাফিক তৎপরতা, মুখে বিজ্ঞ ভঙ্গী, মাথা নাড়ানোর কায়দায় একরকম পণ্ডিতি, নিজে যা না জানেন তা পরকে ধরে, ভয় পাইয়ে কোন রকমে করিয়ে নেওয়ার অভিজ্ঞতা বা কর্মকুশলতা—এই কি যথেষ্ট নয়?

তাঁকে ঘিরে বসে আছেন চারজন—হরিবাবু, কৃষ্ণবাবু, রামবাবু ও গোপালবাবু; দাঁড়িয়ে আছেন হতভাগ্য বীরবাবু; আজ এই দণ্ডে তিনি হতভাগ্য; কারণ, ধমক চলছে।

"এই যে, আবার গুনে বলছি শোন" বড়বাবুর গর্জন চলে, টেবিলের ওপর মোটা আঙ্গুল পিটে তিনি গুনছেন, "প্রথমে—সব দিন তুমি আসবে দেরীতে, না কি ? দশটায় আসতে বলা হয় নি ? তোমার হল দশটা পনের—সাক্ষাৎ লাটসায়েব আর কি—"

লাটসায়েব সওয়া দশটায় আসেন কিনা, কেউ সে কথা ভাবেনি ; কিন্তু লাটসায়েব বলে কথাটা ভারিক্বী শোনায় বেজায়।

"মনে মনে লাটসায়েব হয়ে গেছ ত' ! কিন্তু দেখছ এই কলম ? এর এক আঁচড়ে তোমার দানাপানি খতম হতে পারে—"

সকলে গম্ভীর ; বড়বাবুর কথায় সায় দিতে হবে, অথচ মুখ খুলে কথাটি বললে বড়বাবুর অনুপস্থিতিতে বীরবাবু তাঁর বীরত্ব দেখাবেন। তাই সবাই চুপচাপ বীরবাবুর পা থেকে মাথা তক্‌ দেখছেন বিরস বদনে ; পরে বলা যাবে মৌন সহানুভূতি ; কি আর করা ?

বীরবাবু আকুল—"স্যার, স্ত্রীর ব্যারাম, হাত পুড়িয়ে রান্না করে আসতে হয় ; ফের আজকাল যা কাঠ স্যার ; ভিজের বেহদ্দ, ফুঁ দিতে দিতে প্রাণ বেরোয়। বাচ্চাদুটোকে দু'মুঠো না খাইয়ে এলে, সারাদিন চেল্লাবে। দু' কোশ দূরে থাকি, মোটে পনর মিনিট এদিক ওদিক স্যার।"

"আরে, হটাও, বহুত শোনা গেছে এসব কথা, শুনে শুনে কানে ব্যথা। আমাদের কি আর ঘরদোর আছে ? হেঁঃ—বাচ্চাদের দুধ খাওয়াতে গিয়ে কোম্পানীর কাজে দেরী করবে, না ? চাকরী ছেড়ে দাও না ? বাড়ীতে থেকে উনুনে ফুঁ দাও, বউকে পথ্য রেঁধে দাও। কথা বলতে শিখেছ ত' বেশ ! উপন্যাস লেখ, উপন্যাস লেখ, ভাল লিখতে পারবে।"

"মিছে নয়, বৌএর সত্যি ব্যারাম, স্যার।"

"তো, তা'তে কোম্পানীর কি ? আমরা কি এখানে ডাক্তারখানা খুলে বসেছি, না অনাথাশ্রম ? হ্যাঁ, বল ত' তোমরা সব। রোজ দেরী, রোজ দেরী, মানুষ কত সয় ? এ্যাঁ ? কোম্পানী বাড়ীর টাকা, না দানছত্র পেয়েছ ? আচ্ছা, এ ত' গেল এক নম্বর চার্জ। ফের শোন—তুমি ক'টা রিটার্ন কতদিন হল বাকি রেখেছ, বল ত' ! আজ দেব টিট্‌ করে—"

"স্যার, স্যার, মোটে দু'দিন দেরী হয়েছে—আপনি ত' বলেছিলেন যে আপনি নিজে একটু ভাল করে যাচাই করার পর যেন রিটার্ন লিখি—"

"তা, সন্ধ্যায় বা সকালে আমার বাসায় গিয়েছ নাকি ? এ্যাঁ ?"

সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। অতএব আসল রাগের কারণ এতক্ষণে বোঝা গেল। সবাই বিরক্ত হ'ল বীরবাবুর মূর্খতায়।

কাঁদো কাঁদো হয়ে বীরবাবু বললেন "স্যার, বৌ অসুখে পড়েছে; সকালে ডাক্তার ডাকতে গেলাম; সন্ধ্যায় গেলাম ওষুধ আনতে; তা ছাড়া হাত পুড়িয়ে রান্না। নইলে কি যেতাম না স্যার ? আর কোথায় যাব ? আপনার কাছেই যদি না যাই, ত' যাই কোথায় ? আজ যাব, স্যার; ধোপাকে তাগিদ দিয়ে আপনার জামাকাপড় নিয়ে যাব। আপনার কি অজানা স্যার যে, আপনার কাছেই যদি না গেলাম, ত' যাব কোন্ চুলোয় ? খালি বৌ-এর ব্যারাম বলে—"

'স্যার' মানে মহাশয়। কিন্তু বীরবাবু কথাটা যেভাবে ব্যবহার করেন তাতে মনে হয়—তার অর্থ হুজুর, জাঁহাপনা আর কি ! যাই হোক্, এ বিনয়, এই ব্যবহার, এ আনুগত্য এবং শেষে ধোপা—এর ওপরে আর কথা চলে না। বড়বাবুকে কথা ঘোরাতে হ'ল—

"যাও, কাজ কর গে—আবার যেন আমায় বলতে না হয়, খবরদার ! বৌএর ব্যারাম ! আঃ, এমন একটা বাজে কৈফিয়ত দিতে কি করে সাহস হয় তোমার ? মেয়েদের আঁচলের আড়ালে আত্মরক্ষা ! লজ্জা সরমের মাথা খেয়েছ ?"

বীরবাবু মুখ নীচু করে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। ফাঁক দেখে রগড় করার জন্য বলিদত্ত বলল "ওর রয়ে গেছে ছেলেবেলার অভ্যাস, স্যার—পাঠশালার গুরুমশায় ওদিকে ডাক পাড়ছেন, এদিকে আঁচলের তলায় এ, বুড়ী মা পিছনে—'আজ ভারী পেট কামড়াচ্ছে; কুরে খাচ্ছে, কুরে খাচ্ছে নাড়ীভুঁড়ি, আজ না হয় থাক পড়াশুনো—"

মাথা না তুলে বীরবাবু চলে গেলেন, সত্যিই যেন কিছু ঘটেনি, আর কিই বা ঘটেছে ? এ ত' নিত্য গা-সহা ! মন থেকে মুছে ফেললেই শেষ। ওদিকে বলিদত্তর কথায় বড়বাবু হাসলেন।

বড়বাবু হাসলেন ত' হাসলেন কাছের পাঁচজন কেরানী, যে যেমন পারল। বলিদত্ত চালিয়ে যাচ্ছে মুরগীর মত; ডিম দেবার আগে মুরগী যেমন চেঁচায়—'সি মাইনর' টোনে, থেকে থেকে—তার হার্দিক হাসি ! কারণ ? বড়বাবু হাসছেন। কৃষ্ণবাবুর হাসি লম্বা, রাসভ-সুলভ, হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ—। হরিবাবুর কাশি মাঝে মাঝে কমা ফুলষ্টপের মত, হিঃ হিঃ। রামবাবুর হাসির লহর বন্ধ হয়ে আসছে; ক্ষীণকায় লোক তিনি, দম নিয়ে ফের শুরু করলেন। গোপালবাবুর

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হাসছে, টেবিলের নীচে থলথলে ভুঁড়ি লাফাচ্ছে হেঃ হেঃ হেঃ এবং বড়বাবু হাসছেন হেঃ হেঃ।

সারি সারি টেবিলের অনেকে সে হাসির পালায় যোগ দিয়েছে, যেন হাসির একটা প্রতিযোগিতা চলছে; বড়বাবুর মুখের দিকে চেয়ে সবাই। তাঁর হাসি বন্ধ হওয়ার আগে যেন কারুর হাসি বন্ধ না হয়!

এংকটু রাও মুখে রুমাল চেপে কাজ করে যাচ্ছে।

তৈমুর লং-এর ফতোয়ার মত হঠাৎ হুকুম জারি করলেন বড়বাবু—"থাক, আর হাসি নয়, কাজ কর সবাই।"

থপ্—সব হাসি বন্ধ। কেবল কাগজ ওলটানোর ফর ফর আওয়াজ। কাগজের ওপর কলমের চর্ চর্ শব্দ।

বড়বাবুর টেবিল থেকে একটা কাগজ খসে পড়ল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে নীচু হয়ে পড়ল পাঁচ জনই। গোপালবাবুর পক্ষে নীচু হওয়া অসম্ভব, তবুও চেষ্টা ত' করতেই হবে, পট করে ছিঁড়ে পড়ল তাঁর প্যাণ্টের বোতাম, তবুও চেষ্টা চলেছে নুইবার। ক্ষীণকায় রামবাবু টেবিলের নীচে ঘুরে ফেলেছেন এক প্রস্থ, কিন্তু তার দৃষ্টিশক্তি কম। বলিদত্ত এক লাফ মেরে মেঝেতে বসে পড়েছে—সে-ই পেয়ে গেল, টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে পাথর চাপা দিল। বড়বাবু সে দিকে তাকান নি। তিনি কাজে ব্যস্ত।

চারজন কেটে পড়ল।

কিন্তু বলিদত্ত তার প্যাণ্টের পকেট থেকে বের করল একটি বস্তু। টেবিলের নীচ দিয়ে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দিল—

একটা পান। হলদে তবকে মোড়া। ওপরে আতর কাঠি। নামজাদা দোকানের পান। সে নিজে পান খায় না; কিন্তু অকালে সকালে এই তার ভেট।

"ও, এনার্জি পিল্, বেশ, বেশ—" যাঁতা পিষবার মত থুতনি সবেগে নড়ছে; বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন—"তারপর? কি হল?"

"সেই কথাই ত' জানতে এসেছি স্যার, সবই আপনার হাতে। আপনার দয়া। আপনার ওপরই ভরসা, যা হয় করুন।"

"ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয় নি এখনও।" বড়বাবু বললেন, বড় রাশভারী।

"হওয়ার বাকী আর কি স্যার? আর দু' একদিন ত'?"

"তা ঠিক"—বড়বাবু লেখায় মন দিলেন।

ছোট ছেলে আহ্লাদে গোল করার মত বলিদত্ত বলল "স্যার, আমার কি হ'ল বলবেন না? আপনি না বললে আমি হাংগার ষ্ট্রাইক করব। বলবেন না, স্যার?"

বড়বাবু মুচকি হাসলেন। কিছু না বলার মত অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, "সায়েব ত' ভালই লিখেছে ; তবে আরও দু' একজনও ত' থাকবে—"

ভিতরে ভিতরে খুশী হয়েও বাইরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলিদত্ত উঠে দাঁড়াল, বলল, "আপনি আছেন বলে স্যার আমার ভরসা ; না হলে এরা আমায় ফাঁকি দিত।" নমস্কার করে সে বিদায় নিল। খানিকটা গিয়ে, আবার ফিরে এসে বড়বাবুর কানের কাছে নুয়ে বলল "একটা কথা ছিল স্যার। আপনি যে কি ভাববেন, একটু ভড়কে যাচ্ছি, অভয় দেন ত' বলি।"

"কি?"

"স্যার, এংকট্ রাওকে আপনি কিছু বলেছিলেন নাকি?"

"কোন্ বিষয়ে?"

"না, তাকে একটু শাসন করে, মানে কিছু গালমন্দ করেছিলেন?"

"ধুত্, কি হল কি? একটু ঝেড়েই কাশ না।"

বলিদত্ত ভাবতে লাগল—বলবে কি বলবে না। যেন কথাটা গলা অবধি উঠে আসছে, মুখ পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না। যেন বড়বাবুকে অপদস্থ করায় বড় মর্মাহত সে—এই রকম ভাব। বড় ক্ষুব্ধ, কিন্তু অপ্রিয় কথা বলতে নারাজ। বুকের ওপর মাথা নামিয়ে, আঙুলের নখ কামড়ে, এক পাক এপাশ ওপাশ চক্কর মেরে ঘুরে এল সে। বড়বাবু অবাক, কাজ থামিয়ে তার পানে চেয়ে আছেন, কপাল কোঁচকানো, অশেষ অপেক্ষা।

"বড় বদ লাগলো স্যার, দেখুন ত' কেমন লোকের স্বভাব! বিনা কারণে অপবাদ রটাবে, নানা কথা বলবে ; শুধু কি সে একলা? তার বাড়ীর লোকেও। বলে কিনা—সুবিধা পেলে সায়েবের সামনেও বলবে, 'দেখি কে রক্ষা করে তখন, হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গব।' ভাঙ্গবি ত' ভাঙ্গবি—এত বলে বেড়াচ্ছিস কেন? লোকে ভাববে কি? আপনার পিছনে এমনি! আর, ডেকে জিজ্ঞেস করুন ত' সামনে, ভিজে বেড়ালটি, নুয়ে একেবারে পায়ের তলায় পড়বে, বিনয়ের অবতার! পা-চাটা কি গাছে ফলে?"

"এ্যাঁ, এংকট্ রাও? বল কি তুমি, বলিদত্ত?" কাঁপা গলায়

আপনি বেরিয়ে পড়ল ছেলেবেলার সহজ অভ্যস্ত ভাষা—"ঠিক বলছ, তুমি?"

"আস্তে স্যার, আস্তে; শুনে ফেললে আমায় জ্বালিয়ে মারবে। ও রকম লোকের সঙ্গে আলাদা ব্যাভার; ঐ ত' সবাই কেমন সন্দেহের চোখে চাইছে, দেখুন। আজ সন্ধ্যায় আপনার বাসায় যাব, সব কথা বুঝিয়ে বলব। হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গবে? ভারী ভাঙ্গনেওলা, হেঁঃ!"

"ওঃ, সংসার বটে; ব্যাটা কালসাপ—কালসাপ।" নমস্কার করে বলিদত্ত সরে পড়ল চুপচাপ। তার যাওয়া, না-যাওয়া বড়বাবু লক্ষ্যই করলেন না আদৌ। থ' মেরে, স্থির ভঙ্গীতে চেয়ে আছেন সামনে টেবিলের সারির দিকে। সেইখানেই না? নীরবে বিদ্রোহ ধোঁয়াচ্ছে। তাঁর দানাপানির ওপর চড়াও হয়েছে কোথাকার এংকট্ রাও! নীচের ঠোঁট দাঁতে কামড়ে জন্তুর মত অস্ফুট শব্দ করে বড়বাবু উঠে পড়লেন। ড্রয়ার খুলে একগোছা চাবি বের করলেন। পাশেই লোহার আলমারি। আলমারি খুলে ফাইলটা বের করে আনলেন। তারপর সেটাতে লিখতে লাগলেন দাঁতে দাঁত চেপে!

বলিদত্ত সবই দেখছে, এংকট্ রাও-এর কাছে বসে চালাচ্ছে মধুর আলাপ। "ওঃ, এত খেটে মরছ কেন এংকট্ রাও, কে বুঝবে, কেই বা তারিফ করবে? দেখছ ত' দুনিয়াটা চলছে কি ভাবে। খালি ফাঁকি, যে যত পারে ফাঁকি দেয়। আর তোমার মত যে কাজের লোক—খালি বাড়ী আর কাজ নিয়ে আছে, কাজ আর বাড়ী, তার বাইরে নজর করে না; কে জানছে এই সৎ মেহনতের মহত্ত্ব? তোমার মত রত্ন অন্য কোথায়ও থাকলে কি না হতে পারত এতদিনে, আর এখানে? যেতে দাও সে কথা—"

এংকট্ রাও হাসল, তার ছোট ফ্লাস্কের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল "কাফি, কা—ফি কাভ্বালা?"—

বলিদত্ত না, না করল; এও তার অভ্যাস, আধ কাপ কফি তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে এংকট্ রাও বলল "নাও না, একটু—"

"ওই দেখ এংকট্ রাও, বুড়ো আবার কন্‌ফিডেনসিয়াল আলমারি খুল্‌ছে, সেরেছে রে, মতলবখানা কি?"

"আঃ, কফি খাও না বলিদত্ত, ঠাণ্ডা মেরে যাবে যে, কার মতলবে আমাদের কি যায় আসে?"

খবর মিলল চারটের সময়—বলিদত্তর প্রোমোশন। সারা

আপিস তাকে ঘিরে ফেলল, সম্বর্ধনা জানাল, শুকনো মুখে, নীরস ভাবে। একজনের হয়েছে, প্রত্যেকে ভাবছে তার নিজের হয়নি, হতে পারত। তবুও দানাপানির রেষারেষি, হাতাহাতির লড়াইয়ে মামুলী ভদ্রতা করতেই হয়—সম্বর্ধনা জানিয়ে, পান চেয়ে, জলখাবার দাবী করে, ভোজ চেয়ে—। রহিম থেকে রিচার্ড পর্যন্ত—চাপরাশীরা চাইছে বকশিস।

চকচকে হাসি একগাল হেসে এসে দাঁড়াল এংকট্ রাও। হাত বাড়িয়ে দিল, বললে, "ফললো ত' গণনা ; আর দোষ দেবে না ত'?"

"দোষ, কি দোষ ভাই?" বলিদত্ত চমকে বলল।

"গণনা ভুল হ'লে কি কম দুষে বেড়াতে তুমি? নাও, সিগারেট একটা লাগাও, কাজ ত' শেষ, চল যাওয়া যাক।"

□

কোম্পানী বাড়ীর বড় আপিসের ফটক পেরিয়ে রাস্তায় পড়তেই বলিদত্ত অনুভব করল তার কি যেন পরিবর্তন হয়ে গেছে। পা হালকা লাগছে—হাঁটছে বলে মনেই হচ্ছে না ; যেন উড়ছে। বুক ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে হাওয়ায়, সে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে চায়। হাওয়ায় ভর করে চলছে তার বুকের শোভাযাত্রা! মাথার ভাবনা বেড়েই চলেছে—দূর থেকে দূরে ; মনে হচ্ছে—সব সম্ভব, সবই হাতের নাগালে।

তার পদোন্নতি হয়েছে।

এক ঝটকায় সে ছিঁড়ে দিয়েছে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বাঁধন থেকে তার বেলুনের দড়ি, সাঁ সাঁ করে সে উড়ে চলেছে।

পদোন্নতি কি আর কারুর হয় না? কত ত' হয়েছে, কত আরও হবে। পদোন্নতির নিদানই বা কি? তাতে কিই বা আছে? আর, কি নেই? কিন্তু বলিদত্ত এই মুহূর্তে দার্শনিক নয়, নয় বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিকও নয়!

সে জানে সাফল্য-যুক্ত মানুষ মোহ-মায়া থেকে আনন্দ পায়—এবং তাই হ'ল জীবন।

তার সাফল্যের ধারণা চাকরীতে সীমাবদ্ধ, তার স্থূল রূপ প্রমোশন। শুধু কি বেশী কয়েকটা টাকা, আর কিছুই নয়? কেবল ধনলাভের

আনন্দ ? না, মোটেই নয়। পদোন্নতি যেন তার সমগ্র ব্যক্তিত্বের। একটু রাও, কেশববাবু, মধুবাবুদের চেয়ে সে বড় হয়েছে, সাধারণ জীবনের ভিতর সে ততটুকু অসাধারণ হয়েছে, এতেই আটকাবে না, আরও দূরে মাড়িয়ে যাবে, পিষে চলবে, তখন সে কী হবে ? চোখে আশার ধোঁয়া, পথ দেখা যায় না, ছোট ছোট দুই হাতের পাতা একসঙ্গে মুঠো করে, আবার খোলে, নীরবে ঠোঁটে হাসি খেলে, বলিদত্ত দাস লাফিয়ে লাফিয়ে পথ চলে।

জ্ঞান হওয়ার বয়স থেকে মনে পড়ে—কারুর সঙ্গেই সে গায়ের জোরে পারেনি, তার ছোট গড়ন দেখে লোকে তার সামনে ঘাড় বেঁকিয়ে নীচু হয়ে তাকে নজর করেছে, বুক ফুলিয়েছে, তার ওপরেই গায়ের ঝাল ঝেড়েছে। সবই সে সয়েছে, জেনে শুনে ঝগড়া বিবাদে যায় নি, খেলা-ধুলো এড়িয়ে এসেছে, কাউকে 'না' বলে না, প্রতিবাদ তা'র কোষ্ঠীতে নেই। কিন্তু এই তারতম্য থেকে সে একটা গুণ নিজেই আয়ত্ত করেছে—গায়ের জোরে সামনাসামনি না আসার গুণ ; নিজেকে নিশানের মত তুলে ধরে দৌড়তে গিয়ে হোঁচট খেয়ে আছাড়ের বদলে, পিছন থেকে এড়িয়ে গিয়ে সে কার্য উদ্ধার করেছে। অন্যকে হাতে দুমড়াতে না পেরে, মোচড়াতে শিখেছে সেবা করে, বিনয় দিয়ে, তারিফ জানিয়ে। স্কুলে সে ছিল গুড্ বয়, ভাল ছেলে ; মাষ্টারদের সে বেশী দাগা দেয়নি, বরং গোপনে চুগ্‌লি করেছে—কোন্ ছেলে কি বজ্জাতি করে, শাসন চালাতে সাহায্য করেছে। সেই উপায়েই চাকরীতে সে উপরওলার প্রিয়পাত্র ; ভগবান তার হাতে শক্তি দেন নি বেশী, না দিন ; কিন্তু নিজেকে 'সাবাস' জানায় ; সে কৌশলী, "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য" ; খরগোসের মত হয়েও তার বেশ চলে যায়। এই নীতিতেই হাতে হাতে পরীক্ষায় ফল পেয়ে সে বাড়ী ফিরছে। পুরনো খোলস ফেলে এসেছে আপিসে ; এখন সে সতেজ, সুন্দর। কিন্তু নিজের চেহারা নিজে চোখে দেখেনি। সে বিহ্বল।

ছায়া নামছে ; বাসার কাছাকাছি। সরোজিনী হয়ত বসে আছে। সরোজিনীকে বলতে হবে। তারপর ? চটপট পা ফেলে বাড়ীমুখো।

দূর থেকে শোনা যায় বংশীধ্বনি। বেশ, বেশ—দিন শেষে মধুর বাঁশী, শান্ত সন্ধ্যা। তারপর চুপিসারে নিজের আস্তানা—ছোট উঠানে লম্বা লম্বা ডাঁটাশাকের ওপর, কঞ্চির বেড়ায় ঝিঙেফুল ফুটে থাকবে। কাছাকাছি হ'তেই গোয়াল থেকে গরুর হাম্বা ডাক,

তুলসী মঞ্চের নীচে সল্‌তে জ্বেলে গলায় আঁচল দিয়ে মানত করবে তার স্ত্রী, ঠাকুর ঘরে ঘণ্টা কাঁসরের ঝন্‌ঝন্‌। পড়শীর বাড়ীতে সন্ধ্যা বন্দনা—"দীপং জ্যোতি পরং ব্রহ্ম।"

দূর থেকে বংশীধ্বনি—বেশ, বেশ।

কিন্তু কি এই ছবি চোখে ভাসছে, এ ত' গাঁয়ের ছবি। এ যেন বইয়ে পড়া বিবরণ, অলীক কল্পনা; বোধ হয় সিনেমায় দেখায়—কিন্তু সে ত' সিনেমা দেখে না; তার মনে গড়ে তুলেছে আজব খেয়াল। হয়ত তা তৃষ্ণার মরীচিকা, বিভ্রান্ত যন্ত্র-জীবনের আর্ত হাহাকার।

বাজে কথা! বলিদত্ত চেয়ে দেখল, ওধারে সেই কলেজ ছাত্র জানালার কাছে ফুঁকছে বাঁশী। এ পাশে তার বাসার জানালার পাশে গালে হাত দিয়ে বসে আছে তার স্ত্রী সরোজিনী। "হুঁ, বজ্জাত ছোকরা, ব্যাদড়া ছোঁড়া, বখাটে ছোকরা—" গর্জে উঠল তার মন। কিন্তু তার বাঁশীর সঙ্গে সরোজিনীর অমন করে বসার কি সম্বন্ধ? সরোজিনী এমনই এখানে বসে রোজ তার জন্য অপেক্ষা করে ত'। আহা বেচারা, কী নিঃসঙ্গ লাগতে পারে তার। তবুও, মন মানে না। মনে হয় যেন ও জানালার বাঁশীওলা ছোকরা আর এ জানালার সরোজিনী যেন একই ছবির এপাশ ওপাশ।

রাগে সারা গা কাঁপছে, জোরে নিঃশ্বাস বইছে। বলিদত্ত নিজের বাসার কড়া নাড়ল। সরোজিনী কপাট খুলে দিল। রাগে গর্‌গর্‌ করে ভিতরে খানিকটা গিয়ে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল সরোজিনীর দিকে। পদোন্নতির কথা ঘোষণা করা সে ভুলে গেছে। সরোজিনীর পিঠের খানিকটা চোখে পড়ছে। সরোজিনী আস্তে আস্তে দরজায় খিল দিচ্ছে। প্রকাণ্ড সরোজিনীর পিঠ, একফালি দেওয়াল যেন। সেই মুহূর্তে তার বিকৃত মনের বর্বর চিন্তা সেখানে সেঁধতে পারে না, পিছিয়ে থাকে। বাঁশীর লহর চড়া হ'ল, দেখতে দেখতে আবার গুঁড়িয়ে ঝরে পড়ল; তারপর হাওয়ায় ধুলোর মত উড়ে যায় হাহাকার, জন্তুর গোঁ গোঁ আওয়াজ।

সরোজিনী বিষণ্ণ মুখ ঘোরাতেই দেখল বলিদত্ত গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে, মুখ নীচের দিকে ঢলেছে, ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট চেপে; আন্দাজ করল, স্বামী তার বাঁশীর শব্দে মুগ্ধ, বলল "ভারী সুন্দর বাজছে না? কী উদাস! যে সে কি এমন বাজাতে পারে? আঃ, ভারী ভাল লাগছে—"

"এঁ্যা, কি বললে!"—রাগ যেন রাস্তা পেয়েছে, "ভারী ভাল বাজাচ্ছে না, ভারী ভাল চিল্লাচ্ছে! শা, বেড়ে বখাটেপনা। যত কিছু না বলি, তত লোকের বেলেল্লাগিরি বেড়ে যায়। ভদ্র পাড়ায় এবার বাইজীর খেমটা বসাবে মনে হচ্ছে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা—", চেঁচাতে চেঁচাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে সে দরজার দিকে পা বাড়াল আতঙ্কে তার কাঁধ আঁকড়ে ধরে ফেলে সরোজিনী বলল "ছিঃ, এ কি করছ? কে কার কি করল, তাতে আমাদের কি?"

কাঁধে সরোজিনীর বজ্রমুষ্টি, মাথার ওপর সরোজিনীর বুক, সেদিকে তার মুখ—ছটফট করে বলিদত্ত বলল "ছাড়, রাস্তা ছাড়।"

"রাস্তা ছাড়, বলছি" তার সঙ্গে উগ্রমূর্তি—অভিনয়টা কোথায় যেন দেখেছিল কবে! কলাশিল্প যেন গোপনে বাস্তব জীবনে প্রভাব ফেলছে, তারপর তার আর এক হুঙ্কার—"প্রহরী! প্রহরী!"

"মা গো, আমি কোথায় যাব; তুমি এমন করছ কেন?"

"দেখবো সে কেমন বাঁশীবাজানেওলা, বজ্জাত ছোঁড়া কোথাকার। ওঠ তুমি, ছেড়ে দাও, ঠাণ্ডা করি ব্যাটাকে।"

চিৎকারটা অবশ্য জোরেই হয়েছিল। ওদিকে বাঁশী চট্ করে বন্ধ হ'ল। বলিদত্তর দেহের কম্পনে সরোজিনীর ছোঁয়াচ লেগেছে। দরজায় পিঠ দিয়ে বলিদত্তকে চেপে সে বলল "কোথায় যাবে? কি হল? তোমার হয়েছে কি? চোখ দু'টো যেন জবাফুল, মুখ শুকিয়ে কাঠ, কেন এমন করছ? কোথায় যাবে? মারপিট, ফৌজদারী করতে? পারবে ত'? কেন এমন উচ্ছন্নে যাচ্ছ বল ত'? চিরদিন শান্ত তুমি, গুণ্ডামি, গোঁয়ার্তুমি পারবে? এসো খানিক শুয়ে পড়।"

এঁ্যা, কি বলল ও? "পারবে তুমি?" খাঁটি কথা, নিরেট পেরেকের মত কে যেন হাতুড়ি দিয়ে পেটাল মাথার মধ্যে—সব ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল, ঠাণ্ডা কথা, ঠাণ্ডা পেরেক, কলিজা আরও ঠাণ্ডা। ভেবে দেখলে মনে পড়ে—ছোকরা যেন পাথরে কোঁদা জোয়ান, তার ভালুকের মত ছবি। সে কসরৎ করে। সত্যি যেন উৎকল ভীমের ছোট ভাই। যে ফুটবল খেলে, কলেজে পড়ে, তার বাঁধন নেই। আর সেই চলন্ত পাথরের কাছে বলিদত্ত। দাঁড়াতে পারবে?

সারা গায়ে গরম ঘাম দেখা দিয়েছে। কোটের বোতাম খুলতে খুলতে কর্তাব্যক্তির মত সায়েবী কায়দায় সে বলল "ওঃ সরোজ, এক্সকিউজ মি, মাই নার্ভস্ আ জাম্পিং—মানে, স্নায়ুগুলো লাফাচ্ছে, শরীরটা বোধহয় খারাপ হ'ল। আপিসে কাজের যা চাপ! কাজ

করে করে মাথা বিগড়োবার দাখিল। কান ভোঁ ভোঁ করে, দেখ ত' মাথার ওপর হাত রেখে, গরম নিশ্চয়। তারপর বাড়ী এসে লোকে নিশ্চিন্তে জিরোবে একটু—না, কানের কাছে ওই একটা চেঁচানি। ভাল রে ভাল, বাঁশী যদি বাজাতেই জানতিস বাপধন, না হয় তুই বাজাতিস, আমরা শুনতাম। কিন্তু এ যে চিল শকুনের একসঙ্গে চিল্লানো—হেঁঃ, ইডিয়ট।"

"থাক্ না সে যেখানে আছে, আমরা কেন ঝগড়া করি? দাঁড়াও, খবর দিচ্ছি নীরদবাবুকে; কেমন করে বাজায় দেখা যাবে।"

"হ্যাঁ, তোমার জন্যে ভাব কম হচ্ছে না।"

"আমি নিজের নামে বলব নাকি? বলব তোমার নামে। তোমার নাম বললে শুনবে না, ঠাট্টা নাকি? আমি বলে পাঠাব—এ বাঁশী শুনলে মাথা কেমন করে। আবার এমনও হ'তে পারে যে, কারুর বাড়ীতে একলা আইবুড়ো মেয়ে; বাঁশী শুনলে মা'রা ভাত খাবে না। বাজানোর ইচ্ছা ত' যা বাবা, মাঠে যা।"

"বেশ, বেশ।"

"এসো ত' তুমি, খেতে বসবে।"

দু' মিনিটে সরোজিনী জলখাবার এনে রাখল; খেতে বসতে বসতে বলিদত্ত বলল "ওঃ, কাজের চাপে মাথা ঠিক রাখা মুশকিল—" খেতে খেতে একটা ছোট লেকচারের সূত্রপাত করে সে আরম্ভ করল, "জানো সরোজ, মেহনতী মানুষমাত্রেরই এই দুর্দশা, জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে বাড়ী ফেরে। আর তাদের যত রাগ—ঝাড়ে বাড়ীতে; সাঁঝের বেলা যত কাজিয়া, যত অশান্তি এই জন্য। কি করা যায় বল, যে কাজের যে রোগ। মেজাজ বিগড়ে যায়।"

সরোজিনী বুকে মুখ লুকিয়ে বসে আছে, তুফানটা এত সহজে সে উড়িয়ে দিতে পারেনি। মুখ থমথমে মেঘের মত।

কথার ফাঁকে ফাঁকে বলিদত্ত খাবার গিলছে—বারো আনা শেষ করে এনেছে। পেটের খিদে নিভে গেছে। সারা শরীরে শান্তি ভরে এসেছে। হঠাৎ তার মনে পড়ল—এত বড় কথাটা সে ভুলে গেছে। মজা লাগল—ফ্যাচ্ করে হেসে ফেলে সে বলল "শুনেছ সরোজ! আজ ফল বেরিয়েছে—সারা আপিসে শুধু আমারই হয়েছে প্রমোশন।"

সরোজিনী চমকে উঠল। মুহূর্তেই তার মুখের মেঘ মিলিয়ে গিয়ে দেখা দিল গলানো রোদ। হাসতে হাসতে ঝাঁপ দিয়ে দাঁড়িয়ে

বলল, "সত্যি! এতক্ষণ বলনি! তোমার এত ভুলো মন।"

একটু আগের ব্যাপারের আর চিহ্নমাত্র নেই, বস্তুবাদী দুনিয়ার, যাদুমন্ত্রে ঘিরে এল মোহিনী মায়া; দু'টি হৃদয় বুঁজে এল এক হয়ে কাছাকাছি, একই ছন্দ বাজছে দু'জনের মনে।

সে ছন্দের নাম শার্দূলবিক্রীড়িত নয়; তার নাম চাকুরের প্রমোশন। দুটি পাখী কাছাকাছি, চখা ও চখী; চখা কাঠি-কুটো বয়ে আনে, বাসা বাঁধে, চখী ডিম পাড়বে। তারপর নতুন জীবন— চখা, চখী আর ডিম।

সরোজিনী পান এগিয়ে দিল। বলিদত্ত পানের খিলিটি উল্টো করে মুখে দিয়ে, অন্য দিকটা মুখে করেই এগিয়ে দিল সরোজিনীর দিকে, হাসতে হাসতে সরোজিনী সেটুকু কামড়ে নিল।

বলল "এর পর?"

তার মুখের ভঙ্গী থেকে বলিদত্ত মনে করল যে এ হ'ল প্রমোশনের তাৎপর্য সম্বন্ধে প্রশ্ন, সে বলে চলল "এর পর আর কি? হয়ত ভাল করে দু'মুঠো খেতে পাব; কারণ, মাইনে বাড়ল পঁচাত্তর থেকে লাফিয়ে দেড় শ'। কাল থেকে চাপরাশী পাব। বাসাও নিশ্চয় বদলাবে; এখন 'সি' টাইপ কোয়ার্টারে ত' চলবে না। সে যাই হোক, এ প্রমোশনের লাভ হ'ল এটুকু যে, নাবালকত্ব কেটে গেল; আমরা আর কেরানী নই, ছোট হই বড় হই আমরাও অফিসার; বুঝলে, আমরাও অফিসার। কপালে থাকলে, আমরাও মহাপাত্র হব, সায়েব হব। খালি দিনকতক মেহনৎ, আর মেহনতের সঙ্গে লোকে না ধরতে পারে এমনি একটু ট্যাক্ট। ট্যাক্ট মানে কি করে যে ওড়িয়াতে তোমাকে বোঝাই বল? এর ওড়িয়া নেই আর এ জিনিষ ওড়িয়াদের জানাও নেই। তাই, অন্য দেশের লোকে ট্যাক্টের জোরে কর্তাদের প্লীজ করে বাজি মাত করে, আমরা হাঁ করে চেয়ে থাকি। চেয়েই থাক বাপ 'ওড়িয়া দেড়গোড়িয়া' (দেড়-পা-ওলা); একটুও যদি মচকাবে, সবেতে নিজে যা ভাল বোঝে। কার কাছ থেকে কি ভাবে কাজ হাসিল করতে হবে, ছলে বলে কৌশলে, কোথায় কেমন করে কথা কইবে, জলে দুধ মেশাবে, পুকুর চুরি করবে; জ্যান্ত মানুষের ছাল ছাড়িয়ে নেবে অথচ সে জ্বল্ জ্বল্ করে তাকিয়ে থাকবে। রাজপুতেরা ট্যাক্ট বুঝত; সেইজন্য মোগল রাজত্বেও শাসন চালাত—কিন্তু সে ত' ইতিহাস। এখন অন্যদের দেখ—"

নিজের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে বকে গেল বলিদত্ত ; এসব ত' কথা নয়, নেশা ! নেশা থেকে নেশা লাগে। সরোজিনী চুপ করে শুনছে। কথা যাই হোক বা না হোক বলিদত্ত যেন এক নতুন ব্যক্তিত্বের অবতার। তার চোখে সরোজিনীর চোখ বাঁধা। সে বলে চলল, "আমি বলি, কিন্তু তোমাদের ত' বিশ্বাস হয় না। এখন দেখলে ত' ! এ আর কি ? আরও দেখবে, এ ত' সবে আরম্ভ ! তবে আমাদের প্রধান অভাব কি জানো ? চাকরীতে আমরা এক কড়া সাহায্য পাই না বাড়ীর মেয়েদের কাছ থেকে। মানছি, তোমরা রান্নাবাড়া জানো। কিন্তু পাঁচ টাকায় ত' ঠাকুর তা করে ; মানে, মনে দুঃখ কোর না তুমি, চাকরীতে আমরা তোমাদের কাছ থেকে কি সাহায্য পাই ?

শাস্ত্রে আছে—স্ত্রী সহধর্মিণী ; ধর্ম মানে ত' বৃত্তি। কিন্তু তোমাদের বৃত্তি আর আমাদের বৃত্তি আলাদা। অন্যদের কথা ধর, কোম্পানীর অন্য যত অফিসার—তাদের স্ত্রীরা ফরোয়ার্ড, সময় বুঝে ক্লাবেই হয়ত উপরওলাকে জানাল দু'কথা—অমনি এদিকে স্বামীর প্রমোশন। কেউ তাদের মধ্যে গাইতে জানে, কেউ নাচতে, কেউ খেলতে, কেউ কথা কইতে পারে চমৎকার। কথার ছলে কেল্লা ফতে করে হাওয়া। কেই জানতে পারে ? না, এতে নিজের কিছু ক্ষতি হয় ? বছরে একটি স্বামীর চারটি প্রমোশন। লোকে কোথায় গিয়ে চড়ছে ? কাল যে লোহা গলাচ্ছিল নয় ত' সুতো কাটছিল, আজ সে, তার মত লোক—বড় অফিসার। আর আমাদের গলায় ঝুলছে পাথর, শুধু পাথর।"

বলিদত্তর ব্যক্তিত্ব বেড়েছে, সরোজিনীর কমেছে। নিজের তারিফ করতে করতে সে স্ত্রীকে ছেঁটে কেটে ছোট করে, পাথর করে ফেলছে। সরোজিনী বেবাক চুপ। তারপর ভেবেচিন্তে সে বলল—"লোকে করছে, তুমি বলছ ; আমি শুনলাম সব। কিন্তু স্বামী চাকরী করছে বলে, স্ত্রীরা যদি চাকরানী হয়ে যায় তবে ঘর সংসার চলবে কার জন্য ? ঘর দোরের দরকারই বা কি ? সবাই ত' সব কাজ পারে না ; যে যেমন ভাবে গড়া, তেমনি যা কিছু করতে পারে ; আমি পারছি না বলে দুষলে কি আমি পারব ?"

"ধুত্তোর, ঘোড়ার ডিম বুঝলে তুমি। একেই বলে 'ওড়িয়া দেড়গোড়িয়া, ওয়ানটিং ইন ট্যাক্ট।' তোমাকে কেই বা বলল, কিই বা বলল ? পারবে না ? কিন্তু কখনও চেষ্টা করেছ ? সবাই

সব পারছে, 'তুমিও পারিবে তাহা,' একবার চেষ্টা ত' কর।"

"আমার কিছু চাই না, আমি কিচ্ছু পারব না।"

"আচ্ছা, আরম্ভ ত' কর, সি-এ-টি—ক্যাট, বি-এ-টি—ব্যাট মুখস্ত কর ছদিন। দাও, পান দাও খানচারেক, ঘুরে আসি একটু।"

সরোজিনী পান দিল। বলিদত্ত বেরিয়ে গেল।

পান চিবোতে চিবোতে অন্ধকারে চলেছে বলিদত্ত। চুপচাপ। কলের সঙ্গে চিন্তাও চলছে।

আঁধারে আঁধারে তার জন্য সুড়ঙ্গ খুলে যাচ্ছে আলোর ; সোজা পথ, দূরে আলোর ঝিকিমিকি, সে রাস্তার শেষ নেই। এক পাশে অন্ধকার ঝেড়ে ফেলে বলিদত্ত এগিয়ে যাবে। ভাগ্য! ফুঃ। সব নিজের হাতের কেরামতি ; মূর্খ ভাগ্যের অপেক্ষায় থাকে, সে নয়। অফিসার। অয়মারম্ভ। তারপর থাকে থাকে দেখা যাচ্ছে তার ভবিষ্যৎ। কার মত হবে সে? মহাপাত্র, মহান্তি, সিং, ত্রিপাঠী, দাস, দণ্ডসেনা, মিশ্র, মঙ্গরাজ, জনসন, মিল—অসংখ্য তাদের নাম ; অসংখ্য, তবু অল্প। হয়ত দশহাজারে একটি। স্বতন্ত্র তাদের জীবন, স্বতন্ত্র তাদের শ্রেণী।

প্রণাম পেতে পেতে পাথরও দেবতা বনে যদি ভক্তি সঞ্চার ঘটে ; সেলাম পেয়ে পেয়ে মানুষও সঞ্চার করতে পারে ভয়, সঞ্চার যে করে না, তা নয়। মুখে ক্ষমতার দৃপ্ত ভঙ্গী, স্বরে দৃঢ়তা, চলবার কায়দাও কথা কয়—'আমার ক্ষমতা আছে, আমি সাধারণ নই।' লোকে তাদের কাছ থেকে যেন গন্ধ পেয়ে আপনি দূরে হটে যায়, রাস্তা ছেড়ে দিয়ে গাছের তলায় জড়ো হয়ে দূর থেকে হাত দেখিয়ে বলাবলি করে। মন-মাফিক ব্যক্তিগত জীবন, ছনিয়ার গড়পড়তা মাপকাঠি দিয়ে কেউ মাপতে যায় না ; তাই সে মাপের বাইরে।

সেই শ্রেণীর একজন আজ সে—বলিদত্ত দাস। বিলকুল বেপরোয়া। আজ গাছের ডালে চড়ে, সেখান থেকে নীচে নজর করে নিরাপদে দাঁত দেখানো যায় ; ওপর থেকে দেখে তার কেরানী জীবন। সে জীবনের প্রতি ঘৃণা হয় ; কারণ, তা ছিল নিজের অতীত। একটুও সহানুভূতি আর নেই তার জন্য। সে কেরানীদের এখন নাচাবে, হয়রান করবে, ঘাড়ে চেপে কাজ আদায় করবে ; সে জাতের সব ফিচকেমি তার জানা। নিজেকে সে দলের বলে ভুলেও পরিচয় দেবে না। নোংরা, ছেঁড়া কানির মত সে অতীত গেছে ত' যাক্।

সে এখন অফিসার।

সে বলের অবতার, বপুর না হ'লেও। সে কার্যদক্ষতার অবতার, মেহনতী ঘোড়া, ট্যাক্‌ট চঞ্চু, বুদ্ধিতে গজানন, অতিমানব শ্রেণীভুক্ত। তার লজ্জা নেই, কুণ্ঠা নেই, মায়ামমতা নেই, নিষ্ঠুর দায়িত্ব ঘাড়ে বইবার নির্মম তার শক্তি, সোজা তার পথ কেটে এগিয়ে যাবে— নিন্দন্তু নীতিনিপুণাঃ।

লোকে তার অনুসরণ করবে, মাথা নোয়াবে, দাঁড়িয়ে থাকবে প্রতীক্ষায়, সাক্ষাতের আশায় নাম-লেখা স্লিপ পাঠিয়ে বাইরে ঘুরে ঘুরে ধুলো খেতে থাকবে। দেখা হ'লে জনপিছু সে দেবে এক মিনিট, বারংবার ঘড়ি দেখে জিজ্ঞেস করবে "আর কি? এবার আসুন?"

তার মন ফুলে উঠেছে—কিন্তু বড় নিঃসঙ্গ সে, সঙ্গীসাথী নেই। ইচ্ছা হোল একটা সিগারেট খেতে; কাছেই পান বিড়ির দোকান একটা। সে হাঁকল "এই একটা ক্যাপষ্টান।" পানওলা এক গোছা খিলি তৈরীতে ব্যস্ত, গ্রাহকদের সঙ্গে খেলার বিষয়ে চর্চাও চলছে। নতুন কে একজন খেলোয়াড় নেমেছে সম্প্রতি—ফরিদ মিয়া, আলোচনা তার বিষয়ে। তাই খিলি তৈরীতে দেরী হচ্ছে।

"এই, একটা ক্যাপষ্টান"—

চারবার এমনি হাঁকবার পর পানওলা বলল "হ্যাঁ, দিচ্ছি।" বলেই অন্য ক্রেতাকে জিজ্ঞেস করল "বাবু, আপনার কি চাই? খয়ের দেওয়া কড়া গুণ্ডি? দেশী গুণ্ডি কে লেবেন?"—ফের ফরিদ মিয়ার কথা। ঝুলন্ত দড়ির আগুন থেকে বিড়ি ধরাতে ধরাতে একজন (তার মাথায় রুমাল বাঁধা, হাড়-বের-করা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ছাগলদাড়িও ঝুলছে, ছেঁড়া ময়লা কামিজে কালো ফতুয়া, কোমরে কাপড়ের পাড়ে বাঁধা পায়জামা তেলচিটে, তাপ্পীমারা) কথা উস্‌কে বলছে "ফরিদ মিয়া আর কি খেলবে? ওর চাচা সামাদ ওর চেয়ে ঢের ভাল খেলত, ল্যাং খেয়ে তার হাঁটুটা ভেঙ্গে গেল বলে, নইলে?" বিড়িটাও সহজে ধরতে চায় না, কোথায় কেনা কে জানে! মুখে খালি 'ফরিদ মিয়া।' বলিদত্তর "এই, একটা ক্যাপষ্টান" হাঁক কথার তোড়ে ডুবিয়ে দিয়ে জোয়ারের মত গড়িয়ে চলে পানওলার বলিষ্ঠ অভিযান ফরিদ মিয়ার স্বপক্ষে, অচেনা খেলোয়াড় ফরিদ মিয়া পানওলার একটা অতৃপ্ত আদর্শের রূপ; তার জন্য সে কি না করতে পারে। এমনি লড়াই চলে খেলার মাঠে দর্শকদের মধ্যে কখনও কখনও রক্তে, চোখের জলে মেশা।

সে থোড়াই কেয়ার করে কাউকে! ফরিদ মিয়া ভাল খেলে—তার জন্য সে দশকথা অবশ্য বলবে, কর্তব্যের তাগিদে।

"কি, দেবে না একটা সিগারেট?" বিরক্ত হয়ে বলিদত্ত হাঁকল। কিন্তু এখানে তার অফিসারির দাম নেই, ফরিদ মিয়ার দাম বেশী। পানওলা করুণার চোখে তাকাল তার দিকে—বাবুটি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে। সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল "বাবু আপনিই বলুন ত! যান নি খেলা দেখতে আজ? কোন্ খেলোয়াড় আপনার চোখে বেশী ভাল খেলেছে?"

"আমি যাইনি মাঠে।"

"ও।" এ বাবু নিম্নস্তরের—সাধারণ গ্রাহক মাত্র। পানওলা অন্যদের জেরা করতে শুরু করল। বলিদত্ত বলল "দেশলাই দাও ত' সিগারেট জ্বালাব।"

"ঐ ত' দড়িতে আগুন।"

"কেন, দেশলাই নেই?"

"বহুৎ আছে, লিন না লতুন একটা কিনে—দেব?"

"না থাক।" সিগারেট কিনে আত্মমর্যাদার বেশীর ভাগই বিকিয়েছে ইতিমধ্যে। দড়ির আগায় আগুন পর্যন্ত সিগারেট পৌঁছয় না। দড়ি নড়ছে, সিগারেট শুদ্ধ মুখ তার পিছু পিছু। আগুন ধরিয়ে ফুঁকেছে কি না ফুঁকেছে, নেপথ্যে কাদের কোলাহল ভেসে এল—"লেগেছে রে লেগেছে।"

শহরের পানের দোকান সাম্যের পীঠস্থল—সেখানের পাল্লায় তার বড়লোকী সামন্তসুলভ মনোভাব পাত্তা পায় না।

ক্ষুন্ন মনে আবার রাস্তায়, ফের চিন্তা—কেউ বোঝে না, কেউ দেয় না তার মনের মত পাওনা, না স্ত্রী, না জনসাধারণ। গেঁয়ো যোগী কিনা, ভিখ্ মেলে না; এ দেশে বীরপূজা নেই। হতভাগ্য দেশ! কেউ খাতির করে না কারুর নিন্দা প্রশংসা। তবুও এগোতে হবে। সে যেন ষ্টীম রোলার, সে অফিসার, লোকে ক্রমশ জানবেই জানবে, ক্রমে তার কাছে তাদের আসতে হবেই হবে। তখন? হেঁঃ, তখন?

উৎসাহ বাড়ছে, চলেছেন নতুন জন্মানো অফিসার। রাস্তায় এমনি বুক ফুলিয়ে চলে কত মূর্তিমান উৎসাহ! আবার তারা অন্ধকারে হারিয়েও যায়। অতীতে কত রাজা, অমাত্য, বুড়ো মন্ত্রী, মহাপাত্র এমনি গেছেন। তারাও নতুন উৎসাহে চলা শুরু করেছিলেন, ভেবেছিলেন মাটিতে রেখে যাবেন মোহরের ছাপ, হাতের মুঠো শক্ত

ছিল, পায়ে অনেক কিছু মাড়িয়ে চলেছিলেন। কালের স্রোতে তাঁরা ছিলেন কল মাত্র, মরচে ধরলেই মাটি! মাটির নেই উৎসাহ, নেই তেজ। কিন্তু বলিদত্ত খুঁজছিল বিশিষ্টতা। তার নজর ওপরের আকাশে নয়, তলার মাটিতেও নয়, এগিয়ে চলেছে সে তড়িঘড়ি, মনের গভীরে ষ্টীমরোলারের ধারণা।

অন্ধকারে প্রতিষ্ঠার খোঁজে বেরিয়েছে ছোট একটি অহমিকা; বাচ্চাদের মুখের ফুঁ দিয়ে ফাঁপানো খুদে এক বুদ্বুদ; ফুলে উঠেছে, ফাটে নি। আদিম মনে যখন বিশ্বাস জন্মায় যে শক্তি বেড়েছে, জন্তু তখন নানা বাহানায় সে শক্তি যাচাই করে দেখে। পরখ করে তার ওপর যাকে সে নিরীহ হীন বলে মনে করে, যে বাধা দেবে না বলে তার ধারণা। ছোট জন্তুকে মারে, পেন্সিল ও কাপড় কামড়ে ছিঁড়ে দাঁতের জোর পরখ করে, বাচ্চা ষাঁড় চারাগাছ শিং-এ গুঁতোয়, পিঠ রগড়ায় ভাঙ্গা খাটো দেওয়ালে। ফ্যাসিষ্ট রাজ্য পড়শী ছোট দেশের ওপর চড়াও হয়।

যাচাই করে দেখার এই প্রচণ্ড নেশা বলিদত্তকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার অতীতের সহকর্মী বন্ধুর বাসার দরজায়; কারণ, বলিদত্ত জানে দানাপানির যুদ্ধে বন্ধু পড়ে আছে অনেক পিছনে; বন্ধু হেরেছে, সে স্বয়ং জিতেছে। সেইখানে আজ হোক তার আবির্ভাব; সে বলিদত্ত দাস, সদ্যোজাত অফিসার। মৃদু হেসে চিরকাল খোলা আরামকেদারায় বসে সে জিজ্ঞেস করবে "কি রে বন্ধু, ভাল আছিস? চলছে ত' সব ভাল?" বন্ধুকে হয়তো দু'চারটে সদুপদেশ দেবে; সদুপদেশ দিতে তার ভাল লাগে যদি শ্রোতা রাজী থাকে। তাই তার দৈনন্দিন সামাজিক কাজ, সমাজে তার অমূল্য দান, মুফত পরোপকার। পরোপকার স্বর্গীয়। সে আক্কেল বিতরণ করে।

তাই সে বলবে হয়ত "এমন ঝগড়াটে বুদ্ধি ছাড়্ বন্ধু, নরম হ, বর্ষার ছাঁটের দিকে ছাতা দেখা, এমন করে কদ্দিন চল্‌বে ভাই?" "ভাই" সম্বোধন জুড়ে দেবে সে দরদ দেখাবার জন্য। "ভাই" উচ্চারণ করার সময় যেন গলা ভারী হয়ে আসে; সব তা তরল, সাফ্ করে দেবে গ্লিসারিন অ্যানিমার মত। "তুই নরম হ' ভাই; তোর বুদ্ধি আছে, বিদ্যা আছে, পার্টস্ আছে। লাগসৈ তা লাগাতে পারিস্ না, জুতসৈ তা জুড়তে পারিস্ না। একবার করে দেখ্, একমাস ত' দেখ্, নয়ত দু'মাস; তারপর বলিস আমায়।"

এবং বন্ধুর মন সে আক্রমণ করবে বইয়ের মাধ্যমে ; কারণ, বন্ধু বই পড়ে, বইএর ভিতর দিয়ে পৃথিবী দেখে এই মূর্খ ; কিন্তু বই ত' বইয়েই ; সাফল্যের জন্য বই লেখা হয়েছে গাদাগাদা।

"বই পড়বি ভাই বন্ধু, আসল দামী বই— হাউ টু উইন্ ফ্রেণ্ডস্, উপরওলা বশীকরণ বিদ্যা আর কি ! নইলে ওকিমুরার বই—সাক্সেস্ ! তা' থেকে এই একটা কথাই বিচার করে দেখ্, প্রথমে, সূত্রটা হচ্ছে সংসারে সবাই নিজের অহমিকা খাড়া করে ভাবে নিজের মতটাই ঠিক্। তাদের কথায় মাথা নাড়ালে, প্রতিবাদ করলেই অপমান মনে করে তারা, আর নিজের মতটা আরও জোরে আঁক্‌ড়ে ধরে। তাই, সেক্ষেত্রে উপায় কি ? উপায় হ'ল, শুরুতে তাদের কথায় "হ্যাঁ" বলা। 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি যা বলছেন, তা' একদম ঠিক। এর চেয়ে ভাল আর কে বলতে পারে। তবে কি না, আর একটা দিকও আছে—যা আপনার মর্জি। ধরুন্, এই অন্য রকমে কথাটা নেওয়া গেল ; আপনি তখন বলবেন হয়ত 'ও, এমনও ত' হ'তে পার্‌ত ;' তা'ই বল্‌ছি আর কি ! এইভাবে সর্বদা 'আপনি', 'আপনি'—'আমি' নই ; 'আপনি বলছেন', 'আপনি করছেন', 'আপনি ভাবছেন'। এই রকম ক্ষেত্রে 'আমি'র স্থান মোটেই নেই। ক্রমে দেখবে 'আপনি' আমার মতটাই আপনার নিজের মত বলে ধরে নিলেন এবং আরও জোরে তা জারি করতে শুরু করলেন। 'আপনি' থাকবেন, কিন্তু চলবে আমার কথাই, 'আমি' জিতব। 'আপনি' নিজেই নিজের আগের কথার প্রতিবাদ করে শেষে বল্‌বেন —'হ্যাঁ হে, এ ত' খুব ঠিক ; তবে আমি কেন ও রকম ভাবছিলাম আগে ?' সেই সময় ও রকম ভাববার কারণটা ঢেলে দিতে হবে শক্রর ওপর। সেই ভুল বুঝিয়েছিল বলে 'আপনি' ভুল পথে যাচ্ছিলেন। তারপর দেখবে—হঠকারী 'আপনি' নিজের প্রথম মতের দায়িত্ব ঢেলে দেবে সহজেই তোমার শক্রর ওপর। কেবল যে তোমার মতই বজায় থাক্‌বে তা নয়, একটা শক্রও নিকেশ হ'বে। কেমন এ সায়েন্স, হ্যাঁরে বন্ধু, প্রত্যেকে, মানে যারাই ওপরে উঠছে, ধরছে এই নীতি। আর তুই ধর্‌বি না ?"

কল্পনা কর্‌ছে সে বন্ধুর মুখ—চুপচাপ বিড়ি টেনে যাচ্ছে। হায় রে বন্ধু !

আজ বলিদত্ত সহানুভূতি ঢেলে দেবে ; কারণ, তার প্রমোশন হয়েছে। সহৃদয় ব্যক্তির আড়ালে তার ছোট ঘটিটি পূর্ণ, কানায়

কানায়। চাই কি, দরদ দেখিয়ে ত্ব'ফোঁটা চোখের জলও ঢালতে পারে বন্ধুর ত্বঃখে। ফের ডবল উৎসাহে সেখানে নামাবে জাপানী ব্যারণ ওকিমুরা ও ইয়াংকি ডেল কার্নেগীকে। বলিদত্ত বকে চলবে ; বনুর চা গরম, বনুর বিড়ি কড়া ; হয় ত' সিগারেট একটা রোল্ করে থুতু লাগিয়ে সে বাড়িয়ে দেবে, টিনে যদি তামাক থাকে।
বলিদত্ত পাঁয়তারা কষছে। সন্ধ্যে ত' সবে শুরু!

□

অবশেষে বনুর বাসা। চেনা সবই। চেনা গন্ধ। তা'র স্পর্শে পুরনো স্মৃতি আবার নতুন হয়। সদর হাট খোলা, ঝুম্‌কো চামেলীর ঝোপ ; আলো ঝলমল ছোট কাম্‌রা অন্ধকার রাস্তার ওপর তার কিরণ ছড়াচ্ছে। অন্য ধারে প্রকাণ্ড প্রাসাদ, রাস্তা যেন আগন্তুকদের গ্যারেজ বনেছে। গাড়ীগুলোর ফাঁকে ফোকরে হাটুরেদের যাওয়া আসা চলছে।
বনুর বাসার চৌহদ্দির মধ্যে এক পা দিতেই, কালী কুত্তী কর্কশ ঘেউ ঘেউ রবে চড়াও হ'তে হাজির। "আরে, আরে, টমি, চুঃ, চুঃ—"
"ভোঃ ভোঃ ভোঃ, কন্থম্ ভো—" কালী কুত্তী লেজ নেড়ে রাস্তা ছেড়ে দেয়, শুঁকতে শুঁকতে পিছনে দৌড়য়। কথায় বলে, কুকুর গন্ধে মানুষ চেনে। কালীকুত্তীর গন্ধস্নায়ুতে আজকের বলিদত্ত অচেনা মনে হচ্ছে—কী বিচিত্র!
বলিদত্ত প্রত্যাক্রমণ করতে ইট কুড়ালো একটা ; কালীকুত্তী সতর্ক ছিল—সে ছাড়ল এক লম্বা চিল্লানি, দাঁত ছরকুটে গ্যাঁও, গ্যাঁও করল। তার লম্বা চিল্লানি ছিল কুকুরীয় ভাষায় বোধ হয়—সাহায্য ভিক্ষা। বাস্তু-কুত্তী সে ; এ পাড়ার রাস্তার বাঁকে আছে অনেকে যারা তার প্রশংসক, তা'র উপাসক, তার বন্ধু। দূর থেকে তারা তার আবেদনের জবাব দিলে। বলিদত্ত কি বুঝবে এ সব? কিন্তু হঠাৎ সে অনুভব কর্‌ল যে, এক কুকুর-ব্যূহ তার চার পাশে। সে, বলিদত্ত, কোম্পানীর অফিসার! রাগ হবারই কথা ; কিন্তু ধীরে রাগ কমে লাগল ভয়—কি ত্বর্যোগ, একে রাত, অন্ধকারে আবার পাড়ার কুকুরে ঘিরেছে কামড়াতে, দাঁত বের করে, জিভ্ লক্‌লক্ করে তারা খেদিয়ে আস্‌ছে, কেউ কেউ পায়ের নখে রাস্তা আঁচড়ে মহড়া

দিচ্ছে, কোনটা ঠ্যাং উঁচিয়ে প্রস্রাব করে প্রস্তুত হচ্ছে, সকলের মুখে করাল কোলাহল বিবিধ স্বরে এবং—চামেলীর ছায়াতলে দাঁত ছরকুটে, গর্জন করে, নেচে নেচে কালীকুত্তী তাদের উত্তেজিত করছে : এগোও, এগোও, দেখাও সর্বহারাদের সংহতির শক্তি নরম পুতপুতে স্বস্তিবাদের ওপর !

রাস্তা থেকে করুণ কণ্ঠে বলিদত্ত চ্যাঁচাল—"বনু"।

"আরে, তুই ? এই টমি, ভাগ্। চলে আয় ভাই, ও কিছু করবে না।"

অপমানিতা টমি "ভেউ ভেউ" প্রতিবাদ জানিয়ে বাসায় ঢুকে পড়ল। ইংগিত বুঝে পাড়ার কুকুর পাল ফিরে গেল। বলিদত্ত মুক্ত হল ; কিন্তু সে পড়ল বনুর পাল্লায় ; হাড় বের করা হাতে তার বাহু মুচড়ে বনু ঘষটে নিয়ে চলল তাকে—পাগলা বনু—"আরে, এমন করে কাঁপছিস্ কেন ? ভয় পেয়েছিলি বুঝি ? ওরে অন্তা, এই সন্টুদা, এই নন্দ, অশোক—এই দেখ্ বলিদত্ত এসেছে" আরাম-চেয়ারে তাকে ঠেসে দিল বনু "বোস্, চা খা, সুস্থ হ' ; বেচারাকে কুকুরে তাড়া করেছে।"

"নমস্কার" বলিদত্ত বলল।

"নমস্কার, কি বলিদত্ত, খবর কি তোমার ? মুখটা ফ্যাকাশে কেন ? কি হয়েছে ? হ্যাঁরে বনু ?"

"ওঁর প্রমোশন হয়েছে।" নন্দ বলল।

সকলে হাসল। অন্ত বলল "ভাল লজিক্ তোমার, নন্দ ; প্রমোশন হ'লে মুখ শুকনো হবে কেন ?"

"কারণ, তা'হলে কুকুরে পিছু নেয়।" সবাই হেসে উঠল ; বলিদত্তকেও হাসতে হ'ল। নন্দ দাঁড়িয়ে উঠে বলল "তিন তিনটে প্রমোশনের পর আমার যথেষ্ট উপলব্ধি হ'য়েছে ভাই বলি-দাস যে, প্রমোশন হ'লে কুকুরে পিছু নেয়, আমার পিছনেও কুকুর। হ্যাঁ, তাই আমি সংসার ছাড়ছি। চললাম ভাই বনু।"

"এত শীগগির ?"

"একদিন ত' যেতেই হ'বে রে, উল্লুক ! তা আগেভাগে যাওয়াই বরং ভাল ; নাগালের মধ্যে থাকতে থাকতে সব পথ সাফ করে লোক যেতে পারে তা হ'লে। চলি ভাই।" নন্দ এগোল।

"কোথায় চললেন, নন্দবাবু, এত চটপট ?" বলিদত্ত বলল। নন্দ বলল—"আমিও খাটছি একটা প্রমোশনের সন্ধানে বলিদত্ত বাবু,

সন্ধ্যাবেলা একটু না গেলে নয় ; কি ভাববে ও'রা ?" নন্দ হাসল।

"তা'ও বটে, তা'ও বটে" বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলল বলিদত্ত।

"দাঁড়া" বলল বনু। সন্টুদা ধ্যানস্থ, অন্তু ও অশোক খবর কাগজে মগ্ন।

"তুই ত' বল্‌বি দাঁড়াতে ; তুই কি বুঝিস্ ? এই দেখ্ বলিদত্ত বাবু কি চটপট বুঝে নিলেন, সমঝদার কি না ! ওরে বোকা, সন্ধ্যায় যেতে হয়, বুঝলি ; তোর মত ঘরে বসে থাকলে কাজ চলে না।"

"ঠিক্ কথা, বনু, ছেড়ে দে ; উনি যান। আচ্ছা, নন্দবাবু, আপনার প্রমোশন হচ্ছে কোথায় ?"

"কোথায় ? বলে ফেল্‌ব ? 'মনসা চিন্তিতং কর্ম'—জানেন ত'। আপনি কি বলে ফেলতেন ? না, বলেছিলেন ? আচ্ছা, সকলে বলুক—আমার প্রমোশন হচ্ছে এইটুকু ত' আমি বলেছি ; আর এক ঘণ্টা নাগাদ নিশ্চয় খবর কাগজে বেরোবে ; ফের বলে দেব, কোথায় প্রমোশন হবে ? তোমরা সব চেপে রাখবে ত' খবরটা ? হ্যাঁরে, বনু, বলব, না বলব না ?" নন্দ হাসতে হাসতে বলল।

"বল্ না, বলেই ফেল্ !" বনু বললে।

"বলুন, বলুন" বলিদত্ত চেপে ধরল।

"খবরদার, বলিস্ না"—অন্তু বলল।

"ওটা পাগল"—সন্টুদা বললেন "কি বলবি রে, পাগল ?"

নন্দ বসে পড়ল "বলেই যাই তবে, না কি ? কারণ, অন্তু মানা করছে। শুনুন বলিদত্ত বাবু—কোন্‌খানে প্রমোশন পাওয়ার চেষ্টা করছি। আপনাকেই বললাম ; কারণ, আপনার সঙ্গে সেখানে কম্‌পিটিশন নেই। সন্টুদা ত' আগেই সেখানে পৌঁছে গেছেন—মা'র কোলের ছেলে আর কি ! অন্তু আছে সঙ্গে ; কিন্তু ও সেখানে পৌঁছবে আগে, যে রকম জোরে সব কিছু মাড়িয়ে এগোচ্ছে, হাড় কালি করে ফেলেছে। তবেই দেখুন ঃ বললাম, বললাম, বললাম—কোথায় প্রমোশন আমার।"

তারপর উচ্ছ্বসিত আনন্দে হাসতে আর গাইতে লাগল—

"ওরে, সেইখানে রে, সেইখানে। শোনো—

শূন্য মন্দিরে বিহার রূপরেখা নেই তা'র
দুই পা না মিশে তা'র, এক পা ধর ধর।
অলেখ পাটনাপুর সেই স্থানে তাঁর ঘর ;
নেই শরৎ কি গ্রীষ্ম তথা ; সজ্জন সন্ধান কর।

নিরামিষ, অনুচ্ছিষ্ট যত পিণ্ড, লাগে মিষ্ট

অদেখা অতৃপ্ত স্বাদ সজ্জন সাধুর।

গমন-বিভঙ্গ হেরে জ্ঞানীলোকে ভেবে মরে।

চোখের চাহনি ঘোরে বিজলীর চেয়ে খর।

যেইখানে ব্রহ্ম রাজে অস্ত বা উদয় নাই যে

ভনে ভীম অরক্ষিত, নির্মল নি-অন্ধকার।

সেইখানে আমার প্রমোশন, বলিদত্তবাবু, সেই 'অলেখ পাটনা-পুর।' তারপর তা'র চোখ ছল ছল করে এলো, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ, অশ্রুসিক্ত নন্দ হাসতে হাসতে বলল "হচ্ছে কই, অনেক বাকী, হচ্ছে কই ?" কান্নাভরা গলায় আবার গাইল—

"ত্রিভঙ্গ হে, পদ জুড়ি আমায় তার্‌বে না কি ?

আমায় কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে মারবে নাকি ?"

গাইতে গাইতে চলে গেল নন্দ, রাস্তায় পড়ে হাঁক্‌ল—"ভাই, কেউ যেন ঋণী করে রেখ না আমায়, নমস্কার, নমস্কার—"

বন্ধু উদাস হ'য়ে বলল "সোজা যাবে শ্মশানের কাছে মঠে।" সন্টুদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "সবই গোবিন্দের ইচ্ছে।"

বলিদত্ত অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল। এসব সে কি দেখ্‌ছে ? এ ত' থিয়েটার! সাধারণ জীবনেও এমন হয় নাকি ? মানুষ সত্যি সত্যি থিয়েটার করে ? এখন মনে পড়ছে—চেনাশোনা নন্দ আর এ নন্দ —সত্যিই কত ভিন্ন! সে নন্দ ছিল পোষাক ও চালবাজিতে স্মার্টতম, টক্কর দিত মোটা দুখুর সঙ্গে। দুখু আজ নেই, মনে পড়ে তার ফোলা ফোলা গালের মধ্যে খাঁদা নাকটি, চোখে চশমা ; কথা কইলে গুলুর গুলুর ফুস্ ফাস্ শব্দ। তার চুড়িদার পাঞ্জাবী সিল্কের চটক্‌দার রুমাল পকেট থেকে খানিকটা বেরোন, সারা গায়ে সুগন্ধ। এম, এ, বি-এল দুঃখু সাত বোনের এক মাত্র আদুরে ভাই, কত শৌখীন, কী দিলদার, ছোক্‌রা বয়সে দুখু মারা গেল।

নন্দর সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে মনে পড়ল দুখুকে।

এই চেয়ারে দুখুও একদিন বস্‌ত। এই কামরায় সে লাগাত ধুন্ধুমার। বিশ্বাস করা কষ্ট—দুখু আজ নেই।

নন্দ দুখুর সঙ্গে শুধু কি টক্কর দিত ? না, সে আরও বেশী এগিয়ে গিয়েছিল। দুখু জীবনকে ভালবাস্‌ত, ভালবাস্‌ত যত সুন্দর গন্ধ, সুন্দর রাত, সুন্দর ফুল, সুন্দরী মেয়ে—। কিন্তু সে শুধু এসব দেখতেই ভালবাসত। ফুলকে ফুলের মতই শুঁক্‌ত দূর থেকে, হাতে

করে টিপতে বা ছিঁড়তে তা'র মোটা আঙ্গুলে বাধত, ইয়া বড় মোটা, ফুলো দেহেও তা'র সংকোচ হ'ত। তাই শুধু দেখবার ছলে সে দৌড়াদৌড়ি করত—দিল্লী থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে বোম্বাই, বোম্বাই থেকে পুরীর সমুদ্রতীর—সেখান থেকে ফের্ করাচী তক্। সর্বদা সঙ্গে ক্যামেরা। জড়ো করে তাড়া তাড়া ফটো, সুশ্রী মেয়ের, সুন্দর দৃশ্যের। সংগ্রহ করত বোঝা বোঝা কাহিনী—সুন্দর রাতে সুদূরের অনুভূতি ভরা। এই ঘরে গল্পের জাল বিছাতো খুব উৎসাহে —"বুঝলি, বনু—"। দুখুর ধপধপে সাদা, চুনট করা ফিনফিনে পাতলা পাঞ্জাবী, কোঁক্ড়ানো, কুচকুচে মাথার চুল, ছোট খাঁদা নাকটি, মুখে ছেলেমানুষী হাসি, সে বসুধা বন্ধু। দানাপানির কামড়া-কাম্ড়ির ছোঁয়াচ তার জীবন পূজায় লাগতে পারেনি। সংসারে তার শত্রু ছিল না। মোটে তিরিশ বছর বয়সে সে চলে গেল। সেও কি গেল—"অলেখ পাটনাপুর, সেইস্থানে তাঁর ঘর,

নেই শরৎ বা গ্রীষ্ম তথা ; সজ্জন সন্ধান কর ?"

পদকর্তা (অরক্ষিত) ভীম ভোই-এর ভজনের সঙ্গে মনে মনে ঝনঝন করে ওঠে দুখুর জন্য দুঃখ। নন্দও ত' যেন কোথায় গেল? নন্দ ছিল দুখুর প্রতিদ্বন্দ্বীর মত। সেও ভালবাসত সুন্দর রাত, সুন্দর ফুল, সুশ্রী মেয়ে—কিন্তু শুধু দেখার জন্য নয়, চেখে, খেয়ে হজম করার জন্য। ঠাকুর দেবতার ভোগ সাবড়াতে, দেবী মূর্তির কাছে দেওয়া পুজোর পানা সাঁটতে, সে ছিল ওস্তাদ। পরিণামের পরোয়ায় সে মাথা ঘামাত না। তাই কত বিচিত্র তার অনুভূতি—কোথাও সে কারুর ধর্মভাই, কারো বা টিউশন-মাষ্টার, কারুর সঙ্গে সফরে সহযাত্রী, কারো মিতে—এম্নি কত কি। তার অশান্ত দেহক্ষুধা মেটাতে সে মন্দিরের আশপাশেও নাক গলিয়েছে, গীর্জায় হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় যোগ দিয়েছে, মস্জিদের পিছনে গলিতে ঘুর ঘুর করেছে। একই উদ্দেশ্যে সে কষ্ট করে বাংলা শিখেছে, পুরীর সমুদ্রধারে হোটেলে থেকেছে, নাম ভাঁড়িয়েছে—কত কীই যে করেছে! কারণ, সে চাইত কাঁচা মাংস চাখতে। ফলে, কোথাও সে খেয়েছে বেদম্ মার। কখনও বা কার কাছ থেকে নাম লেখা রুমাল নয়ত অন্য কিছু উপহারও পেয়েছে। ফলের অপেক্ষায় সে কখনও বসে থাকে নি, সর্বদা চেষ্টার ত্রুটি করে নি। সব সময় চালবাজ, ফিটফাট, হাসিমুখ, আর কথার স্রোতে শুধু একটার পর একটা হৃদয় জয়ের কাহিনী—"সেবার কি হল জানিস্? যাচ্ছিলাম্

ট্রেনে, খুব ভীড়, ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে উঠতে চায় একলাটি এক মেয়ে, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, ঠোঁটে লিপষ্টিক্। হঠাৎ আমাকেই লক্ষ্য করে বলল—"মশায়—একটু।" তারপর কর্‌লাম কি।"

সেই নন্দ!

বলিদত্ত চমকে উঠে ভাবল—খালি কি তা'র মন বদ্‌লেছে? চেহারাও ত'। দাড়ি কামায় নি, বেশ বড় দাড়ি গজিয়েছে, কপালের মাঝখানে সিঁদুরের তিলক, চোখ লাল্‌চে, বসে বসে কতবার সে মৃদু মৃদু হাসে—যা'কে বলে ধর্ম পাগল।

সেই নন্দ, বিদ্যায় এম. এ, চাকরীতে কেষ্টবিষ্টু, উদ্দেশ্যে চিরদিনের সুবিধাবাদী, ব্যবহারে বস্তুতান্ত্রিক, ধর্মমতে নাস্তিক, চার্বাকপন্থী।

কল্পনা করা যায় না, সেই নন্দ আজ বিবাগী হ'তে চলেছে। জীবন তা'র কাছে তুচ্ছ—যেন সে ভুলেছে দানাপানির ভাবনা।

"কি ভাব্‌ছিস বলিদত্ত, নে' বিড়ি খা—"

"না, কিছু ভাব্‌ছি না ত'।"

"ধুত্, মিছে বলছিস; কি ভাব্‌ছিস বল্; নইলে ধরব তোর কান।"

"ওর যা ভাবনা ও ভাবুক, তা'তে তোমার কি?" সন্টুদা বললেন।

"ভাবিস্ নি রে; ভাবলে এই নন্দর মত বিবাগী হয়ে যাবি।"

"সে ভয় নেই ও'র; বন্ধু, নন্দ কি বলে গেল—নিরামিষ, নিরুচ্ছিষ্ট, যত পিণ্ড, লাগে মিষ্ট, বলিদত্ত কি চায় এ সব? ও আমিষ চায়, এঁটো চায়, দেখা চায়, নামও চায়। তোর মত বোকা ত' নয় ও। না, কি বল বলিদত্ত?"

"আপনি কি খাসা উড়িয়া বল্‌ছেন, সন্টুদা।" বলিদত্ত বল্‌ল।

"ওঁকে বল্‌লে, এখুনি প্রাচীন উড়িয়া গোপীভাষা, 'কেশব কোইলী' থেকে কম্‌সে কম্ পঞ্চাশখানেক ভণিতা গেয়ে দিতে পারেন।"

"তবে ওড়িয়া বাংলা মিশিয়ে বল্‌ছেন কেন?"

"ও দু'টোই এক। আব্, উর্দু আর তামিল যদি মিশাতে পারতাম, তা'ও হত এক। বুঝলে দাদা, হাঁদারাম, যার যেমন রুচি—সবই গোবিন্দের ইচ্ছে।"

"এরা সকলে পাগল" বলিদত্ত ভাবল।

অন্তু বলল "বহুক্ষণ Buttend করেছিস্ বন্ধু; এবার একটু পরিচয় করিয়ে দে।"

বাট্ এণ্ড ফের্ কি? বি-ইউ-টি বাট্ মানে কিন্তু, এণ্ড্ মানে ত'

শেষ, 'কিন্তু শেষ, কিন্তু শেষ' বলিদত্তর ধাঁধা লাগল। কিন্তু ভাববার অবকাশ না দিয়ে বনু উঠে দাঁড়াল, বলল—"আমার দোষ হ'য়েছে, সাতকাণ্ড রামায়ণ হ'য়ে গেছে, বল্‌তে পারি নি হু ইজ হু। ইনি—বলিদত্ত দাস (ভাই, শ্রী-টা বাদ দিলাম)—কোম্পানীর বিশিষ্ট কর্মচারী, আজ পদোন্নতি হয়েছে এঁর।"

"আর ইনি? ইনি শ্রী অনন্ত কুলকর্নি চৌপট্, মানে শ্রী অনন্ত কুলকরণ চউপট্ নায়েক, বিখ্যাত কবি, প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ, জনপ্রিয় ছায়াচিত্র প্রযোজক বোম্বের—প্রথম চিত্র "অনন্তশয্যা", আবার বিখ্যাত সমালোচক, আর দাঁড়া, বাধা দিস্ নি, কুখ্যাত 'হযবরল' গাঁয়ের জমিদার এবং ব্যারিষ্টার-ইন-ল, লিঙ্কন্‌স্ ইন, বি. এ. (হনস্)—"

"এঁ্যা"। বলিদত্তর ছোট হাঁ আর বোঁজে না।

"এবং এ হচ্ছে শ্রীমান্ অশোক মেহটা, এম. কম্. সতেরো পুরুষ উড়িষ্যার বাসিন্দা, কবি মাধব মেহটার নাতি, নিজে 'মেহটা এ্যাণ্ড্ মেহটা' লিমিটেড্, কন্ট্রাক্টরস্; বিশিষ্ট মাসিক পত্র 'ক্ষণজন্মা'র সম্পাদক এবং লেখক উচ্চস্তরের।"

"ও—"

অন্ত বলল "এবং ইনি হচ্ছেন শ্রী বনবিহারী পট্টনাএক এম. আর. ভি. এস্, লিজিয়ন ডি অনর, ফেডারেল ইনভেষ্টিগেশন ব্যুরো, বিখ্যাত গোয়েন্দা সেক্সটন ব্লেকের সহকারী অর্থাৎ সেক্রেটারী।"

সবাই হো হো করে হাস্‌ল, বোকা বনল বলিদত্ত। দুই অপরিচিত ভদ্রলোকের পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হ'তে না হ'তে পরিচয়টা হাসিতে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে—তবে এসব সত্যি না মিথ্যা?

এরা কারা? নিশাচর জীব? বলিদত্তর মনে পড়ে, কোথায় সে এদের দেখেছে। এই, যাকে বনু বলল অনন্ত কুলকর্নি—কোন্ এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছিল এই রকম একটি লোক, এমনি হাড় বের করা মুখ, চৌকো থুঁত্‌নি, কোটরে ঢোকা শান-দেওয়া চোখ, দাম্ভিক কপাল, সেই কপালে বিছিয়ে পড়েছিল গোছা গোছা অগোছালো চুল। তা'র গলায় ছিল ফুলের মালা, ভাষায় ছিল আসন্ন কোন্ স্বর্ণযুগের ছবি, লোকের ভীড়ের ভিতর থেকে উঠছিল ঘন ঘন হাততালির শব্দ। তিনিই কি এ? যে লোককে মাতাচ্ছিল, কাঁদাচ্ছিল, হাসাচ্ছিল, তাতাচ্ছিল কথার মেঘগর্জনে?

তারপর আর একদিন কবে খবরের কাগজে বড় ছবি এম্‌নি একটি লোকের; তার মুখের ডৌল খাঁড়ার মত, এমনি অতল চোখ; কিন্তু

তা'কে দেখাচ্ছিল রুগ্ন—খবরের কাগজ জানিয়েছিল যেন কোন নিরুত্তাপ, তেপান্তর, ঘন বনদেশে আলো জ্বালালো এই লোকটি, দাসত্বের শেকল ছিঁড়তে বজ্রনাদ করেছিল এ, জাতি হয়েছিল উদ্বুদ্ধ; তারপর স্বেচ্ছাচারীর রোষের আগুন নেমে এল তা'র ওপর—কিন্তু তা' শুধু চামড়ায় ছেঁকা দিল, পোড়াতে পারলে না। হাতে পায়ে শিকল বেড়ি, কোড়ার মার, মলদ্বারে বাঁশের খোঁচা, তেষ্টা পেলে মুখে প্রস্রাব, পিঠে লোহা পুড়িয়ে দাগা দেওয়া, নাকে লংকা পোড়া ধোঁয়া, হাতের পাতায় ফণীমনসার কাঁটা—ওঃ, সারাদেশ ঘৃণায় শিউরে উঠেছিল, রাগে জ্বলে উঠেছিল, সামান্য সাফল্যের পূজারী বলিদত্ত দাসও নির্জন ঘরে খুদে মুঠি পাকিয়ে উঁচিয়েছিল অদেখা শত্রুর মুখে। খবর কাগজ জানিয়েছিল—এই সে লোক, এত নির্যাতনেও অন্ধকারের প্রতি আহ্বান ছুঁড়ে দিয়েছিল—

"বন্দীর নিশ্চিত মুক্তি, দলিতের জয়
চল ঝঞ্ঝার নাদে গেয়ে মুক্তির বাণী
জড়তার শিরে বজ্রহাতুড়ি হানি,
আর্ত জগতে ঢেলে সঞ্জীবনী
আগে চল, দলে চল, পিষে চল..."

দেহে পীড়া, মলদ্বারে বাঁশ, মুখে প্রস্রাব, তবুও গাইতে পেরেছিল বিজয় শোভাযাত্রার গান। খবরের কাগজে এইসব বেরিয়েছিল। এই কি সে?

সাদৃশ্য আছে বই কি, কিন্তু বলিদত্তর বিশ্বাস হয় না। সে ছিল না "অনন্তশয্যা" চলচ্চিত্রের প্রযোজক, নতুবা—সেই রকম চেহারা। তবে কি এ সেই প্রাণশক্তির সাময়িক অনন্তশয্যা? বলা যায় না!

আর এই যা'র নাম বলা হোল অশোক মেহ্‌টা? রাস্তায় কতবার একে সাইকেল চড়ে যেতে দেখেছে সে, এই রকম একটি লোককে। বিকেল গড়িয়ে যখন সন্ধ্যা হয় হয়, সাহিত্যিকদের সঙ্গে, কোথায় যেন কবে ঘুরতে দেখেছে একে সে। খালি সাহিত্যের আলোচনা, শানানো যুক্তি, কথার ফাঁকে দেখা যায় ভিতরের মার্জিত মন। সভার ভীড়ে, বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়েছে এই রকম একজন, পণ্ডিতী ভাষায়, অবোধ্য দর্শন-শাস্ত্র মিশিয়ে মেলেছে উচ্ছ্বাসের পাপড়ি, স্বপ্নিল, ঢল ঢল চোখে। এই রকমই সে, কিন্তু সে ত' ছিল না কণ্ট্রাক্টর!

পরিচয়—পরিচয়—

পিঠে ঠোঁট উল্টে চেপে দলা পাকিয়ে বসে থাকা পাখী ত' একগাদা পালকের স্তূপ মাত্র, তা'র সঙ্গে উড়ন্ত পাখীর ফারাক্ আসমান-জমিন, এ নয় ওর পরিচয়। জ্যান্ত মানুষের পরিচয় কখনই হ'তে পারে না থস্‌থসে, কালো কাদাটে মড়া যা হাত দিলে মনে হয় কাদা চট্‌কানোর মত। ইস্! এক থাব্‌ড়া কাদা—ঐ মড়া—

কিসের পরিচয় কি! ইস্!

বাইরে অন্ধকার রাত, মাথায় ঘুরছে নন্দর সেই শেষ গান—'শূন্য মন্দিরে বিহার'—ভিতরে চুপচাপ বসে আছে একটির পর একটি লোক, বনুর এ পাগলা মজ্লিস প্রক্ষোভ জন্মায়। মনে হচ্ছে মড়ার কথা আর সারা দেহ যেন ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে; বলিদত্ত পালাতে চায়।

সন্টুদা বলতে শুরু করেছেন, মন্দিরের গর্ভগৃহে যেন কে কথা বল্‌ছে, কথাগুলো নিজের উদ্দেশ্যেই বলা—

"শুনলে ত' পরিচয়? এ থেকে কি বুঝলে বল? একজন লিঙ্কনস্ ইন্, আর একজন কণ্ট্রাক্টরস্, আরও একজন ফেডারাল ইনভেষ্টি-গেশন। আর আমার পরিচয়টা এখন বোধ হয় তিব্বতী লামা। হোয়াট ইন এ নেম্?

"নিজে তুমি বলিদত্ত, নিজের পরিচয়টা ত' ঠিক্ কর, যদিও এই জন্যই মুনি ঋষি কল্পকল্পান্ত কাটিয়ে দেয়, তবুও ওর নাগাল ও'রা পায় না।

"পরিচয়টাই বা কি? না, লোকে আমাকে যে নামে ডাকে, আমার সম্বন্ধে যা ভাবে; সেটা একটা লেবেল্ ছাড়া ত' আর কিছু নয়। লেবেল্‌টা বদলে দাও, জিনিষটার উপাদান কি তা'তে একটুও বদলাবে? ওপরের লেবেল্ ভিতরের জিনিষটাকে ঠিক্ ভাবে বর্ণনা করে—একথা বলা একদম ভুল। তবুও দেখ, এই লেবেল কুড়িয়ে ঘুরছে যত রামখোকা, তার জন্য কত কাটাকাটি, মারামারি—চায়ের লেবেল কুড়োলে প্রাইজ মেলে, নামের লেবেলে অশান্তি।

"বাপধন, নিজের মনকে জিজ্ঞেস্ করো আগে, নিজের প্রয়োজন কি? নিজের হিতই বা কি? কি তুমি সত্যিই চাও? জীবনের চিরন্তন মূল্যবোধগুলো কি কি? তা' নয়, শুধু লেবেল্। নিজের প্রয়োজন, নিজের অভাব, নিজের ইচ্ছা—সব কিছুরই জন্য মা'র পেট থেকে জন্মাতে না জন্মাতে তোমার সামনে ধরা আছে এক একটা লেবেল; তা'রই জন্য লড়ে লড়ে তোমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে

পেটেন্ট মেডিসিনের বিজ্ঞাপনের মত পেটেন্ট আইডিয়াজের দৌরাত্ম্য। ছেয়ে গেছে দুনিয়া সারা। সেইজন্য যত চেষ্টাই কর না কেন, পৃথিবী সভ্য হচ্ছে না আর সংসার থেকেও বিদেয় হচ্ছে না যুদ্ধ, অশান্তি।"

"যদি এতটা না পারো, বাবা, ধরো তবে অটোসাজেশনের রাস্তা— মানে লেবেল্ বদলাও। ধন সঞ্চয়ে ব্যর্থ—ভাব, ঐ যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, গোটাটাই তোমার, তা'র নীচে তোমার সোনার খনি আছে। ব্যাংকে যা'র গচ্ছিত অনর্জিত পুঁজি আছে, সে যে তা' থেকে ড্র করে খেতে থাকবে তা'র কিছু মানে নেই ; শুধু দেখতেও ত' সুখ। তেমনি তোমার পাহাড়। ভাব—পৃথিবীটা তোমার, আর দুঃখ নেই। এই, বনুর খাটটা আমার, না রে বনু?—এই আমি শু'লাম, বালিশটা মাথার নীচে দে ত' বাবা, আঃ—"

অন্তু ও অশোক আগের মতই চুপচাপ বসে।

বলিদত্তর মাথাটা গোলমাল হয়ে গেল, যেন সে নন্দর পিছু পিছু যেতে চায়। ঘড়িতে বাজল দশটা ; রাত দশটা—তবুও তা'র চেতনায় চম্‌কালো কথাটা, ধক্ করে মনে পড়ল, বড়বাবুকে বলেছিল, রাতে ওঁর বাসায় যাবে সে।

যাঃ—এক্‌টা রাত বৃথায় গেল।

বনুর বাসা থেকে বেরিয়ে মোড় ঘোরা পর্যন্ত সেই ধারণাগুলো পিছু পিছু এল। মোড় ঘুরতেই পথ প্রশস্ত, বড় রাস্তা। দোকান বাজার, বড় বড় বাড়ী, গাড়ী ও ভীড়—আলোর ঝল্‌কানি। চৌমাথায় সে খানিক দাঁড়াল, সজোরে ছিঁড়তে লাগল সে পিছনের মায়াবাদের জাল ; মনে জোর পাওয়ার জন্য মহাপাত্রের ভঙ্গীতে বলে উঠল—

"ইডিয়ট্, পাগল, পাগল—"

তারপর জোর কদমে হাঁটা শুরু করল্।

□

সরোজিনী দোরে খিল দিল। সঙ্গে সঙ্গে কিছু যেন ঘটল—চেতন মন ও অচেতন, অন্যায় ও প্রভাব প্রতিক্রিয়াময় বাইরের মনোজগতের কপাট ; এবার তা'র চেতন মন নির্জন, নিঃসঙ্গ। সে মুখোশ খুল্‌তে

পারে, সম্পূর্ণ খুলে ফেলে দূরে রেখে খেল্‌তে পারে নিজের সঙ্গে। আশ্চর্য তা'র মনের কারবার, এক একটা গতানুগতিক কাজঃ—দোরে খিল লাগানো, দেওয়ালে ঘা খেয়ে, চৌকাঠে হোঁচট লাগিয়ে অর্ধ-চেতন ভাবে দেহকে নিপীড়ন করা, উনুনের মুখে সরু একটা কাঠ গুঁজে দিয়ে, তা' জ্বলে জ্বলে ছাই হওয়া পর্যন্ত। উদাস চোখে, গালে হাত দিয়ে সেদিকে চেয়ে থাকা—এ সবে যেন ভিতরের মনের আটকে রাখা কোন ধারণা স-সংকোচে—প্রত্যয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে; বাইরের সাধারণ কাজটি হ'য়ে ওঠে রূপক। তার মন অশান্ত, ইচ্ছা তা'তে চড়ে বেড়ায়।

দোরে খিল, ঘরে কেউ নেই; সে একা।

কিছু না ভেবে সে করে গেল রোজকার সাধারণ কাজ। আলো জ্বালাল, ঘর ঝাঁট্ দিল, জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখল, তরকারী কুটতে কুটতে উনুনের সামনে বসে আগুনে ফুঁ দিল। ধিকি ধিকি ওঠে উনুনের আঁচ; ভাত বসেছে, ডাল চড়েছে। চারিদিকে অন্ধকার।

ধীরে ধীরে সে মনের মধ্যে ফিরিয়ে আনল পুরনো কথা—বলিদত্ত বাড়ী ফিরেছে সবে, হঠাৎ কি একটা কথায় পায়ে হোঁচট খেল সে। অমনি গর্জে উঠ্‌ল, গালাগাল দিল। হোঁচটের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে গেছে সেই কথাটার অস্তিত্ব—মনগহনের আঁধারে ভূত তা', অশান্ত যুবতী মনের আকাঙ্ক্ষার রূপ। সে আকাঙ্ক্ষা মেটায় নি বলিদত্তর হাবভাব, তার প্যাণ্ট্ কোট্, তার প্রমোশনের বড়াই।

মাথায় ঝক্‌ঝকে সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে নোয়া—জগতের আশীর্বাদ "কাঁচের চুড়ি বজ্র হোক্", কাঁধে 'পতি পরম গুরু' ক্রচ—সরোজিনী অজানা দুঃখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

উনুন-ফোঁকার চোখের জল তপ্ত অশ্রুতে পরিণত হ'ল। সে মুহূর্তে নিজের জীবনের প্রতি ভারী ধিক্কার দিল; জীবনটা ধোঁয়া হ'য়ে পুড়ে যাচ্ছে—পুড়ে যাচ্ছে। এই উনুনের মধ্যে তার মনের তারে বাজছে শুধু—'হায়, হায়'।

কান্না পেলে চেতন মন তা'তে বাধা দেয়, বারণ করে—এক এক করে মনে পড়ে ইতিহাস :—ঠাকুর্দা মারা গেলেন, ঠাকুমা তা'কে কী আদরই না করতেন, কোলে চেপে না শুলে তাঁর ঘুমই আসত না; তিনিও গত। মেসো—থল্‌থলে পেটের ওপর শুইয়ে তা'কে দোলাতেন—আহা, তিনিই বা কোথায়? মৃত্যু, বিচ্ছেদ; তার ওপর আছে নিজের ক্ষত, ক্ষতি, অভাব অভিযোগ। নিজের প্রতি

"আহা", "চ্যা, চ্যা"—কী হীন জীবন! কী অসহায় আফসোস।

সংসার যন্ত্রণার নোনা সমুদ্র, তা'র যেখান থেকেই হোক এক আঁজলা তুলে মনের ওপর ঢেলে দিলে, চোখের পথে নিংড়ে পড়ে ঝরঝর নোনা জল।

সরোজিনী কাঁদছে—মনে পড়ে বাপের বাড়ী, তারপর এই দূর বিদেশ। সুখ নেই, সোহাগ নেই, খালি কলের মত কাজ। কত দূরে রইল সবাই? সঙ্গীসাথী নেই, জিনিষ পত্র হাতে এগিয়ে দেওয়ার, ঘরের কাজে সাহায্য করার কেউ নেই। কী জীবন! ক্রমে কান্না থেমে যায়। উদাস মন, অচঞ্চল, যেন ঝলসে গিয়ে চুপচাপ। ধীরে ধীরে তেতে উঠছে মনের কোণে কি যেন—বায়ু-ভুক্ সাপের মত তা'র মুখ থম্থমে, শোঁ শোঁ দীর্ঘশ্বাস, জ্বলজ্বলে চোখ—বঞ্চিত প্রবৃত্তি শিথিলতা খুঁজে অন্ধকারে সুড়ঙ্গ পথে গড়ছে নিজের রূপ। এমনি আসে তা' ক্ষণে অক্ষণে, ঝনঝন্ করে ওঠে মন। অস্থির হয়ে এদিক ওদিক লালসায় চক্কর খায়—দাওয়ায়, দেউড়িতে, বসবার ঘরের জানালার পথে অন্যমনস্ক ভাবে বাইরের দিকে।

কোথায় কে? রাস্তার ওপাশে জানালায় দেখা যায় কলেজ-ছাত্র বইয়ে নজর রেখে পেনসিলের মাথা দাঁতে কামড়ে কি যেন ভাবছে।

কি ভাবছে? মন ছলকে গেল সেদিকে। ঝপ্ করে জানালা বন্ধ করল সরোজিনী। মন আবার ক্লান্ত ডানা গুটিয়ে নিয়ে ফিরে এল নিজের আস্তানায়।

ততক্ষণে ভাত ফুটছে টগ্‌বগ্। গরম জলে অসংখ্য বুদ্বুদ—গব্‌গব্ গব্‌গব্—কী দাহ! কী শব্দ! কী বড় বড়! ফেটে গিয়ে কোথায় যে মিলিয়ে যায়। তবুও কোথাও ফাঁক্ থাকে না। কাছ ঘেঁষে এসে পাশাপাশি নাচে—অফুরান অগণন! যখনই দেখ—পূর্ণ; "পূর্ণাৎ পূর্ণমাদায় পূর্ণমেব বিশিষ্যতে"। রোজই দেখা বুদ্বুদের নাচ নিত্যই দেখায় নতুন চমক।

সরোজিনী ভাত রাঁধে। বিশেষ কিছু নয়—বাড়ীর বউটি বসে ভাত রাঁধছে, অতি সাধারণ দৃশ্য!

রাত ন'টা।

'উনি' ফিরছেন হয়ত। ওঁর প্রমোশন হয়েছে, অন্যপদ, বড় পদক্ষেপ। ছোট বাসা থেকে বড় বাড়ীতে পা বাড়ানো, কাছে মনে হচ্ছে। এরপর ধনসঞ্চয়। সরোজিনীর টাকা-পয়সা ভাল লাগে।

কেমন জীবন তা ? ধনী হলে কেমন লাগে ? ছেলেবেলা থেকে এ পর্যন্ত দেখা কথা, শোনা কথা মনে পড়ে। কাছের গাঁয়ে এক জায়গায় তা'র বিয়ের 'সম্বন্ধ' হয়েছিল—নাপতিনী বলত—'তাদের পাকাবাড়ী, ধানের গোলা, দাসীচাকর বাঁধা, সদরে লোক জনের যাতায়াত, যাত্রা নাচ তামাসা হয়, কলের গান বাজে—কিন্তু কুষ্ঠি মিলল না।

তবু তা' ছিল একটা বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন! তারপর—পথে-ঘাটে, কারুর বাড়ীতে বেড়াতে গেলে—পরনে দামী শাড়ী, পা থেকে মাথা পর্যন্ত গহনা,—কিন্তু না, সব বড়লোকেই বেশভূষা করে না, তাদের ধন আছে এইটুকু ধারণা করাতে পারলেই হোল। যানবাহন, কোঠাবাড়ী, ভূসম্পত্তি থাকাই যথেষ্ট নয়—কর্তৃত্ব ধনগত অধিকার, মনোগত ইচ্ছাপূরণ এবং লোকের চোখে খাতির। থাকলেই সব হ'ল না, "ওঁর আছে", বলে বেড়াবে দশজনে, তবেই তা 'ওর আছে আমার নেই', ''যাদের-কিছু-নেই'' এমন লোক না থাকলে, ''যাদের বেশ আছে'' এমন লোকের থাকা না থাকা সমান হোত।

মাসে দেড়শো'টি টাকা—কতই বা! কিন্তু বেড়ে যাবে হু হু করে; স্বামীর আশা ও উদ্যম তা'র আকার ও গড়নের সঙ্গে সমতুল নয়। অতএব সে ধনী হবে। কিন্তু এত ঐশ্বর্যে হবে কি। অর্থ কি দেহে দাগ কাটে ? চেহারা বদলায় ? মনে আনে মোহিনী মায়া ? সুতরাং, দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

লম্ফটা তুলে ধরে কড়াতে সাঁতলানো তরকারীর অবস্থা দেখতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাসে লম্ফ'র সলতে নিভে গেল। উনুন থেকে আগুন তুলে তা' আবার জ্বালো—সেই এক মিনিটে আবার ফিরে এলো মনের সেই পুরনো ব্যথা, টন্ টন্ করে উঠল মন। এ হ'ল সেই ব্যক্তিত্ব যা ভাবে সুখ নেই, শান্তি নেই। শান্তি ? সে ত' অবস্থা-নির্ভর, ভাগ্য-নির্ভর, সান্ত্বনা দিতে ঐশ্বর্যের হাত সেখানে পৌঁছয় না। মনে শান্তি না থাকলে, সারা দুনিয়ার জিনিষ ঘরে জড়ো করেও কি সুখলাভ সম্ভব ?

কিন্তু সুখ ? তা' গড়াও যায় খানিক্ খানিক্ অর্থ দিয়ে; অন্তত আসলের নকল ত' গড়া যায়। ঠিক্ আসলটি নয়; যেন একটার বদলে অন্যটা। প্রতি মুহূর্তে এই বিকল্প গ্রহণ করতে মন প্রস্তুত, মানে, সুখের বিকল্প! সুখের মত কিছু আর কি! সেটুকু অর্জনে

ধন স্বাধীনতা দেয়।

হয়ত সুখ আস্‌বে। "উনি" বলেন—"বেরোও না কেন? বাইরে বের হও, লেখাপড়া শেখ, বড়লোকের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাও, দেখ কি চট্‌পট্‌ আমাদের ভাগ্য শুধরে যায়; পাথর, তুমি পাথর।"

হয়ত ধন দেবে স্বাধীনতা, আর "উনি"ও খুশী হবেন।

সরোজিনী দেখ্‌ছে সাম্‌নে নতুন জীবন; তার কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম, নাক ফুটো, ফুল্‌ছে, নিঃশ্বাসে ঝড়, রক্তে দাহ! বুকে মাথা পুঁতে অন্যমনস্ক হ'য়ে সে দেখ্‌ছে সেই জীবন, সেই সুখ যা' তা'র চেতন মনের কাছেও ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, চুপচাপ্‌—কেবল অনুভূতি, খালি স্বপ্ন, তা'র রূপরেখা আঁকার জোর নেই মনের; কিন্তু তার তাপে শরীর মন বড় ব্যাকুল, বড় ব্যগ্র। অন্ধকার থেকে সেই তাপ ছুটে আস্‌ছে; নিজেকে সেইদিকে ঝুঁকিয়েছে সে, নিজেও বড় অস্পষ্ট, ছায়াবৃত।

কে ডাক্‌ছে না? "বেয়ারা—বেয়ারা—"

"কে?" ভাবনার পাট তুলে রেখে, তপ্ত সরোজিনী দোর খুলে বাইরে তাকাল।

মুখে লাগছে ঠাণ্ডা হাওয়া, বাইরে অন্ধকার, অন্ধকারে জ্বলছে সিগারেটের আগুন—"আমি, মহাপাত্র"।

দু'পা পিছিয়ে পড়ে দড়াম্‌ করে দুই কপাট চেপে বন্ধ করতেই শোনা গেল "উঃ, আমার পা, শুনুন্‌?"

সেরেছে! কপাটের ফাঁকে কখন যে মহাপাত্র পা সেঁধিয়ে দিয়েছিল; মাথা নুইয়ে এখন দু'হাতে সেই পায়ের জখম্‌ জায়গাটা চেপে ধরেছেন্‌—দু'চারবার উঃ, আঃ—

চারপেয়ে জন্তু যেন একটা। জন্তুর পা'য়ে চোট্‌। সরোজিনী কি করবে? কাকে ডাক্‌বে? কি উপায়?

ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা, শরীর কাঁপছে, বুক ধড়ফড়; ঠোঁট্‌ কামড়ে, দম্‌ বন্ধ করে সে তাঁর পায়ের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে।

কি যে হ'ল! মহাপাত্র, মহাপাত্র মশায় আহত।

মুখ তুলে তিনি বললেন "বলিদত্ত বাবু নেই নাকি?"

"না।"

"ও—তবে—"

চোখ দু'টো যেন জ্বলছে। গলার স্বর কাঁপা-কাঁপা। জোর চোট্‌ খেয়েছেন বোধ হয়। যাক্‌, তিনি উঠে দাঁড়ালেন শেষে, ঘরের

ভিতর গেলেন—এক পা, দু' পা—সরোজিনীর মুখ মাটির দিকে।

"তা আপনি বেশী ভাববেন না, আমারই দোষ, পা'টা ভিতরে রয়ে গিছল। বলিদত্তবাবু নেই তা' হলে ? খুব ঘুরে ঘুরে আসছি, তিনি থাকলে চা চাইতাম্ এক কাপ্ ; আজ আবার তাঁর প্রমোশন হয়েছে, না কি ? বাড়ী থাকলে কি আর চা এক কাপ খাওয়াতেন না ? এখন ত' তিনি অফিসার, আমাদের দোসর, ভাই, আর চিন্তা কি ?"

অন্ধকার ঘোর অন্ধকার। ঘরের ভিতরের মিট্ মিটে আলো —সেই অন্ধকারের ছিঁচ্‌কে হাসি। সরোজিনী মুখ পুঁতে তবু দাঁড়িয়ে। চায়ের কথায় মনে পড়ল কুলুঙ্গীতে আছে চায়ের সেট্। একটু গরম জল, টিনের দুধের দু' চামচ্, ক'চিমটি চা পাতা, একটু চিনি ; এই হ'ল—এক কাপ্ গরম জল—যার নাম চা।

'না' বলে দেবে সে ? 'উনি' থাকলে—উনি এসেইবা বলবেন কি ?

"এইটুকু তোমাকে দিয়ে হ'ল না ? মুখ ফুটে চা চাইলেন্—ছিঃ।"

কর্তব্যের খাতিরে চা সেট্ পাড়তে সে হাত বাড়াল ; কুলুঙ্গীর কাছে তিনি বসে। তাঁর চোখা চোখ ছুঁচ্ ফোটাচ্ছে চা সেট্ আনতে বাড়িয়ে দেওয়া সরোজিনীর লম্বা হাতে ; ইস্, হাতের চামড়ায় যেন ঠাণ্ডার পরশ—রোমাঞ্চ।

মহাপাত্র চেয়ে আছেন তার অনাবৃত বাহুর দিকে—তা' যেন পাম্প্ করা সোজা রবার্ টিউব ; না, সাপ ; না লতা ; না, সাদা ধপ্‌ধপে্ চামড়া—তা'র নীচে নারী মাংস, কাঁচা মাংস ; তা'র ছন্দে বিদ্যুৎ, বায়ুব্যোমের ব্যবধান ভিতরে তা খেলায় চুম্বকী তরঙ্গ। তা'ই কুড়িয়ে নিচ্ছেন মহাপাত্র। চা, দূর থেকে ভেসে আসে পেয়ালা-পিরিচের বিচ্ছন্দ খট্‌খটাং, সে শব্দে জন্মে ভিতরের তাপ্—চেনা গন্ধ, চেনা রং, চেনা ভাপ্—মিঠে হাতের স্নেহের পরশ, ঘরের উনুন, অতি ঘরোয়া পরিবেশ, অতি ঘনিষ্ঠ !

মুগ্ধ মহাপাত্র চেয়ে রয়েছেন। বিহ্বলা সরোজিনী চা'এর সেট্ পেড়ে নিচ্ছে অলস হাতে ; নিতে নিতে কেঁপে গেল হাত ; কাপ্ পেয়ালা খসে পড পড় ; সেগুলো ধরে ফেলতে আর একজন হাত বাড়াল—হাত ধরে ফেলল কে ? বিভ্রাট ! সারা গা কাঁপছে নারকোল্ পাতার মত ; পৃথিবীও কাঁপ্‌ছে যেন—কা'র ওপর ভার রাখ্‌ল সে ? ধরে ফেলল কে ? চোখ যেন বুঁজে আসে। চোখ খুলবার আগেই কালঘাম ছুটেছে—শরীর শিহর। কে যেন বলছে

"আস্তে—ফের্ হোঁচট্ খাবেন, ফের্ পড়ে যাবেন।"

কিছুই ভাঙ্গে নি, কিছু পড়ে যায় নি ; কাপ, কেট্লী নিয়ে একটু ঝুঁকে পড়ে সোজা অন্দরে ছুটল সে ; তাপ বাড়ছে, বেড়েই চলেছে —ওঃ, বেসামাল দাহ, মাথার মধ্যে ঝড় !

সোজা সে পৌঁছল রান্নাঘরে ; সেইখানে তার দুর্গ, তা'র আশ্রয়, তা'র অন্তরের নিভৃত সাথী, ভাবনার প্রতীক, জীবনের রূপকল্প, গৃহস্থালীর বেদী—অগ্নিদেবতা।

উনুনের আগুন জ্বলে যাচ্ছে।

বসে পড়ে নিজেকে সামলাতে সামলাতে বাইরের ঘর থেকে উৎকট উল্লাস শুনল, ব্যঙ্গমেশা—"আর একটু হ'লেই বলিদত্ত বাবুর এত শখের চা সেট্ মাটিতে পড়ে যেত—একদম গুঁড়ো গুঁড়ো—হেঁ। চিনে মাটির জিনিষ পড়লেই ভেঙ্গে ছত্রাকার ; আর জোড়া লাগে না, হেঁঃ হেঁঃ, হেঁঃ—".

সরোজিনী কান পেতে শোনে।

চিনেমাটি পড়লেই গুঁড়ো, পড়ছিল কি ? কেন এ রকম কথা ? কান লাল হয়ে যায়। গুম্ হয়ে চেয়ে থাকে চায়ের জলের পানে। যা হ'য়ে গেছে তা গেছে, মন থেকে তা ঝেড়ে ফেলে সহজ হবার চেষ্টা করে। মাথায় যেন তুফানের দাপাদাপি।

তারপর—ভাবতেও ভয় লাগে। শুধু অপেক্ষা—যেন একযুগ। হঠাৎ বাইরের ঘরে গলা শোনা গেল—"আরে, বলিদত্ত বাবু যে, কোথায় গিছলেন ? আমি আপনার জন্যে বসে।"

"স্যার, নমস্কার। নমস্কার স্যার ; কতক্ষণ এসেছেন স্যার ? পান —"

"আমার জন্য ভাববেন না, চা আসছে। ভারী সম্বর্ধনা ; আপনার প্রমোশন হয়েছে—"

"স্যার, সে ত' আপনার দয়া—"

"কিছু না, কিছু না, এ ত' সবে আরম্ভ, আরও কত বাকী, আপনিই একদিন এ কোম্পানীর বড় সায়েব হয়ে বসবেন, ব্যবসা চালাবেন। হেইল্ ম্যাক্‌বেথ্, হেইল কডর, হেইল্ গ্লামিস্, দি গ্রেটেষ্ট ইজ্ ইয়েট্ টু কাম—হাঃ হাঃ হাঃ—"

"সবই আপনার দয়া স্যার, নইলে আমার আর কে আছে ?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমি সায়েবকে বল্লাম যে, বলিদত্ত দাসকেই দাও। এমন কাজের লোক আর কে আছে ? থাক্, সে কথা পরে হবে। আপনি আগে অন্দর ঘুরে আসুন।"

"স্যার, মা'র একটা দাঁতে নাকি ব্যথা, শুনলাম।"

"দাঁত? আমি ত' জানি না।"

"হ্যাঁ, দাঁত একটা ব্যথা করছিল, আর্দালীকে জিজ্ঞেস্ করে জানলাম্, ডাক্তারবাবুকে বলে দিয়েছি।"

"তবে ডাক্তার নিশ্চয় গেছে। ওঁর পাইওরিয়া কিনা, থেকে থেকে দাঁতের কষ্ট হয় অমন। বাঃ, আপনি অনেক খবর রাখেন, দেখছি। আচ্ছা, বলিদত্ত বাবু, আপনি ত' এমনি করে অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে থাকেন; এদিকে বাসায় একলা, বড় হয়রান হ'ন নিশ্চয়। আমি বলি কি, একটা ছোটখাট চাকর রাখুন। আচ্ছা, আসুন আপনি ভেতর থেকে—"

সাফল্যকামী বলিদত্তর বুক্ উপ্‌চে আনন্দ উথলাচ্ছে। হাসিমুখে দুম্ দুম্ করে পা ফেলে সে ঢুক্‌ল ভিতরের বারান্দায়। সরোজিনী কান পেতে ছিল, তা'রও হাসিমুখ, যেন মূর্তিমতী মমতা! চট্‌পট্ হাতে জুতোর ফিতে খুলে, কোট্ খুলে নিল।

ফিস্‌ফিস্ করে বলল "ওগো, এমন বিতিকিচ্ছি ব্যাপার; তুমি ছিলে না; কে ডাকছে, শুনে দোর খুলে দিয়ে চমকে গেলাম, দেখলাম এক মিন্‌সে। আমি ত' মরে গেলাম। বল্‌লেন—'আমি মহাপাত্র।' তোমার নাম করে বল্‌লেন 'নেই না কি? আচ্ছা,— আমি বস্‌ছি, একটু চা পাঠিয়ে দিন।' মুখ খুলে নিজে চাইছেন চা। মনে মনে বল্‌লাম—'বেশ, বিদুরের কুঁড়েয় শাক ভাত।' চা বসালাম, ভাবছি কে গিয়ে দিয়ে আসবে, ভাগ্যে তুমি এলে, না হলে গা ঢাকা দিয়ে চৌকাঠের কাছে মাটিতে রেখে আসতাম। ছিঃ, কি ভাবতেন উনি?"

"কেন, ভিতরে গিয়ে টেবিলের ওপর রেখে এলে কি পাপ হ'ত? এ ত' তোমার বোকামি। জানো, কত বড় লোক উনি? ওঁর কলমে আমার দানাপানি বাড়্‌ছে। আর উনি চা চাইলেন্! ওঃ, এমন সরল, এমন দিলখোলা লোক উনি! সবসময় ওঁর বড় দয়া, বড় দয়া! খালি চা দেবে, না, কিছু একটা করে দাও, এই ধরো, মোহনভোগ একটু?"

"কি, বিশ্রম্ভালাপে মগ্ন না কি বলিদত্ত বাবু? ধ্যাত, এত রাতেও লোকে বেড়াতে আসে? থাক্, ডোণ্ট মাইণ্ড মি, আমি চলি, বলিদত্ত বাবু—"

"স্যার, স্যার, একটু'খন, আর একটু—"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি না।"

খানিক্ পরে দরজার সামনে এসে সরোজিনী পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল, হাতে চা ও মোহনভোগ। তার শরীরের একফালি দেখা যাচ্ছে—সেই ফালিতে ভোজনের নৈবেদ্য।

বলিদত্ত তা' বয়ে আনল।

"তা হ'লে বাড়ীতে আজ রাতের খাওয়া বন্ধ কর্‌লেন আপনি!" মহাপাত্র চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন "এ কি? এ ত' ভেলকি, ব্ল্যাক্ ম্যাজিক।

ঈষদুষ্ণ গরম মোহনভোগের ওপর চারটি আঙ্গুলের ছাপ বেশ জ্বলজ্বলে। মহাপাত্র তাকিয়ে দেখেই বললেন "এই দেখুন, যত্ন করে কতখানি চাপিয়েছেন। আপনার স্ত্রীর আঙ্গুলগুলি মনে হচ্ছে খুব ছোট—তা দিয়ে এত কাজ—"

মহাপাত্র হেসে ফেল্‌লেন। বলিদত্ত বেকুবের মত হাস্‌ছে। নেপথ্যে শোনা যাচ্ছে খিঁক খিঁক হাসি, সরোজিনী জানিয়ে দিচ্ছে—সেও হাস্‌ছে।

"কী সুন্দর মোহনভোগ! বাস্তবিক, আপনার স্ত্রী একটি রত্ন—আমার হিংসে হচ্ছে—হিঃ হিঃ হিঃ—।"

□

সকালেই বেড়ার কাছে রামবাবুর স্ত্রী।

"তোমার তো এখন ঝকঝকে পৌষ মাস। পোয়া বারো।"

"এঁ্যা?"

"না, বল্‌ছি—তোমার খুব পয়মন্ত সময়।"

"কি?"

"এঁ্যা, আমাদের কাছে লুকোচ্ছ? বড় হলে; বড় বড় লোক সব আস্‌ছে। এ গরীবদের আর পুছবে কেন, বোন। বেশ, এই চোখ কত কি দেখেছে, আরও কত দেখতে বাকী! ঠাকুর করুন বাড়-বাড়ন্ত হোক্, সুখে থাক। ভাল রে ভাল—এ কি কর্‌ছ? কচি পেঁপেগুলো পিটিয়ে নামাচ্ছ, গাছে থাকলে পাকত না?"

"নাও দু'টো, তরকারী করবে।"

"বয়ে গেছে। ওলো, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, পাকবে।"

"আর কি হবে দিদি, আমরা ত' চল্‌লাম।"

"এতক্ষণে বুঝলাম ; নেবু গাছে এত ফুল, কুঁড়ি বোঝাই হয়েছিল, এখন দেখি গাছটা ন্যাড়া। ঝাড়িয়ে দিলি না কি, লো ? তোমরা না হয় না খেতে ; আর কেউ ত' খেত। একগাড়ী নেবু হত লো। এখন নেবুর কি দাম! পয়সায় একটা। থাক না, থাক না, পেঁপেগুলো পাড়িস্ না।"

"তোমার গায়ে লাগছে বুঝি, দিদি ?" পেঁপে গাছে আরও বাড়ি মেরে বলল সরোজিনী।

"না ত।"

"তা হলে তুমি বাড়ী যাও।"

"বাড়ী নয়ত কি বাইরে আছি না কি, যে বল্‌ছিস। সবই দেখছি, তবু চোখ বুঁজে আছি। আর এসব কেন ? আচ্ছা লো, যাচ্ছি ; রোয়া গাছ কাট্‌তে নেই।"

রামবাবুর স্ত্রী গেলেন অবশেষে।

সরোজিনী তখন সত্যি সত্যি গাছটা ওপ্‌ড়ানোয় মন দিল।

পুরনো বাসা ছাড়তে হ'বে। আপনার দখল, অধিকার, কিছু বল্‌তে কিছুই সে ফেলে যাবে না এখানে, খড়কুটোও না!

কিন্তু মানুষ তা'র অনেক জিনিষই পিছনে ফেলে যায়। ফেলে যেতে একটুও ইচ্ছা না থাকুক্, তবু। এই কথাটা উপলব্ধি করল সরোজিনী, বলিদত্ত উভয়েই, যখন গাড়ী এসে দাঁড়াল, জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা শেষ, পুরনো বাসা ছেড়ে যেতে হ'বেই হবে।

অন্য বাসাই নয় ; কোম্পানীর হুকুম—স্থানান্তর। কারণ, বলিদত্তর পদোন্নতি হয়েছে। কোম্পানীর বিবেচনায় সে আরও বড় দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে সমর্থ ; সুতরাং তা'কে যেতে হবে দূরে, অন্যত্র। আশায় উৎফুল্ল সে : মাইনে বেড়েছে। আসন্ন ক্ষমতা জারী করার সুযোগ ও পরিসর। ওই দূরে দেখা যায় নিজের ভবিষ্যৎ ; সেও সিঁড়ি, ওপরে চড়া যাবে। হাঁকডাক দৌড়ঝাঁপ করে সে যাবার আয়োজন ষোল আনা শেষ করেছে, গাড়ীতে মাল ওঠাতে ওঠাতে খুব চিৎকার করেছে—"চল্ চল্"। কিন্তু শেষ মুহূর্তে অল্পের জন্য মিইয়ে পড়ছে অন্যমনস্ক হয়ে এবং এখন তা'র মধ্যে প্রকট হয়েছে মানুষের চরম দুর্বলতা। সে এগিয়েও পিছনে চায় ; কারণ, পিছনে রয়ে যায় নিজেরই কিছু অংশ—কিছু সত্তা, তা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া চলে না।

কারণ, আকাশের সূর্য বা টেবিলের লণ্ঠনই শুধু তেজ বিতরণ

করে না। মানুষও সময়ে সময়ে নিজের তেজ বিকিরণ করে, স্থানের ওপর বিছিয়ে দেয় নিজের তাপ, অনুভূতি নেয় ও অনুভূতি দেয়, স্পর্শের স্মরণে—দিতে দিতে একদিন সে ঠাণ্ডা হিম হয়ে যায়, হয়ে যায় অন্ধকার ; কিন্তু সে পরিণতি এক মূহূর্তে আসে না। তা'র ক্রম আছে—জন্ম থেকে মরণ অবধি। তা'রই কিছু আধার ছিল এই বাসা। এখানে সে নিজস্ব কিছু ফেলে যাচ্ছে।

এতদিন সকালে উঠলে—এই ছিল দৃশ্য। বাড়ী বলতে মনে এরই ছবি ভাসত। ঘরের মধ্যে বসে আকাশের কথা উঠলে বুঝত সেই চিত্র যা এখান থেকে দেখা যায়, এই পটভূমির ওপর আকাশ। দাঁত মেজেছে এইখানে, স্নান করেছে ও-ই খানে, রোজ প্রত্যহ ক—ত দিন। দেহের ক্রিয়া, মনের ক্রিয়াকলাপের জন্য নিজের ব্যক্তিত্বকে আবৃত করে মাপসৈ খোলসের মত ছিল এই বাসা এতদিন—এই পরিবেশ যা তা'র সঙ্গে লেনদেনের সম্বন্ধ সূত্রে নিজস্ব। একেই আজ ছাড়তে হবে।

কোম্পানীর চাকরীতে কত বাসা, কত দেশ দেখতে হবে! গঙ্গা-তীরে পিতার চিতাভস্ম, গোদাবরীতীরে মাতার অস্থি, বিন্ধ্যাচলের সানুতে কা'র ভাড়াটে বাড়ীর অঙ্গনে নিজের বিবাহ-বেদী, সমুদ্রের ধারে আপনার সমাধি! চাকুরে উড়ন্ত বিহঙ্গ ; কিন্তু সে ওড়ে কোম্পানীর হুকুমে, পথে পথিক পথ চলে, বাসা বসে থাকে স্থাণুর মত। ক্ষতি কি?

পিছনের চিন্তার মাকড়সাজাল ছিঁড়ে ফেলে বলিদত্ত চিৎকার করল—"চল, চল, দেরী হচ্ছে যে।"

সরোজিনী মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কা'র উদ্দেশে প্রণাম জানাচ্ছে যাত্রার আগে। যাওয়ার জন্য সে সেজেছে, রঙীন শাড়ী, চিক চিকে সিঁথি, জ্বলজ্বলে সিঁদুরের দাগ, স্নো-ঘষা মুখ, পায়ে আলতা।

এই তা'র স্ত্রী।

যাওয়ার সময় মোলায়েম ভাবে সে দৃশ্যও বলিদত্ত গ্রহণ করল, তা থেকে উৎসাহ পেল। "চল, চল" বলতে বলতে শেষবারের মত ঘুরে এলো বাসার চারিদিক—কিছু ফেলে যায়নি ত'? না, কিছুই ফেলে নি। বাজে কাগজ, ছেঁড়া নেকড়া, ঝড়তি পড়তি, ছেঁড়া জুতো, ভাঙা খ্যাংরা—ইত্যাদি যাবতীয় বস্তু বাঁধাছাঁদা করে সে গাড়ীতে তুলেছে। যেখানে বাগান ছিল সেখানে গাদা করা আছে শুধু শুকনো ডালপালা, ডাঁটালতা, বাসার সামনে বোঝাই নোংরা,

জঞ্জাল।

খিড়কি দরজা দিয়ে উঁকি মেরে অপেক্ষায় আছে মেথরানী—যদি কিছু পড়ে থাকে ত' নিয়ে যাবে। উইখাওয়া দেবদারু কাঠের পিপের তক্তা তিন ফালা সদরে, কানাভাঙা বড় একটা মাটির হাঁড়ি, কঞ্চি চার খানা—ব্যস্। সেইদিকে হাত দেখিয়ে মনের ঔদার্যে বলিদত্ত বলল "নিয়ে যা; খিড়কির কাছে পাবি পাটি—জ্বালাতে পারিস্।"

ফিরে গেল সে সদর দরজায়। সরোজিনীকে ঘিরে পাড়ার মেয়েদের বিদায়ের পালা চল্‌ছে। "যাচ্ছ দিদি?" "যাচ্ছিস্, লো?" "নিন্দে বান্দা করবি না ত'?" "চিঠি দিও, কেমন?" কতক বন্ধু শুধু "নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।"

হঠাৎ এই বিদায়ের বেলা মনে হচ্ছে 'সত্যি এরা কত বাস্তব ছিল।' আর দেখা হবে কি না, কে জানে।

পাঁচ বছরের পুরনো এই দৃশ্য। পড়ে ফেলা উপন্যাসের মত আর তা'র দিকে চোখ পড়বে না; উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মতই এদের ও এদের সম্পর্কিত বিশিষ্ট ঘটনাও সে ভুলে যাবে। হাসিঠাট্টা, রাগারাগি, চোরাগোপ্তা বদনাম, কুৎসা, কবেকার স্নেহ ভালবাসার রেশ। একদিন এরা ছিল যেন আলমারিতে গোছানো জিনিস—ঘর-কন্না। সে সবই ভুলে যাবে—ভুলবে এদের নাম, গাঁয়ের নাম। ঘুরে ঘুরে বছর দশেক পরে পথে দেখা হ'লে দ্বিধা জাগবে।

চেনা দৃশ্য পর হ'য়ে যাবে।

"যাচ্ছি আজ্ঞে, নমস্কার।"

গরুর গাড়ী ক্যাঁচ্ কোঁচ্ করে চল্‌তে শুরু করল; বলিদত্ত গরুর গাড়ীই আনিয়েছে—সে বাজে খরচের বিরোধী।

সরোজিনী বাইরে তাকিয়ে আছে। ওই, দেখছে কলেজছাত্র। দূর আকাশে ঘুড়ি ওড়া দেখার মত তার ফাঁকা দৃষ্টি—চোখে ভাষা নেই। সরোজিনী দূর থেকে তা'র মুখোমুখি চেয়ে হেসে ফেলল; কিন্তু তবুও ছোকরার অর্থহীন দৃষ্টি, চেতনাহীন।

ঘুড়ি ওড়ে, ঘুড়ি নামে, ঘুড়িতে ঘুড়িতে কাটাকাটি—ঘুড়ি হয় ভোঃ কাট্টা—তবুও ঘুড়ি ওড়ে—ওড়ার বিরাম নেই।

আর দেখা হবে না—সরোজিনী ভাবল।

সেই একই ভাবে, একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে শুধু বোকার মত দেখছে ছাত্রটি। দূরত্বের দরুন ছোট হয়ে আসছে তার মুখ, কী ছোট, ঝাপ্‌সা, দুর্বল; মনে হয় না যে সে ব্যায়াম করে, বাঁশী বাজায়,

ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে শেকসপীয়র থেকে আবৃত্তি করে। না, সে দুর্বল, সে গতি জানে না, ভাষা ভুলেছে।

কিন্তু কেন—

প্রায়-ভিজে চোখে দূরে তাকিয়ে সরোজিনীর খেয়াল হল—সে একটু আদর করে, দু'হাতে খুদে মুখটিকে তুলে ধরে অজস্র আদরে শক্তি জোগায় এই দুর্বলকে।

হাঁফাতে লাগল ফাঁপা বুক তার; হৃদয়ের প্রবণতার ভোঃ কাট্টা ঘুড়ি—গোঁত্তা খেতে খেতে ছিঁড়ে পড়ছে। অযথা গড়িয়ে পড়ল এক ফোঁটা চোখের জল। গাড়ী মোড় ঘুরল।

"ওই দেখ, মহাপাত্রের বাসা।"

সরোজিনী ঘাড় বেঁকিয়ে দেখল—কেউ নেই, তবুও মুখের ওপর ঘোম্‌টা টেনে দিল। মনে হল, মুখটা জ্বল্‌ছে, সেখানেও কেটে গেছে ঘুড়ির সুতো—শুধু দীর্ঘশ্বাস সার!

"আর এই দেখ আমাদের আপিস্‌! আমি কোথায় বস্‌তাম, জানো? আন্দাজ কর ত'? ঐ যেখানে কালো তক্তা টাঙ্গানো, তা'র পিছনে একটু—"

পায়রার খোপ্‌, ঠিক যেন পায়রার খোপ্‌।

ঝট্‌পট্‌ করছে সব মন্দিরের পায়রা।

"আবার কখনও যদি আসি, বস্‌ব ওই ওপাশের ঘরে, চিনে রাখ।"

সরোজিনী শুনেও শুন্‌ছে না। তের্‌ছা চাইছে। কোম্পানীর আপিস জমজমাট্‌—মনে পড়ে চবুতরে পায়রার ঝাঁক—বক্ বকুম্, বক্ বকুম্ কর্‌ছে ত' কর্‌ছেই। গাড়ীটা ক্যাঁচ্ কোঁচ্ করে চ'লছে—এক একবার মনে হয় তার ক্যাঁচ্ কোঁচ্ যেন মানুষের কান্না—সাক্ষাৎ মানুষের মুখে আপত্তি, অভিযোগ ও বিলাপের ধ্বনি, টল্‌তে টল্‌তে পড়ে গিয়ে, ঘষ্‌টাতে ঘষ্‌টাতে এগোনোর সময় কান্নার মত; তবুও, না চাইলেও চল্‌তে হবে। পথ কত দূর, ক—ত র ?

□

নতুন জায়গা। সূর্য উঠছে।

ট্রেন্ থেকে নেমে ষ্টেশানের বাইরে যেতে, দেখা হল এক আধ্-

বুড়োর সঙ্গে—সে দাঁড়িয়েছিল গেটের কাছেই—ঢ্যাঙ্গা, মাথায় অর্ধেক টাক, পাগড়ী বাঁধতে ব্যস্ত। ত্রস্তে নমস্কার করে বলল "প্রণাম মা, প্রণাম হুজুর, আমি হুজুরের চাপ্‌রাশী, গাড়ী এনেছি।" বলিদত্ত টান্ টান্ হয়ে খাড়া—গম্ভীরভাবে দু'বার ঝাঁকি দিয়ে দেখল তা'কে। সরোজিনী শুধু হেসে জিজ্ঞেস করল "তোমার নাম ?"

"আজ্ঞে, আমার নাম নিতা।"

তা'র সফেদ্ প্যাণ্ট্, কোঁচ্‌কানো ও ময়লা সাদা কোট, তা'র ওপর চওড়া চাপরাশ্, তা'তে পিতলের চাক্‌তর ওপর কোম্পানীর নাম ঝক্‌ঝক্ কর্‌ছে। একবার বলিদত্তর মুখ; তারপর সরোজিনীর মুখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি ফেলে চাপ্‌রাশী বিহ্বলভাবে বলল "আমার বাপ মা নেই ; আপনারা আমার মা বাপ্, আপনাদের ভরসায় পড়ে থাক্‌ব।"

সরোজিনী আবার হাসল। তা'র জীবনে এই প্রথম কেউ তা'র কাছে আত্মসমর্পণ কর্‌ছে। অননুভূত মাতৃত্বে ভরে ওঠে তা'র মন, গৌরবে মুখ উজ্জ্বল। নজরে পড়ল—চাপরাশীর হাড় বের করা মুখ, পান্‌সে চোখ, পোড়া চক্‌চকে ঠোঁট, সাদা চুল, দুই গালের এখানে ওখানে দাড়ি। রুক্ষ মুখের একজায়গায় কি একটা লেগে আছে ; চাপরাশী ঘোরাফেরায় ব্যস্ত, অস্থির পায়ে। সরোজিনী তা'র সঙ্গে গল্প কর্‌তে চায় "নিতা, তুমি কোন্ জাত, তোমার বাড়ী ? ক'টি ছেলেপুলে ?" বলিদত্ত খানিক্‌টা দূরে সরে অধীরভাবে মাটিতে জুতো ঠুক্‌ছে, চিৎকার করছে "নিতা, অ্যায়্" ; তারপর খুব জোর দিয়ে "নিতা, আয় এখানে।"

"হুজুর !" নিতা সচিৎকারে দৌড়ল।

"তুই চাপরাশী ?"

"হ্যাঁ, হুজুর।"

"কবে থেকে চাকরী ?"

"কুড়ি বছর হ'ল হুজুর।"

"কু—ড়ি বছর", বলিদত্ত আটকে রাখা রাগ একেবারে ঢেলে দিল—"কুড়ি বছর ! অথচ তোর আক্কেল নেই রে, বুড়ো ! গাড়ী এল, চলেও গেল—তুই আরাম করে বাইরে দাঁড়িয়ে। ট্রেন্ থেকে নামিয়ে আন্‌তে এলি না ? জিনিষপত্র নামাতে এলি না, বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প লাগিয়েছিস্, গুলিখোর কাঁহাকা।"

এই ত' পয়লা দফা, মনে পড়ে, এমনি করেই কথা বলে ওরা, সেই যাদের মত হবে বলে বলিদত্ত স্বপ্ন দেখে—ইস্পাতে তৈরী

মানুষ।

এবং একটা লোককে সামনা সামনি গালমন্দ করার সময় সে যদি চুপ্ চাপ্ দাঁড়িয়ে থাকে, হাবেভাবে আহতের ক্ষত দেখায়, তবে গালমন্দ দিয়ে মুখের সুখ! জিভে গালাগালির খই ফোটে। মুখের সুখ ছেড়ে হাতের সুখ করতে ইচ্ছা যায়; এইসব পরখ করতে বলিদত্তর ভিতরের বড় লোকটা ঝাঁজিয়ে উঠেছিল, এমনি করেই লোক বড় হয়।

"যাচ্ছিস্ কি না? এ—ই? কাজ জানিস্ না—জান্‌তে হবে। সব ঢিলে ঢালা, না? এমন করে কোম্পানীর কাজ চলবে না—বলে দিলাম। কাজ বিগড়োলে কলমের এক খোঁচায় দানাপানির দফা রফা করে দেব, চিনিস্ নি আমাকে!"

নিতাই হন্তদন্ত। সারা দেহযন্ত্র তা'র কেঁপে উঠেছে। কিন্তু সে ত' বুড়ো হয়েছে, ভরসা করেছিল শেষ বয়সের একটা আশা। নাকের জলে চোখের জলে এখন। দানাপানিতে ব্যাঘাতের ভয়ে কাজ করতে তা'র অবয়ব তৎপর, কিন্তু দেহেমনে সমতাল কই? পা জোড়া দু'দিকে ছিট্‌কাচ্ছে, হাত দু'টো অন্য দু'ধারে। নানা ভঙ্গীতে ঝাঁকিয়ে এঁকে বেঁকে অতি দ্রুত চল্‌ছে সে, তা'র মুখ একটি গরুর গাড়ীর দিকে। গাড়োয়ান তামাক দল্‌ছে হাতে। বাবুর কাছ থেকে শেখা বিদ্যে সুদসহ ঢেলে দিয়ে, মুখ খিঁচিয়ে, বীভৎস গালমন্দ আরম্ভ কর্‌ল—"তেরি…।"

গাড়োয়ান অনেকক্ষণ কুঁড়েমি করেছে—লড়াইয়ের গন্ধে সেও উঠল ঝাঁঝিয়ে "কি? ভাড়া ঠিক্ হয় নি এখনও, ফাটা পাওনার নামগন্ধ নেই—খালি গালাগালি—? মুখ্ সাম্‌লে কথা বল্, তোর জমিদারীতে চাষ করি, না তোর খাতক আমি? হেঁ, বাজে বক্‌ছে—দেখ হে—"

লেগে গেল ধুন্ধুমার। চক্রের মত হাত ঘোরাচ্ছে নিতা—দু' পক্ষে অশ্রাব্য গালাগালি—লোকের ভীড় জমে গেল। ও'দিকে বলিদত্ত নিজেই টেনে হিঁচড়ে মালপত্র একত্র করছে। সরোজিনী পায়চারী করছে, কুলিরা বলিদত্তকে ঘিরে মজুরীর জন্য তাগাদা দিচ্ছে। গাড়োয়ান গালাগাল দিতে দিতে ঘড় ঘড় করে গাড়ী নিয়ে চলে গেল, বলে গেল "বাবু—বাবু? আমি যেন আর বাবু দেখি নি—ভারি বাবু দেখাচ্ছে—।"

নিতা ফিরে আস্‌ছে, গাল্ পাড়্‌তে পাড়্‌তে, গলদ্‌ঘর্ম।

বলিদত্তর মাথা গরম। নিজেই এগোল। দূরে আর একটা গরুর গাড়ী। গাড়োয়ান অপেক্ষা করছিল ; কারণ, আর গাড়ী নেই।

"কত নিবি ?"

"তিন টাকা।"

"দু' টাকা।"

"না।"

"বেশ, চল্ ; এই চাপ্‌রাশী, তোল্ সব জিনিষ, গাড়ীতে রাখ্।"

"হুজুর।"

"বাসা ঠিক আছে ?"

"হুজুর।"

নতুন সকালে আত্মপ্রকাশ নতুন অফিসারের !

চাপ্‌রাশী তা' বুঝে ফেলেছে।

সরোজিনী চেয়ে দেখ্‌ল—এই তা'র নতুন বাড়ী। সামনে বাগান, পিছনে উঠোন খিড়কি, বড়দরের ব্যবস্থা, সত্যিই বড়।

পুরনো মুছে গেছে, নতুন এসেছে। গাড়ী থেকে নেমে চারদিক একবার ঘুরে এসে জিনিষপত্র নামিয়ে মাঝখানে রাখালো। এত শীঘ্র এসব কি করে নিজস্ব মনে হচ্ছে। দেখতে দেখতে খেলছে কল্পনায়—এ'টা বস্‌বার ঘর হবে, ও'টা শোবার, ওধারেরটায় ভাঁড়ার, আর একটা—রান্নার জন্য ইত্যাদি। জিনিষ বইতে বইতে ধকল যাচ্ছে নিতার, তা'র যেন আলসেমি ভেঙ্গে আস্‌ছে !

"চাকর ছোঁড়া একটা ঠিকও করেছি, মা, জল্‌চল্ জাতের ; আপনি রাজী হ'লেই এনে দেব।"

"এও জিজ্ঞেস করতে হয় ? চট্‌পট্ আন্, কত নেবে ? কম্-সম্ ত' ?"

"হুজুর যা দেবেন।"

কূলে ভিড়ে বলিদত্তর মনটাও খুশী খুশী। ঠাট্টা করে বল্‌ল—"ওরে বোকা, কথায় বলে না ?—'গরু কালো হওয়া চাই, লেজ যেন মাটি ছোঁয়, খাবে অল্প, দুধ দেবে বেশী।"

"হুজুরের ভারী বুদ্ধি ! আহা হা, সত্যিই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, বচনের কি বাহার ! মা গো ! কি বচন—" নিতা বল্‌ল ; তারপর মা'র কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বলল যাতে বাবু শুনতে পায়—"একলা হ'লেও, ভারী কড়া হাকিম। ইনি কাজ করাতে পারবেন ;

এঁর আগের হাকিমদের মত নয় ; কাজ জানেন্। অকাজের রাহু ; সায়েব এঁকে পুষ্যিপুত্তুর করবে, দেখে নেবেন—"

"আগে আমার জামাকাপড় বের কর তো ; সায়েবের কাছ থেকে ঘুরে আসি।"

"স্নান খাওয়া ?"

"দাও না, তুমি ; বুঝছ না ? নতুন জায়গা যে !"

সরোজিনী পোষাক বের করে দিল ; অন্য ঘরে গিয়ে বলিদত্ত তা টেনে টুনে পর্‌তে লেগেছে। এদিকে নিতা, "চাকর ছোঁড়াকে ডাকাব, মা ?"

"চাকর ?"

প্রথমে কে যেন বলেছিল ? মনে পড়ে মেজাজ তেতো হয়ে গেল। একটা ছেঁড়া স্মৃতি, ধর্‌তে না ধর্‌তে ঝরে যায়, ওঠে দীর্ঘশ্বাস।

"থাক্, চাকর কি হবে নিতা ? দু'টি মাত্র প্রাণী ; একা আমি কি সাম্‌লাতে পারব না ? তুমি ত' আছ, একটু মদত দিলেই কাজ হয়ে যাবে।"

"লোকে কি বল্‌বে, মা ? নিন্দে কর্‌বে। বলে বেড়াবে বাবুর বাড়ীতে চাকরটাও নেই ? ধাই, ঝি ত' নেই-ই। বাবু কি এমন তেমন, যা তা ? সাক্ষাৎ অফিসার ! ভোর হতে না হতে চৌদ্দ উমেদ্‌দারের আনাগোনা। আমি থাক্‌তে থাক্‌তে আমার বাবুকে কে তুষবে ? দেখে নেব না ? দাঁত ফোটাতে দেব না। নইলে কিই বা কাজ ! আমি এখন একটু বেতো হয়ে পড়েছি বলে ; বুড়োও হয়ে গেছি, রাত্তিরে পালা জ্বর। তোমার আশীর্বাদে কত বাবুদের সেবা করেছি। এক্‌লাই, রান্না করেও দিয়েছি, ঘরঝাঁট, কাঠ্‌কাটা—সব। এখন, শরীর সামান্য খারাপ ; ভাল থাক্‌লে, দেখবে আমার কাজ। আবার, পেট কামড়াচ্ছে। তবে, তা কি সবদিন ?"

"এ বাড়ীতে কে কে থেকে গেছে, নিতা ?"

"আঠারোটা বাবুর সেবা করিছি, মা ! এই বাড়ীতে চার চারটে বাবু মরেছেন।"

"বল কি ? মরেছেন ?"

"হ্যাঁ, মা ! মরেছেন। জীবন মরণ ত' লেগেই আছে—বাঁচা মারার দায় কা'র, বল ? তোমার ধর্মের দোহাই দিয়ে আমি কবে

চোখ বুঁজব ; খালি ঠাকুরকে জানাই এইটুকু—মরবার সময় যেন এই মা, বাবুর চরণ ধ্যান করতে করতে প্রাণটা যায় ; তা'হলেই আমার বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি। সারা জীবন অফিসারের সেবা করলাম, মরবার সময় অফিসার না দেখে চোখ বুঁজব ? হ্যাঁ, মা, চারজন মারা গেলেন এই বাড়ীতে। মরার সময় নিজে গাড়ী করে তাদের পরিবার রেখে এলাম তাদের গাঁয়ে। তা ছাড়া, এ বাসায় দু'জনের মা মারা গেছেন্, একজনের বৌ-ই ত' মরে গেল, ছেলে মেয়ে—দু' চারটেও। তাদেরও আমিই আগুনে তুলে দিয়েছি, দাহের পর চান্ করেছি। কাজ পেলে আমি হট্‌বার পাত্র নই। সার্টিফিকেট্ রেখে দিয়েছি, মা, দেখাব ?"

"আর ভাড়াটে বাড়ী নেই ?"

"আর ভাড়া-বাড়ীর কি দরকার, মা ? এই ত' ভাল, সব সুবিধা ; ভাড়াও লাগবে না ; আপিস কাছে, বাজার কাছে—।"

"তবে এখানে যে এত লোক মরেছে, বল্‌ছ ?"

"অমন কি লোকে মরে না ? বিধির বিধান—কি অন্যথা করবে ? তাই বলে কেউ কি বাড়ী ছাড়ে, না দেহ ছাড়ে ? এই যে এখানটা দেখছ, মা, যেখানে আমরা বসে আছি, কে জানে এ মাটিতে কি আছে ?"

"এ্যাঁ, কি আছে ?" সরোজিনী চোখ বড় বড় করে চার্‌দিক চাইল। কি বলে এ লোকটা ? হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে।

"না, মা, আমি বল্‌ছিলাম্ কি—এই এত লোক যে মরে, কোথায় যায় তারা ? এই মাটিতেই ত' ? দুনিয়াটাই এক মুর্দাখানা, এই মাটিতে মিশেছে সকলের হাড়মাস। নিজের হাতে একটা একটা করে পুড়িয়ে এলাম, মা—বাপ, মা, বউ, বাচ্চা দু'টো। এখন আমি ন্যাড়া গাছ, দাঁড়িয়ে ঠায়। কোথায় গেল তারা ? এই মাটিতে ত' ? আর এই পৃথিবী, বসুধা—শাস্ত্রে বলে—এ হচ্ছে মেদ অসুরের হাড় গোড়, সেই হাড়-গাদার ওপর আমরা ঘর করি, সেই হাড়-গাদা থেকে রস টেনে ঝিঙ্গে, করলা, কুমড়ো, লাউ ফলে ; আমরা তা খাই ; সেই রসে বিলিতী আলু, মাটি আলু, কচু—"

"থাক্, থাক্, নিতা ! ওসব বোল না !"

"কিচ্ছু না, মা। ভাত, চাল, ধানগাছ, মুগ, সব গাছই এই হাড়মাসের ঢিবি থেকে সার নিয়ে বাড়ে ; তারই রস ঢোকে ফলমূলে, সেই মরা মানুষের হাড়, রক্ত মাস্—"

"ঈস্, থাক্ থাক্, নিতা, ওসব শুন্‌লে কিছু খেতে রুচ্‌বে না।"

"না, মা ; রুচবে না-ই ত। তাই আমি কম খাই, ভাবি এ ত' আমিষ, এ পরের রক্ত। কি করি, বল? বিধাতা এমনি ফাঁদ পেতে রেখেছে। এখানে পরের রক্তমাংস না খেলে মানুষ বাঁচতে পারে না—"

"মাগো!"

সরোজিনীর চোখে চারিদিকে শুধু হাড়, মাংস, রক্ত, অতি নিরীহ মাটির চেহারা পাল্‌টে—বীভৎস। নিতা'র চোখে তার চেহারা ভাল লেগেছিল ; কিন্তু এখন শাস্তিতে চুলোবার মোহ ভেঙ্গে গেছে। অফিসার ঘরণীর রূপ গেছে চুলোয় ; দেখাচ্ছে দজ্জাল মাগীর মত, তা'কে দেখ্‌লে ভয় করে। বলল সে—"এ ব্রহ্মজ্ঞান, মা। দুনিয়া শুধু যাওয়া আসার জন্য, ভাবলে মায়া কাটে। এত ভেব না, সবই ত' বিধির বিধান, কি আর করা?—চাকর ছোঁড়া আন্‌ব, মা?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আন্ ; কেউ কোথাও নেই, নির্জন—"

"আর ভাবছি, একটা চাকরানীও বন্দোবস্ত করি—ভাল হবে। এত বড় বাড়ী—লোকজন থাকলে ত' বাড়ীর শোভা, মা। বাবু আর আমি ত' শুধু সফর করে বেড়াব ; বাড়ীতে দু'চারজন থাকা চাই। সস্তায় একটা ঝি ঠিক্ কর্‌ব, খেয়েদেয়ে দু'তিন টাকা—"

"দু' দুটো? মাইনে পাই কত যে—"

"টাকার ব্যাপার আমার হাতে ছেড়ে দাও, মা। এ রাজ্যে সোনা ফলে। বাবু জেনেও জান্‌বে না ; তার সঙ্গে এসব কথার সম্পর্কই বা কি? সবই ত' আমিই করিয়ে দি। এতগুলো বাবু এল গেল—কী না খেল, কী না পেল, কী না সঙ্গে নিয়ে গেল? এখানে টাকার ফসল কুন্‌কেতে মাপ্‌তে হয়। স—ব আমি ব্যবস্থা করে দি ; তোমার পরোয়া কিসের? খালি, অন্য অন্য বাড়ীর মেয়েরা যখন বেড়াতে আস্‌বে তোমার কাছে, মাসের মধ্যে দু' একবার তখন মুখ শুকিয়ে আমাকে বোলো—'নিতা ঘরে চাল বাড়ন্ত, কোথাও থেকে দশটাকা ধার আনতে পারিস্?' দরজার কাছে গলা বাড়িয়ে কথা-গুলো বোলো ; ফিস্‌ফিসের মধ্যেই একটু জোরে যাতে সবাই শুনতে পায়। আর বাবুও আপিসের কেরানীর কাছ থেকে ফি মাসে দশ, কুড়ি টাকা ধারে আন্‌বেন—"

"ধার করে ঝি চাক্‌রানী রাখতে হবে?—"

"না গো মা, খালি লোকদেখানোর জন্যে, বুঝছো না—ভিতরের

কথা ? লোকে বুঝুক তোমরা ধারকর্জ করে চালাও। লোকের যা হিংসুটে নজর। ওদের চোখে ধুলো না দিলে টাকার ফসল তুল্‌বে কি করে ? তারা বাদ সাধ্‌বে না ?"

সরোজিনী কিছু বল্‌ল না ; দানাপানির এ এক নতুন ব্যাকরণ ; তার মনে ভাবনা। ভাবে—এই যে নিতা, ওর মুখে পাপের ছাপ।

□

মিষ্টার শা—

'শা—' কথাটি স্নেহময় মধুর সম্বন্ধের সূচনা দিয়ে আস্‌ছে যুগে যুগে। ওড়িয়া ভাষায় তার একটি বিশিষ্ট স্থান, অতি ব্যবহারে কখনও কখনও তা' 'হা—' ও হয়। বাক্যের শেষে না হক তা' উচ্চারণ করে কেউ কেউ পায় নতুন উন্মাদনা, নব উৎসাহ।

এবং 'শা—' শব্দে আছে এ দেশের একটি ব্যাপক সর্বজনীনতা ; সঙ্গী সঙ্গীকে, চাষী বলদকে, মজুর তার স্ত্রীকে, সকলে সকলকেই এ সম্বোধন করে থাকে।

কিন্তু মিষ্টার শা'র গড়নে স্নেহের সূচনা নেই। কালো মিশ্‌মিশে, মোটাসোটা, ঢ্যাঙ্গা লোকটি—কোদালের ফালের মত মুখ, তা' আবার রাশভারী, রুক্ষ, নিষ্ঠুর। মাথার চুল কদম্‌ ছাঁট, চোখ যেন কাঁচের তৈরী। মোটা ঠোঁটের একফালি বাঁকা, তাই মনে হয় যেন বাঁ গাল সর্বদা ঝুলে আছে। অস্বাভাবিক রকমের মোটা ঘাড়—ঘাড়েগর্দানে এক। তা' আবার হঠাৎ চক্কর মারে বিশেষ এক ভঙ্গীতে। চওড়া হাত, জন্তুর থাবার মত। পেট নয়ত' যেন পিপে, জালা। হাবভাবে সর্বদা তৈরী—'এই রে, এই বুঝি ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল'—ভাব। মনে পড়ে যায় কুস্তির আখড়ার দঙ্গল মারা খলিফা ওস্তাদকে।

কিন্তু খলিফার তারুণ্য নয়, খলিফার প্রৌঢ়ত্ব।

সম্মান আদায় করে করে অহঙ্কার বেড়েছে। ওদিকে বাড়ীর ঝঞ্ঝাট পর্বতপ্রমাণ, তা'ই বিরক্তি বেড়ে যাচ্ছে ; দানাপানির উন্নতির জন্য নানাক্ষেত্রে বৈরাগ্য দেখিয়ে ক্রমে বৈরাগ্যের চেতনায় মন দাউ দাউ জ্বল্‌ছে।

এ রকম লোক স্নেহশীতল নয়, সর্বজনীনতার অধিকারীও নয়। যার চলনে মাটি কাঁপে থর্ থর্ করে, যার গলার শব্দে কাকপক্ষী পালায়, যার প্রকোপে লোকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক্ ছাড়ে, সে সর্বজনীন নয়, স্বতন্ত্র। যদি কখনও সে চারপাশের লোকগুলোর দিকে তাকায়, তবে তাদের সঙ্গে মিশতে নয়, কিছু আদায় করতে চায়। মানুষ দেখার অভিজ্ঞতা তা'র নেই। সে দেখে নির্জীব পুতুল, তার দুনিয়া পুতুলের দুনিয়া। গহন মনের বিকৃতির, রূপান্তরিত ইচ্ছার তাড়নায়, সেই পুতুলের ভীড়ে তা'র ইচ্ছা হয় ঘোড়দৌড় খেল্‌তে। কোন পুতুলের মাথা, কারো মাজা ভেঙে, থেঁত্‌লে পিষে ফেলে সে; পুতুলের সংসারে বিপর্যয় ঘটিয়ে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে—কোনটা চিৎপটাং, কোনটার মাথা নীচে পা ওপরে, কোনটা খণ্ড বিখণ্ড। এ দৃশ্য উপভোগ করে সে আনন্দ পায়, বলুক না লোকে তাকে স্যাডিষ্ট, এগজিবিশনিষ্ট, যা খুশী!

অথচ সে শা'; কারণ যেখানে 'সাহু' পদবী থেকে 'শা' পদবীতে তা'র সাহেবী উত্তরণ। বাইরে তার দেহে থাকে স্যুট, মাথায় টপ-হ্যাট্, মুখে চুরুট্, হাতে লাঠি। 'বন্দ্য উপাধ্যায়' বদলে 'বানরজী'র মত পুরুষানুক্রমিক ভাবে 'সাহু'র ইংরেজী ভেক্ 'শা'—শুনতেও নিজের খুশী লাগে।

মিষ্টার শা' একজন কর্মচারী, সাধারণ নন, কোম্পানীর সায়েব্।

বসে আছেন মিষ্টার শা'—দু'পাশে কাঠের তাকে গাদা গাদা নথি-পত্র, তা'তে বড় বড় সমস্যা। ঘরটি বেশ বড়; দরজা জানালায় মোটা পর্দা টাঙানো। বাইরের আলোর বিরোধী এ ঘরের ভিতর বিজলী আলো জ্বলছে টেবিলের ওপর। টেবিলের ওপাশে আগন্তুক-দের জন্য একটা চওড়া বেঞ্চ্, পুরো হাতওয়ালা; আর একটা বেঞ্চ, একটু পুরনো—তা'র একটা হাত নেই। একটা টুল। দর্শনার্থীর যদি বস্‌তে নেহাৎ জেদ থাকে, তবে তা'র পদ অনুসারে, এই তিন রকম আসনের মধ্যে শার বিচারে যা যোগ্য মনে হবে, সে সেই আসন পায়। শা'র এবম্বিধ বিচারের অভাবে, তাকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হবে।

ঘরের ভিতর এক ধারে কাঠের বেড়ায় ক্যানভ্যাস ঘিরে এক মানুষ উঁচু পর্দা খাড়া—তার আড়ালে একটা প্রস্রাব-পাত্র ও কমোড্। এই উভয় কর্ম শা' করেন সেই পর্দার আড়ালে; এ হ'চ্ছে সায়েবীয়ানার লক্ষণ; ঘরের চাপা গন্ধের মধ্যে প্রস্রাবের

কড়া বোট্‌কা গন্ধ ঝাঁঝিয়ে ওঠে পরিষ্কার। ঘরের অন্যধারে অন্য একটি পর্দার আড়াল ; সেখানে টিফিন্‌ কেরিয়ারে জলখাবার ও 'খানা' এবং ফ্লাস্কে চা। সেখানে দাঁড়ানো আল্‌নার ওপর একখানা তোয়ালে, খানা খাওয়ার একটা টেবিল ; একটা আয়নাও আছে— কখন সখনো প্রসাধনের জন্য।

বিরাজমান মিষ্টার শা'—তিনি লিখতে ব্যস্ত। কলমটা শক্ত মুঠোয় ধরা—চেপে লিখে চলেছেন কাগজের ওপর কুস্তি করার মত; তখন সংকুচিত মুখের মাংসপেশীতে যেন ধনুষ্টঙ্কার, মুখের ভাব পরিষ্কার, পরিস্ফুট—তা' কখনও হিংসার, কখনও রোষের, কখনও বা সতর্ক কুটিলতার।

টেবিলের ওপর রাখা 'কলিং বেল'—এ দুম্‌ করে ঘা' পড়ল—কর্‌ কর্‌ করে উঠ্‌ল তীক্ষ্ণ আওয়াজ। পর্দার ওধারে বসেছিল কুঁড়েমি করে, দেওয়ালে ঠেস্‌ দিয়ে চাপ্‌রাশী ; ধড়ফড় করে লাফিয়ে ঘরের ভিতর এসে মাজা বেঁকিয়ে সেলাম করে বল্‌ল "হুজুর"।

"ব্যাটাচ্ছেলে, ডেকে আন্‌—"

"হুজুর।"

আগের মতই ধড়্‌ফড়্‌ করে তীরবেগে চাপ্‌রাশী বাইরে গেল ; তার ইতস্তত, সারি সারি বাবুরা বসে কাজ করছেন, খুদে খুদে খোপে ছোট সায়েবরা, আপিসের বড়বাবু। সায়েব বলেছে "ডেকে আন্‌।" কিন্তু, কাকে ? বুদ্ধি খেলিয়ে চাপ্‌রাশী দৌড়ে গেল বড় বাবুর কাছে. চিনির বলদের মত সব কিছুর টাল সাম্‌লাতে তিনিই।

"সায়েব সেলাম্‌ দিয়েছেন, আজ্ঞে।"

চট্‌পট্‌ উঠে বড়বাবু গেলেন কুঠিতে, যেতে যেতে অভ্যস্ত হাত কোটের বোতামগুলো সব লাগাল ; সায়েব লিখছেন। দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হোল বড়বাবুকে। মুখ না তুলেই, শুধু চোখের মণি ঘুরিয়ে সায়েব বল্‌লেন—

"কাজটা করেছ ?"

মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল ঃ—"কি কাজ ?" পরক্ষণেই পস্তাতে হ'ল সেজন্য।

গর্জন করে উঠ্‌লেন সায়েব "কি কাজ ? কতবার বল্‌ব ? এই নিয়ে ষোলবার হ'ল। বল, করেছ কি না ?"

চট্‌পট্‌ বড়বাবু বলে ফেললেন—"হচ্ছে স্যার্‌, হচ্ছে ; শেষ হয়ে এসেছে প্রায় ; কাল সারারাত খেটেছি।"

"আচ্ছা, যাও—এখনও হয় নি? নিষ্কমা যত সব!"

মুখ নামিয়ে, ভয় পেয়েছে—এমনি ভাব করে, লেজ নাড়াতে নাড়াতে বড়বাবু ফিরে চললেন। বাইরে এসে দম্ নিলেন। কি কাজ—জানা নেই; শ' দেড়েক কাজ ঝুলছে; 'শেষ হয়েছে' না বলে 'বাকী আছে' বলে আসাটা ভুল হয়েছে!

কি উত্তর দিয়েছেন? কোন্ কাজের বিষয়ে? কিছুই তাঁর মনে রইল না। তবুও প্রশ্নের জবাব ত' চাই।

প্রশ্ন বাইরে থেকেও আসে—মাঝ রাতে টেলিগ্রাম—"তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন ডিপোয় সমুদয় কত বলদ আছে, টেলিগ্রামে জানাও," "এ বছর কত চাক্‌লায় তামাক্ পাতা চাষ হয়েছে, টেলিগ্রাম কর।"

হাজির জবাব টেলিগ্রাম ছাড়্‌তে হয়। খোঁজ খবর নিয়ে তথ্য জোগাড় শেষ করা পর্যন্ত জবাব আট্‌কে থাকলে, তিনি বড়বাবু পদে বেশীদিন থাক্‌তে পার্‌তেন না।

বড়বাবু বিদেয় হলেন্—সায়েব কুঠিতে একলা।

কাগজের ওপর চেপে, ঘষে চল্‌ছে কলমের লাঙ্গলে চাষ।

বাইরে বিয়ের বাজনা শোনা গেল, সানাই পোঁ ধরেছে—বেড়ে সানাই বাজছে—লহরে লহরে মন উধাও কোথায়, কোন্‌খানে?

সায়েব খেপে গেলেন। ওঃ, মানুষ জন্মাবে, বিয়ে কর্‌বে, ঘর কন্নার খেলাঘরে খেলা কর্‌বে, মর্‌বে—জীবনের গতানুগতিক থোড়-বড়ি-খাড়া, ঝাঁঝ্‌রা গত্, কাদা ঘাঁটাঘাঁটি, কি বিরক্তিকর। বাইরে চলছে সেই হাটের হল্লা। কাপড়-ঢাকা আড়ালের নীচে স্বার্থ লুকিয়ে চলে নিজের নিজের আলাদা উদ্দেশ্যে যাতায়াত, সেই আর্জি, আপত্তি, শখ্, দুঃখ।

তবুও দূরে চলমান বিবাহের শোভাযাত্রা, দিনের বেলা বাজির ধুমধাম্, সানাই বেজেই চলেছে।

হয় ত' পিপে খানেক্ মদই গিলেছে।

ইস্, সেই ঘষা পয়সা, পুরনো কথা, বিরাম নেই—যেন রাস্তা দিয়ে চলেছে অগুন্‌তি গরুর গাড়ীর সারি, একটার পর একটায় সেই ক্যাঁচ কোঁচ্, ক্যাঁচ্ কোঁচ্—

শনি মঙ্গলের বৃষ্টি যেন, জমাট্ মেঘের নীচে স্যাঁত্‌সেঁতে এ জীবন। শুয়ারের মত তবুও লোকে কাদা চট্‌কে জীবন উপভোগে ব্যস্ত।

এই জীবন !

সুন্দর শোনাচ্ছে সানাই দূর থেকে। মন ছল্‌কে, নাগালের বাইরে। চলুক্ এই জীবন।

কাগজের ওপর কলম স্থির, খাড়া, ঘাড় নুয়েছে এক ধারে। মুখে ক্রূর আধো-হাসি ঝুল্‌ছে অচঞ্চল। অবচেতনে ভুর্ ভুর্ করে ওঠে—ফুলঝুরির মত আবছা স্মৃতি সব—লাল, নীল, বেগুনী, হল্‌দে, নানা রংএর। চেতন মন সজোরে ডাক্ ছাড়ে এ কিছু নয়, এ দুর্বলতা, এ মিথ্যে ! সংসারী লোক, অতএব, অতি হেয় জ্ঞান করে চেতনাকে।

নিজে সে এই আপিস বাড়ীর ডিক্‌টেটার্ ! এক লাথিতে মুছে যায় বিশ্‌ কুড়ি লোকের ভাগ্য, তাদের সকলের আশ্রয় দানাপানি ; আশ্রিতের মুখের ভাত কেড়ে নাও ; দেখ্‌বে উঁচু মাথা নিজে নিজে নীচু হবে। মানুষ তখন বিফলভাবে কাঁদে ; মাঝের জনের খাবার পাতে অনাহূতভাবে বাড়তি কিছু ঢেলে দাও, হাজার বন্ধুত্ব থাক্‌লেও দেখ্‌বে অন্য দশজন চেঁচামেচি লাগাবে, কাড়াকাড়ি করতে চেষ্টা কর্‌বে নানা মতে। বন্ধুত্ব ভূত হ'য়ে মিলিয়ে যাবে হাওয়ায়। সামান্য একটু প্রতিশ্রুতি, সহজে তা'তেই লড়াই শুরু হয়। তারপর ? দেখা যায় মানুষ নামধেয় পশু লড়ছে—ধরাধরি, গড়াগড়ি, কাম্‌ড়া-কামড়ি করে। গর্জনে গগন ফাটে—কী ইতর ! যেন রাস্তার খেঁকিকুত্তার খেয়োখেয়ি। ঝক্‌ঝকে মুখ, কচি ছোকরাও তা'তে ভিড়ে যায়—চোখে তাদের সর্বজয়ী আশা, কাজে গভীর হর্ষ, উচ্ছ্বাস, চলনে ছন্দ, পেশীতে লীলায়িত নৃত্য। দু'দিনের ঘানি ঠেলা, তিন চারটে দানাপানির ঝাঁকার জন্য এত। তারপর ফুল যায় শুকিয়ে, যৌবন গড়িয়ে বার্ধক্য, ঘাড় কুঁজো হয়ে যায়, ফোক্‌লা গালের ওপর সিঁটিয়ে থাকা চামড়া। আহত, নিস্তেজ চোখ ; ওপরের দিকে চোখ তুলে তাকাতে ভয় করে, আড়ালে লুকায় যৌবনের ধ্বজভঙ্গ। তারপর সে আর মানুষ নয়, কল একটা, যন্ত্রমাত্র। সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখতে মন ছট্‌ফট করে না আর ; খেলাধূলা দেখার কথা স্মরণেও আসে না, বই পড়ার আনন্দের চেয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে গল্প করার আনন্দ পর্যন্ত, তার সব আনন্দের চেতনা শুকিয়ে যায়। শুধু সেলাম করবে, কাঁপা গলায় কোরাস ধরে প্রশস্তি গাইবে। শুধু একটা চেতনাই কাজ করতে থাকবে। সুবিধা পেলেই বাড়িয়ে ধরবে দানাপানির কানাভাঙা সান্‌কি, শতচ্ছিন্ন ভিক্ষার ঝুলি, 'আর

এক মুঠো স্যার, আর এক মুঠো, হে ভগবান।'

অনুমান করা যায়, অন্য দিকটাও। আল্‌তা, অলকাতিলকা-চর্চিতা দেবীর সাজে এসেছিল তার ঘরণী। মড়ার বিষ-নিঃশ্বাসে এখন সে গর্জনময়ী দজ্জাল, খাণ্ডার, অভাবের চাপে তার এক পাল বাচ্চা—অর্ধমনুষ্য। সবাইকে নিয়ে, অশান্তিতে, হিংসায় যেন এক মরণদেবতার প্রোপাগ্যাণ্ডা বাহিনী—"মৃত্যুকে নমস্কার কর, জীবন নেই; মরণ আছে; এসো হে, মরণ, চিন্তায় ভাবনায় মায়াজাল বিছিয়ে এস, শীঘ্র এস।" গিন্নী চিৎকার পাড়ে—"মর্, মর্, মর্, জ্বালা জুড়োক্।" এক পাল বাচ্চা পালা করে নাচে—ধেই, ধেই।

হাঃ, হাঃ হাঃ—ডিক্টেটার—হোঃ হোঃ হোঃ—বারংবার বজ্র হানে; জীবন্? কেমন প্রতিশোধ? মর্ মর্ মর্ মর্।

বিয়ের শোভাযাত্রা দূরে গেছে, দূর থেকে শোনা যায় সানাইয়ের ভাঙ্গা, কুয়াশা-ভরা সুর; থেকে থেকে কানে আসে, আবার শোনা যায় না।

ওপারের ঢেউয়ের মত তা' হাওয়ায় ভর করে ভেসে আসে।

তার জমকালো জলুস নেই, সে নয় বিলিতী ব্যাণ্ডের সঙ্গে পল্টন-শোভাযাত্রা। কানে তালা লাগিয়ে, জুতোর গোড়ালিতে মাটি চষে, খুঁড়ে বায়ুকে ব্যাপকভাবে তা আক্রমণ করে না। তা'র নেই ঝক্‌ঝকে নিরেট্ পেতলের লোকদেখানো আভিজাত্য।

শুধু দূর থেকে শোনা সানাই মাত্র; বাপ-ঠাকুর্দা আমলের গাঁয়ে গঞ্জের বহুশ্রুত গত্। কখনো কাছে, কখনো দূরে, বাজছে থেকে থেকে। তার প্রভাব মনকে চেপে ধরে রাখে না, বেঁধে রাখার প্রয়াস করে না মোটে। শুধু ছুঁয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়, ছোঁয় আর সরে পড়ে। খাদে উঠেই থিতিয়ে যায়। আমবাগানের ওধারে; ঐ ত' মিলিয়ে যাচ্ছে। বাঁধনহীন, বল্‌গা নেই, বেদুইন। অবর্ণনীয় বর্ণালী।

তবুও মন ধেয়ে চলে তা'র পিছু পিছু; চেতনা কান পেতে থাকে —দূর থেকে তার ভাঙা লহর কুড়িয়ে নিতে।

সে কোন্ যুগের কথা; কিন্তু মনে হয় যেন কাল সকালের মত। সানাইয়ের আমেজের যাদুবলে দেখা যায় ঘন বাগানবাড়ী, আমের মুকুল ধরেছে। দূর থেকে নজর দিয়ে দেখলে এঁকে যায় চোখের সামনে হালকা রোদে পাঁশুটে-হলদে রংয়ের ত্যারা বেঁকা ছবি।

তা'রই প্রতিচ্ছবি ক্ষেতের পরে ক্ষেতে, ভাঙা মাটি যেন টাকের মত, ফসল কাটার পর হল্‌দে খড়ের গোড়া, আলের ওপর অতি সবুজ খুদে খুদে লতার মোটা মোটা পাতার ফাঁকে ফাঁকে হল্‌দে হল্‌দে ফুলের ফুটকি। পাড়ায় নতুন ছাওয়া কুঁড়ের চাল। সবই হল্‌দে, বাসন্তিকা।

শহরের বই মুখস্ত করা মুখরা পৃথিবী থেকে একদণ্ডের জন্যও সেখানে ছুটে গেলে শান্তি মিলত। শহর থেকে দূরে, বৃক্ষলতা, ঠাণ্ডা সারি সারি চালা, ক্ষেতখামার আর বাগান। অন্তহীন সময়ের শান্ত চাঁদোয়ার নীচে, সেখানে গতি নীরব হলেও নিশ্চিন্ত। সেখানে জীবন সন্দেহকণ্টকিত নয়, সরল পরিচ্ছন্ন।

"সাহু'দা আছ না কি বাড়ীতে?"

মিষ্টার শা' নয়, সাহু'দা।

"বোসো, বোসো, পান খাও; ওরে, পান আন্‌, পান—"

সময়ের পরোয়া নেই, আলসেমি করে সদালাপ শুরু; ঢিমে তালে পানের ওপর চুন্‌ লাগিয়ে ধীরে ধীরে ঠুক্‌ ঠুক্‌ করে জাঁতি দিয়ে সুপারি কাটা, তারপর দোখ্‌তা ছিটিয়ে মুখে পোরা; একটা শেষ হলে, আর একটা পান সাজা।

কুঁড়েমি ভরা চোখে চেয়ে থাকা মফঃস্বলের সর্বকালের গড়িমসি নীতি—গ্রামে গঞ্জে যেখানে প্রাচীন দেশের হৃৎপিণ্ডটা ধক্‌ ধক্‌ করছে—তেম্‌নি কুঁড়েমি, আল্‌সেমিতে ভরা; অলস, কিন্তু বন্ধ নয়, চল্‌ছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। সে গতিতে লেখা নেই ঘড়ি দেখা ত্বরা, নেই মোটর চড়ে ঘূর্ণিবাতের মত ধুলো উড়িয়ে একাকার করা, নেই ট্রেনের টাইম্‌ ঠাউরে ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি করে হাঁফাতে হাঁফাতে, হন্তদন্ত হয়ে হোঁচট্‌ খেয়ে আছড়ে পড়া, আবার উঠে দৌড়ঝাঁপ্‌।

শুধু চেয়ে দেখা, বোঝা, নিজের হৃৎপিণ্ডে অনুভব করা, সেই চিরকালের হৃদয়ের কানাকানি যা বইয়ে নেই, লেখা আছে জাতির রক্তে, মজ্জায়।

কেবল কান পেতে শোনা, ভাবনার ঢেউয়ে ভেসে চলা, স্বপ্নিল চোখে চেয়ে থাকা দূর থেকে দূরান্তরে। ভোরে চিঁড়ে কোটা থেকে তার ছন্দ শুরু, ক্রমে ধান সিদ্ধ করা, বড়ি দেওয়া, আতপ চাল গুঁড়ো করা মাটিতে আলপনা, মেটে দেওয়ালে ছিটে দেওয়া। পুকুরপাড়ে গাঁয়ের মেয়েদের গল্পগুজব, দিনমানের যাবতীয় কাজ—সবই ধীরে, আস্তে, গাঁয়ের বাড়ীতে বাড়ীতে উনুন, কাশের আগুন, ডালপাতার

আঁচ্, তাও ত' জ্বলে ধিকি ধিকি, গন্ গনে নয় ; ঘরের কোণে পুরনো পান্তার হাঁড়ি ; তা'ও বলে সেই সরল, নিরুদ্বেগ, আল্‌সে জীবনের অন্তহীন কাহিনী। ঘরে ঘরে এমন দশ বছর, পনের বছরের পুরনো পান্তার জল—'কাঞ্জিপানি'। জমে রয়েছে যুগ যুগের ধুলোর নীচে যুগ যুগের ঘরকন্না ; আম্‌সির হাঁড়ি–সেও কত পুরনো।

"সাহু'দা, বেড়াতে যাবে না ?"

ঝক্‌ঝকে রোদ্দুরে গোচারণ মাঠে ষাঁড়ের দাপাদাপি—দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘণ্টাখানেক্ সময়ই কেটে গেল। গাছের ডাল থেকে কাঠি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে কাক—তা'ও চেয়ে চেয়ে দেখার মত। ছেলে মেয়েরা ফড়িং ধরছে। উড়ে পালাচ্ছে প্রজাপতি। দল বেঁধে লোক হাঁটছে, যাচ্ছে তা'রা তরজা শুনতে। কেউ যাচ্ছে কুটুমবাড়ী ; সাম্‌নে রং করা মিষ্টির হাঁড়ি মাথায় মুটে, পিছনে জামা জুতো পরা 'লম্বশাট পটাবৃত' একজন, তার কাঁধে লাল টক্‌টকে গরদের জোড়, ছোট ছেলে একটা অবাক্ চোখে তাকিয়ে দেখ্‌ছে সব।

সবাই সেখানে সমান, বাদবিসংবাদ নেই, অহিংস, খাদ্য খালি থোড় বড়ি খাড়া।

সেই অতীত, সেইখানে মিষ্টার শা'র শিকড়, সেই পিছনে ফেলে-আসা দিনের পুরুষালি, সবই আস্তে আস্তে দেখা দিচ্ছিল।

চম্‌কে উঠলেন মিষ্টার শা', বিড়্ বিড়্ করে বলে উঠ্‌লেন "ড্যাম্ সেন্টিমেণ্টাল্ রাবিশ্ ইডিয়ট্।" ক্রূর ঠোঁট বেঁকে গেল, মিট্ মিট্ করে চোখ দু'টো যেন আটকে রইল কার ওপরে—শত্রু, দুষমন্, গোটা দুনিয়াটাই অবিশ্বাসী শত্রু, নিজের রক্তে জারিত গরল ; তাই সে কাজ করে করে ঘষটাতে ঘষটাতে মর্‌তে চায়—চায় না গেঁয়ো শান্তি। অবেলায় আজ হঠাৎ উদয় হয়েছে অতীতের বেলা, শোভাযাত্রা করে চলেছে অতীত ; তার কবল থেকে নেই নিষ্কৃতি।

বিদ্যা শেষ হ'ল—নিজে হ'ল দিগ্‌গজ পণ্ডিত ; তারপর বিয়ে। তারপর চাকরী, সুন্দরী বৌ, তন্বী—সুলেখা ; কিন্তু সে বিদ্যার মূল্য বোঝে না ; চায় নরম সোহাগ ; বোঝে না পুরুষালির গৌরব, কঠোর গৃহস্থালীতে নিজেকে তিলে তিলে আহুতি দেওয়ার মর্যাদা। সে গান ভালবাসে, পড়ে কবিতা, তা'র প্রিরিশীলিত মনের উচ্ছল ঢেউকে সে ছড়িয়ে পড়তে সুযোগ দেয়, পরকে আপনার করে। তার রূপে ফুটে ওঠে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের তেজ ; পায়ের বেড়ি সে খুলে ফেলে, স্বাধীন হয়। বনের পাখী সে, সুন্দর, সন্দেহ নেই, কিন্তু মনের মত

পোষ মানে না। মাংসল বাহুতে চেপে ধরলে তার ব্যক্তিত্ব প্রকৃত ঘৃণায় শিউরে ওঠে। খুশী হ'লে মুখ খুলে হাসে।

অতএব এলো সংঘর্ষের পালা, ঈর্ষা, সন্দেহ, হতাশার চেষ্টা। শা'র সন্দেহ যত বাড়ে, সুলেখার হাসি তত কমে; ক্রমে সে হ'ল ক্ষীণ, মুখরা অগ্নি; নিজেই নিজেকে দগ্ধায়। মিষ্টার শার রক্ষাকবচ মেদবহুল পাশবিকতা। আত্মপ্রত্যয়ের জন্য নানা পথ খুঁজে কবে একদিন হয়ে গেল অন্নমারম্ভ—দুম্‌দাম্‌, গুম্‌গুম্‌, কাপড় কেড়ে নিয়ে বেত হাতে সপাসপ্‌ চটাচট, চাবুকের পথে হৃদয়জয়ের অভিনব অভিযান।

সেই মুষ্টিযোগই বজায় রইল সেদিন থেকে। সুলেখার কপালে যষ্টিযোগ!

সুলেখাকে পীড়ন করে মনে জাগে এক তীব্র উত্তেজনা; মনের গহনে একধরনের নিভৃত আনন্দ। বৃষজাতীয় স্বামী পিটোয় সুলেখাকে।

পড়শীরা কেউ কুশল প্রশ্ন করলে সুলেখা নব নব ফন্দী ফেঁদে সাফাই গায়—'পিসী মরেছেন, মাসী গেলেন, তাই কাঁদছিলাম্‌।'

পিসীমাসীর সংখ্যা বারংবার নিঃশেষ হয়ে গেলেও তা'র কান্না থামে না; কিন্তু বৃষস্বামীও বিজয় লাভ করে না। পায় তিক্ততা; দানাপানির পদবৃদ্ধি সে তিক্ততায় ইন্ধন জোগায়। ভাবে বারংবার জীবনটা যদি আর একরকম হোত, হতে পারতও ত'!

আজ জীবনচেতনা নেই; কিন্তু বিভ্রাটের স্মৃতি অগুন্‌তি। সুলেখা সন্তানবতী, একপাল ছেলেমেয়ের আড়ালে অস্থিচর্মসার সুলেখা আয়ুর বোঝা বয়, নিঃশেষিতার স্বাধীনতা। মিষ্টার শা' আশ্রয় নিয়েছে ফাইলের আঁস্তাকুড়ে, নিজেকে কাজে ভুলিয়ে রাখতে। সংঘর্ষে সুলেখার প্রতীক, তার অধস্তন সবাই। দরিদ্র, হীনবল লোকগুলোর ওপর অত্যাচার করে তা'র ফুরিয়ে আসা যৌনক্ষুধার শেষ রাহু রূপান্তরে আনন্দ পায়, ডিক্টেটার হ'লেও সে খোঁজে আত্মবিশ্বাস। তর্জনীতে জগৎকে কানমলা দিয়ে, ভ্রূকুটি দেখিয়ে সে নিজের জীবনের ওপর প্রতিশোধ নেয়।

খেঁকি মানুষ, সন্দেহী, অস্থির। একটা মূর্তিমান হাহাকার।

বাইরের লোকের চোখে সে অতি ভয়ানক। কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় সে অতিমাত্রায় কার্যনিপুণ, দুর্ধর্ষ ষ্টীম্‌রোলার, সে সব পারে।

□

ভাবনায় যেন রঞ্জকের ছোঁয়া, হঠাৎ মিষ্টার শা' বড় চঞ্চল। একটা বড় দায়িত্বের সমস্যা মনে পড়েছে—এবার ধূমপান। মিষ্টার শা' বিড়ির পক্ষপাতী, এক ঘণ্টায় এক বাণ্ডিল খতম। মাটিতে রাখা বড় বড় গামলায় ভাস্‌বে তা'র মুড়োগুলো। দম্‌ আরম্ভ হ'ল। পর্দার ফাঁকে তাকিয়েই কেরানীরা ফিরে গেল। সায়েব বিড়ি খাওয়ার সময় বাধা দেওয়া বিধিবিরুদ্ধ। কারণ, সকলে জানে—বিড়ির ধোঁয়ায় ব্রহ্মরন্ধ্র সাফ্‌ করার সময় সায়েব মগজের কাজ করেন, বড় বড় সমস্যা মেটান।

বাইরে চাপ্‌রাশীর হাতে বলিদত্ত পেশ করল নিজের নাম লেখা চির্‌কুট্‌।

"অপেক্ষা করুন; দেখছেন না সায়েব বিড়ি টান্‌ছে, এখন চিন্তার কাজ সাফ করা হচ্ছে। কেউ যাওয়া মানা।"

চাপ্‌রাশী তা'র বেঞ্চটিতে বসে ধূমপান করতে লাগল, কাছে রেখে দিয়েছে তা'র পাগ্‌ড়ী—অন্তত দখলীস্বত্ব বজায় রাখতে।

কখনও কখনও সে অবহেলা অবজ্ঞায় তাকাচ্ছে পায়চারী করা বলিদত্তর দিকে। থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে ঘরের ভিতর থেকে জন্তুর গর্জনের মত শব্দ, চেপে রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও ভয়ঙ্কর। সেই সময় চাপ্‌রাশী চম্‌কে উঠ্‌ছে, চট্‌পট্‌ পাগড়ীটি মাথার একপাশে চড়িয়ে, বেঞ্চের ওপর পাগড়ীর বদলে বিড়িটা রেখে, পর্দার কাছে দৌড়চ্ছে, আবার বেঞ্চের কাছে ফিরে আসছে। বলিদত্ত চাপ্‌রাশীর দিকে ঈর্ষাভরে চেয়ে ফের্‌ রোয়াকে টহল দিচ্ছে, ন যযৌ ন তস্থৌ।

আধ ঘণ্টা, ঘণ্টাখানেকও টহল দিল নতুন অফিসার। বারংবার কামিজের হাতা তুলে হাতঘড়ি দেখেছে—প্রতি দেখা যেন এক একটা আবিষ্কার। খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখে দেখে হৃদয়ঙ্গম করেছে সময়ের হ্র্নিবার গতি। বুঝে ফেলেছে—কালঃ গচ্ছতি গচ্ছত্যায়ুঃ। হারানো মুহূর্তগুলো ফিরিয়ে আনা অসম্ভব।

উদ্বিগ্ন লাগ্‌ছে ঠিকই, বিশেষত এই চাপ্‌রাশীটার তারতম্যের ব্যবহারে উদ্বেগ বেড়ে গেছে; কিন্তু সে নিরাশ হয়নি; অপেক্ষা কর্‌তে জানে, নইলে সিদ্ধি অসম্ভব। দর্শনার্থী আর একজন সায়েবী

পোষাক পরা লোক এসে গেছে ইতিমধ্যে। সেও তার নাম লেখা কাগজখানি ধরিয়ে দিয়েছে চাপ্‌রাশীর হাতে এবং মুখ নীচু করে মেপে মেপে পা ফেলে খট্‌ খট্‌ শব্দে টহল শুরু করল বলিদত্তর বিপরীত দিকে।

দু'জন দু'দিকে মুখ করে খট্‌ খট্‌ খট্‌। চাপ্‌রাশী ব্যাপারটা উপভোগ কর্‌ছিল। এবার সে বটুয়া খুলে পান সাজতে শুরু করল। থেকে থেকে তাকাচ্ছে দু'জনের দিকে। কেউ জিজ্ঞেস্‌ কর্‌তে চাইলে সে তা'র খিক্‌ড়ে হাতের ইশারা করে, রোয়াকের ট্র্যাফিক্‌ থপ্‌ করে বন্ধ হয়ে যায়। গান বাজনার তালের ফাঁক দেখানোর মত সে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করে কুঠ্‌রীর ভিতরের দিকে। এতেই যথেষ্ট, তারপর সে আবার পান সাজে, বাবু্‌ ভায়াদের টহলদারী দৃশ্য উপভোগ করে।

করুক্‌ ওরা পায়চারী ; পুরনোকালের চাপ্‌রাশী ভাবে এতেই তা'র ইজ্জত্‌ বাড়ে। সে বুড়ো হয়েছে, চোখের পাতা সাদা হ'ল, সীসার মত চোখের রং। কঠোর নিয়মে ছাঁটাই করা দাঁড়ানো কাঁটার মত সাদা সাদা গোঁফ্‌, মাথার পাগ্‌ড়ী প্রকাণ্ড, লাল-হল্‌দে-সাদা রং-এর সমাহার ; দেহে যাত্রার পোষাকের মত লম্বা লাল কোট, তার ওপর আড়াআড়িভাবে চওড়া, মোটা, ডবল পট্টি, তা'তে পিতলের খুব বড় চাক্‌তি ঝক্‌ ঝক্‌ কর্‌ছে, তার ওপর কোম্পানীর নাম লেখা।

ভিতরে সায়েব, বাইরে টহলদার দর্শনার্থী, মাঝখানে সে, সে চায় পরিস্থিতির গাম্ভীর্য।

বলিদত্ত তা'র কাছে গিয়ে আবার একবার ধীরে ধীরে অনুনয় কর্‌ল—"যাও, একটু।"

"হুঁঃ!"

"যাও না, জরুরী ব্যাপার ; ওদিকে কোম্পানীর কাজ নষ্ট হোক্‌, আর আমি এখানে অপেক্ষায়—সাহেব জান্‌লে বিরক্ত হবে।"

চাপ্‌রাশী তার অজ্ঞতা দেখে এক মুহূর্তের জন্য ভাবল—হাসে। ঠোঁটের বাঁক্‌ পর মুহূর্তেই সোজা হয়ে গেল। গাম্ভীর্য নষ্ট করে দুর্বলতার প্রশ্রয় সে দেয় না। গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়ে বল্‌ল "জানো না, ও বাঘ।"

"এঁ্যা?"

"রক্তখেকো বাঘ।"

বলিদত্তর বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল। হয়ত আগন্তুকের বুকের

রক্ত, মুখের তেজ শুকানোর জন্য এসব ব্যবস্থা, যাতে ভিতরে ঢোকার সময় তার দফারফা হয়ে যায়।

হঠাৎ ঢং করে বেজে উঠল কলিং বেল্। ভিতর থেকে বজ্র-নির্ঘোষ শোনা গেল—"কো হ্যায়, কো হ্যায়।"

ধড়ফড় করে দৌড়লো চাপ রাশী, ভিতরে শোনা গেল তা'র গদ গদ প্রত্যুত্তর—"হুজুর।"

বলিদত্তর বুকের ওপর হুম্ করে যেন চোট্ পড়ল ; সে ভাবল—"এই কি শুভক্ষণ, এ কি শুভ!" মাথার ভিতর ঘূর্ণির পাক—"কো হ্যায়, কো হ্যায়।" "কোই হ্যায়" এর সায়েবী সংস্করণ। মুখ তার ঘামে ভর্তি, সে ঠেস্ দিল দেওয়ালের গায়ে।

মনের ভিতরে কোন্ অজ্ঞাত চেতনায় খবর পৌঁছে গেছে—এবার তার ডাক পড়বে। অনুভব করল—ভাবনাগুলো উল্টে পাল্টে যাচ্ছে, শরীর কাঁপিয়ে একটা অজানা ভয়। ভিতরে সায়েব, তার গতিমুক্তির অধিকারী ; তার দানাপানির ব্যক্তিত্বকে কলমের এক খোঁচায় মারতেও পারে, তারতেও পারে। দানাপানি, ওঃ, কী দরিদ্র সে। যেন একটা নরভুক্ সরীসৃপের কালো কালো গিঁট্-ওয়ালা শরীর পাকিয়ে ধরেছে, চেপে দিচ্ছে, পিষে ফেলছে তাকে ; ঘাড় টিপে ধরেছে, গলা আঠা-আঠা। রুমাল বের করে রগ্ড়ে রগ্ড়ে মুখ মুছল সে, নিজেকে যথাসাধ্য তৈরী করল। তবুও অপ্রস্তুত ; বলিদত্ত যেন বলির পশু। চাপ্রাশী সত্যিই ছুটে এসে হাত দেখিয়ে জানাল, ডাক্ পড়েছে তার।

ঝড়ে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে এমনিভাবে সজোরে পর্দা ঠেলে সে ভিতরে ঢুকল, চৌকাঠে টপ্কে দূরে তাকিয়ে কাঁকাল ঠেকিয়ে সেলাম্ জানাল—"গুড্ মর্নিং, স্যার, ইয়োর অনার।"

দূর থেকে জবাব এল "সীট্ ডাউন্, সীট্ ডাউন্—বসে পড়।" বলিদত্ত অবাক্। বসতে হ'লে কাছে যাওয়া দরকার। যাবে কি? সায়েবের মুখ নীচের দিকে, ফাইলের ওপর।

"সীট্ ডাউন্—ইউ হিয়া"—

আদেশের প্রচণ্ডতা যেন তার কাঁধ চেপে মাটিতে বসিয়ে দিতে চায়। কোট-প্যাণ্ট সহ বলিদত্ত হকচকিয়ে সেই মেঝেতেই বসে পড়ল 'সীট্ ডাউনে'র তুফানের তলায়।

"ইডিয়ট" সায়েবের গর্জন "কাম হিয়া।"

কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চলল বলির পশু, কান ভোঁ ভোঁ করছে।

সায়েব তার নাম লেখা চিরকুট্ তুলে, সেটা থেকে চোখ উঠিয়ে তার চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বোধহয় আশিখরপাদনখ।

বলিদত্ত কাঁপছে ত' কাঁপছেই। কাঁপতে কাঁপতে ব্যাকরণ ভুলে অশুদ্ধ ইংরেজীতে গাইতে লাগল নিজের গাথা, সে এসেছে; আসতে না আসতেই কাজে জয়েন্ করেছে। প্রাণপাত পরিশ্রম করবে সে; তার ভুলচুক্ সায়েব যেন ক্ষমা করেন, এইসব কত কী! —পাঁচ মিনিট ধরে—

সায়েব শুধু বললেন "য়েস্।"

"য়েস্" মানে সে জানে "হ্যাঁ", জানে না, সায়েব "য়ে-স্" বললে বুঝতে হবে "ভাগো।" তাই সে দাঁড়িয়ে রইল।

গম্ভীরভাবে সায়েব জানতে চাইলেন "কোথায় এসেছিলে?"

"হুজুরকে প্রণিপাত জানাতে।"

"প্রণিপাত ত' হয়েছে, আর কি?"

"কিছু না।"

"যেতে পার; কাজ কর গিয়ে, বুদ্ধুর মত তাকিয়ে কেন? যাও।" হঠাৎ বলিদত্ত অস্থির হ'য়ে বলে ফেলল "হুজুর"।

'গে আউ্, য়েস্।"

গেট আউটের ঠেলায় এক লাফে সে বাইরে এল। হাবেভাবে বাঁধা রেখে এল তার ব্যক্তিত্বের টিকি তাঁর পদতলে। বাইরে আসতেই চাপ্‌রাশী পাক্‌ড়াও করল—"বকশিস্?"

ব্যক্তিত্বের দফা নিকেশ হয়ে গেলেও, বাইরে এসে খোলা মেলায় নতুন ধারণার হাওয়া লেগে আবার তা' ফুলে উঠছে; বারংবার নিজেকে নিজেই সজাগ করছে—সে অফিসার্, সে যে সে লোক নয়, তা'র প্রবণতা অনেক, বৈশিষ্ট্য বহুবিধ। সারি সারি পায়রা খোপে কেরানীরা বসে কাজে ব্যস্ত—এতগুলি মুখ, এতরকম বেশভূষা—এদের চেয়েও উঁচুতে সে; কবে কোন্ পরিস্থিতিতে এদের কা'র দানাপানি তা'র কলমের আগায় থাকবে, কবে কোন্ সোনালী বেলায় কারুর সে হ'বে ভাগ্যবিধাতা! সে—

মুখ তুলে তা'রা দেখছে, কৌতূহলী চোখগুলো, তা'তে সম্ভ্রম পরিস্ফুট। তা'রা নিরীক্ষণ করছে তাকে।

আর ত' ঘণ্টাখানেক; তারপর অবশ্য চারদিকে রটে যাবে তা'র নাম; কেবল এই আপিস ঘরে নয়, বাইরে শহরে; শহরে আগন্তুক মফস্বলী লোকেদের মুখে মুখে ছড়িয়ে যাবে তা কোন্ দূরদূরান্তরে।

এ অঞ্চলে কোম্পানীর পরাক্রম আছে, আছে প্রতিপত্তি—ঐশ্বর্যে, ক্ষমতায়, ব্যবসায়ে ও বলে। তাঁরও সংজ্ঞা এই এতগুলি উপাদানের বাইরে নয়, এতেই সে সীমাবদ্ধ।

নির্জন কুঠিতে পর্দার পিছনে অপদস্থ হওয়া—কোম্পানী-কুঠির চওড়া বারান্দায় জুতো মচ্ মচিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় সে ধর্ষণের অপমান ক্রমে ক্রমে মুছে যাচ্ছে। ঘটনার ওপর বিচারের চাপ পড়ে হৃদয়ের ভৌতিক গুহা থেকে উঠে সে আসছে বিবেচনার উন্মুক্ত ক্ষেত্রে, সেখানে মনের অভিমান নেই; আছে কারণের সমষ্টিতে ফলগণনা, তা মনকে স্পর্শ করে না।

সেই বিচারের মাপকাঠিতে অপদস্থতার পরিমাপ করে বলিদত্ত উপলব্ধি করছে—'এ কিছু নয়; কিছুই ঘটেনি; কিই বা ঘটেছে?' সায়েবের পিছু পিছু কেরানী জীবনে এসব অনেক তা'র দেখা। মোটা পর্দার আড়ালে নির্জন কুঠিতে কত বড় বড় লোকের কত ধরনের সৎকার হয়—সায়েবের ষাঁড়ের মত গর্জন, হাকিমের মুখের ভ্রূকুটি, সৃষ্টিছাড়া, সকল সীমা লঙ্ঘন করা দুর্ভাষার তাণ্ডব—কাগজে সে সব আঁকা হয় না, পর্দা টপ্‌কে বাইরে তা মুক্তি পায় না। অপমান, ধর্ষণ হজম করে হংসের মত পিঠ ঝাড়া দিয়ে বাইরে এসে বড় বড় লোকে অম্লান বদনে বলতে পারে—সায়েব খু-ব খাতির করল, সুখদুঃখের কথা জিজ্ঞেস্ করল; কি স্নেহ, কি সহানুভূতি!

লোকে শুনে প্রশংসা করে; চুপচাপ গালমন্দ গিলে বাইরে এসে যদি বলা যায় "তারিফ পেয়েছি" তবে লোকে নিজে অন্যদের চোখে সম্মানার্হ হয়, ঠিক যেমন ব্যবসাদার মুখে হাজার হাজার টাকার নাম করে অন্যের বিশ্বাস জন্মিয়ে অন্যদের কাছ থেকে টাকা জড়ো করে। তাই ত' 'ট্যাক্‌ট'—'সাক্‌সেস্' শাস্ত্রের নীতি। পরাজিত হয়ে, পরাজয় মানলে লোকে ধীরে ধীরে নীচেই নেমে যেতে থাকে, তার আর জয়ের আশা থাকে না। কিন্তু পরাজয়কে জয় বলে চালিয়ে দিয়ে যে আপন মনের ফন্দিবাজি দেখাতে পারে, অপমানিত হয়েও সম্মান পেয়েছে বলে রটিয়ে দশজন বন্ধুকে ডেকে ভোজ খাওয়াতে পারে, তাকেই ত' বলিহারি দেয় সকলে; সে কি না পারে? বর্ষার ছাঁটের দিকে ছাতা দেখানোই শুধু নয়, পিঠকে কুলো করাও সাফল্যবাদের অমোঘ নীতি। আর কুলো বলাই বা কেন? ওপরওলা সায়েবের কাছে যদি গালিই না মিলল, তবে গালি দেবার শক্তি আর কা'র থাকে? গালি দিতেই বা পারে কে?

এইসব ভাবতে ভাবতে বলিদত্তর মুখে ভেসে উঠল তা'র বাঁকা, ব্যবসাদারী হাসি ; তা হাসি না হলেও, দেখায় হাসির মতই।

এবং সর্বাদৌ আপিসের চিনির বলদ বড়বাবুর কাছে যেতে যেতে তা'র পরিপূর্ণ বিশ্বাস হ'ল—সে নীতিতে অটল থাকবে, অচিরে সেই নীতিবলে ভালুককে নাচাতে পারবে সারেঙ্গী বাজিয়ে, যত বড় পাহাড়ী ভালুকই হোক না কেন !

বড়বাবু অফিসার শ্রেণীর নন, কেরানী বংশের—যদিও উঁচু পায়ার। আপন শ্রেণীর নন বলে কোম্পানীর অনেক অফিসার তাঁকে বেখাতির করেন ; তাঁর গুরুত্বকে ব্যঙ্গ করেন। তাঁদের চোখে তিনি বেজাত, তাঁর সঙ্গে মেশামিশিতে পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে যেন। কিন্তু সাফল্যের ছাত্র বলিদত্ত দাস নিজের অতীত জীবন থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করে পেয়েছে ভিন্ন তথ্যের সন্ধান ; সে বুঝেছে কেরানীও হাসতে পারে এবং আপিসের বড়বাবুর হাসি—শান্‌দেওয়া হাসি ; তা ফাঁপা নয়। যে কোনও কোম্পানীর, যে কোনও অনুষ্ঠানের মূল কারিগর হ'ল কেরানী—সেই আধপেট খেয়ে কর্মরত জীর্ণশীর্ণ প্রাণী, পরিশ্রমের দাপটে যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভ্রান্ত, ফের বাসায় ফাইল এনে মিট মিটে লণ্ঠনের আলোয় হাঁটু মুড়ে বসে মাদুরের ওপর ; যা'র মাইনেয় মাসের পনের দিন যায় না, যা'র নজর ফাইল টপকে বাইরে যাওয়ার অবসর পায় না যাতে তা'র চোখে পড়ে অনটনের ঘরকন্নার যোজনায় গিন্নীর কত রক্ত জল হ'ল, কত আয়ু ক্ষয় হ'ল, বাচ্চারা কিসে হ'ল পারঙ্গম—পড়ায় ? না ঘুড়ি ওড়াতে ? সেই নিরীহ জীব—যে জোয়াল নামিয়ে রেখে আসতে আসতে জীবনও রেখে আসে নিজের চেনা টেবিলের ওপর ; তাই পেনসনের টাকা উপভোগ করে কোম্পানীর ওপর নিষ্কর্মা বার্ধক্যের দায় চাপিয়ে ফাউ খেতে বেশীদিন বেঁচে থাকে না। কেরানীই সব কাজের কর্মী, লাল ফিতার ব্রহ্মা ; অফিসার শুধু মারে দস্তখত্।

তাই বড়বাবু প্রসন্ন থাকলে সায়েবের প্রসাদ অর্জন দূর বা দুরূহ হয় না। অপ্রসন্ন হ'লে, কোথা থেকে কোথা থেকে ঘটনা ঘটে যায়, কেরানীর কেরামতি রটে নাকো কাগজে। কিন্তু সে কেরামতির ফল ফলে, অবশ্য আপিসের টাইপ যন্ত্রে, সায়েবের দস্তখতে।

অতএব, "নমস্কার আজ্ঞে ! কেমন ? ভাল আছেন ত' ? আমি আজই এলাম ; ভাবলাম, আগে যাই দেখা করে আসি, বুঝলেন না—হাঃ হাঃ—"

বড়বাবু তড়াক্ করে উঠে পড়লেন "আরে, আপনি! বসুন, বসুন। ওরে, চেয়ার দে একটা। আপনি বসুন আজ্ঞে, দাঁড়িয়ে রইলেন যে—"

"আঃ, দাঁড়ালে কি হয়েছে? এ ত' ঘরোয়া ব্যাপার, বসুন আপনি, বড়বাবু! ওঃ এত ফাইল? এত কাজ? এত কাজ করেন আপনারা? নিন্"—বলে পান এগিয়ে দিল বলিদত্ত।

"কাজের কথা আর বল্‌বেন না, আজ্ঞে। সে কথা কে বোঝে? শুনে শুনে ন' ন'টা ডিপার্টমেণ্ট আমার চার্জে; সায়েব বারংবার লিখবে—"জরুরী" "জরুরী"। আর আমি নিজে সব না দেখলে কিছু যদি হয়! যতই বাত্‌লাই না কেন, সব ভুল করে। নিজে তা ঠিক না করে সেই ভুল সুদ্ধ কাগজ ওপরে পাঠালে আর রক্ষে আছে?"

"আমি জানি বসন্তবাবু, সব শুনেছি। আপনি একা এতবড় আপিসের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে চালাচ্ছেন—ওপরওলারা খালি সই করেন, না আর কি?"

বসন্তবাবু হাস্‌লেন; বিনয়ের ভঙ্গীতে বল্‌লেন—"তা কি করে হয়, বলুন আজ্ঞে? যতই হই, আমরা ত' কেরানী বটে! অফিসার যা বল্‌বেন, তা'ই ত' হবে। আমাদের নিজেদের কি আর এমন কৃতিত্ব? বুদ্ধি ত' আপনাদের।"

"আপনার এই বিনয় থেকেই জানা যায় আপনি কত অভিজ্ঞ। তবে, আমাকে আর লুকোবেন কি? আমিও ত' কেরানী ছিলাম। 'মারে সিপাহী নাম হয় সর্দারের।' এই ত' বাস্তবিক, কে দেবে এই খাটুনির দাম?"

ততক্ষণে নথিপত্র হাঁটকে একটা কাগজের দিকে তাকিয়ে "এ নোট কে লিখেছে, বসন্তবাবু? আপনি ত'? নিশ্চয়। জানা যাচ্ছে লেখার ঢঙে। আঃ, চমৎকার! কি খাসা ভাষা! এদিক থেকে ধরলে মানে হয়—'হ্যাঁ'। ওদিক থেকে—'না'। তিন তিনটে মানে—বাঃ। ইংরেজী ভাষার বাহাদুরি এখানেই। আর কী কমপ্যাক্ট ঠাসা নোট, একদম ফাঁপা নয়। ফ্যাক্টস এণ্ড ফিগারস-এ জমাট। সায়েব ত' চোখ বুঁজে সই করবে বিনা ওজরে। নাঃ, আপনার কাছে আমার অনেক শেখার আছে। আপনার অসুবিধা না হ'লে, মাঝে মাঝে আসব, দেখব বসে, চমৎকার নোটিং—।"

বসন্তবাবু বসে, মৃদু মৃদু হাসছেন্।

এই ফাইলের ওপর, ব্যবসাদারী চিঠিগুলোয় তিনি রেখে যাবেন তা'র শিল্প-কলা, কেউ তা বোঝে? ক'জন তা পড়ে? জাগ্রত জীবনের সমুদয় বুদ্ধি, সমুদয় কল্পনা দিয়ে গড়ে দিয়ে গেলেন নিজের সৃষ্টি, হোক্ তা চিঠির নোটিং, গোটা কতক হিসাবের বিন্যাস। তবুও শিল্প তা। তা'র বিকাশের জন্য বহু সাধনা চাই। পুরনো ফাইল হাঁটকে বহু প্রাচীন লেখা দেখে দেখে লেখ্‌বার কায়দা মক্স করতে হয়েছে। চাকরীর কাজে কত বই মুখস্ত করে, ডিপার্টমেণ্টের আইনের কত অর্থ, অভিধান থেকে আবিষ্কার করে কত কত খাতায় টুকে রেখে হাসিল করেছেন দরকারী জ্ঞান। দপ্তরীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নিজে আঠা লাগিয়ে সাময়িক সংশোধনীগুলি বইতে সেঁটে সেঁটে নিজের চাকরী-জ্ঞান করে রেখেছেন একদম নব্য, আধুনিকতম। তারপর প্রত্যেক নোট্, প্রতি মুসাবিদা করার সময় কত গবেষণা, মরমী লোকেই শুধু তা জানে।

কে'ই বা বোঝে? কাগজ তাদের কাছে শুধুই কাগজ।

এত দিন পরে পাওয়া গেল একজন—যে বুঝবে।

বসন্তবাবুর মন নিজে থেকেই নরম হল বলিদত্তর দিকে; অতি বিনয়ে মধুর হেসে বল্‌লেন "সায়েব আমার সব লেখা পাশ্ করে দেয়, আজ্ঞে। কতবার তা'র ওপর টিপ্পনীও লিখেছে—'ভাল, খুব ভাল, ধন্যবাদ'। দেখাব আপনাকে একটা?"

"তাই নাকি? এই সব লিখেছে? বাস্তবিক? আপনি আশ্চর্য—"

বসন্তবাবু বললেন "এ সায়েব কাজ চেনে।"

বলিদত্ত এই জন্যই অপেক্ষা করছিল—সায়েবের কিছু প্রশংসা শুনতে। প্রত্যেক ওপরওলার কতকগুলো গুণ আবিষ্কার করে তা দশজনের কাছে চাউর করা—এ হচ্ছে তা'র মতে চতুর কর্মচারীর নিতান্ত কর্তব্য। তা হলে দশজন জান্‌বে যে সে ওপরওলার নিজের লোক, সুতরাং সম্মান করবে। তা'দের কানাকানি থেকে কথাটা গড়াবে বহু দূর—কালক্রমে ওপরওলার কানেও যাবে। ইচ্ছা থাকলে, অনেক কথাই আবিষ্কার করা যায়—কার চেহারা খাসা, কার বা সুন্দর পোষাক, কারুর বিদ্যা, লেখাপড়া না থাক্‌লেও কারো বা চতুরতা—নানা কথা এই ধরনের।

কিন্তু আকার ও আকৃতিতে যে একটা কাঠের খুঁটি, ভাষা যা'র

বাজের আওয়াজ, তার সম্পর্কে প্রশংসার কিই বা আবিষ্কার করা যায় ?

"এ সায়েব কাজ চেনে"—'সীট্ ডাউন্ থেকে গেট্ আউট্' তক্ —চোখে ভাসে সেই ঘরে যা যা ঘটেছিল। না, নিজেকে সে দুর্বল হ'তে দেবে না। যে একবার ভুল করে, তার ক্ষমা নেই। মুখে ভারী খুশীর বিহ্বলতা ফুটিয়ে তুলে গদগদ হয়ে বলিদত্ত বলল—"কাজ চেনে ? আঃ, দেবদুর্লভ গুণ ! আমারও তাই মনে হচ্ছিল। মানে—আজই ত' প্রথম দেখা, আগে কখনও দেখি নি ওঁকে। হঠাৎ সে যে কী সমাদর—কি আর বলব আপনাকে ? মোটে দু'চারটে কথা বলেছি—অমনি বলে উঠলেন, 'বাঃ, ভারী চালাক্ ত'; বেশ্ বেশ্; এম্নি লোকই আমাদের চাই।' বুঝলাম্, কাজ চেনে।"

হাঁ করে চেয়ে আছেন বসন্তবাবু—তিনি থ'।

লোকটা পাগ্লা না কি ? মিষ্টার শা' সমাদর করলেন ?

কিন্তু বলিদত্ত বলে চলেছে—"বললাম—'নতুন লোক আমি। অনেক কথা জেনে নিতে সময় লাগতে পারে।' উনি কি বললেন, জানেন ? বললেন্ 'যখন যা কিছু অসুবিধা হবে, চলে যেও আমাদের আপিসের বড়বাবু বসন্তবাবুর কাছে—অতি পাকা লোক।' বুঝলাম্, কেবল যে কাজ চিনতে পারেন তা নয়, বিচারবুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম।"

এতক্ষণে বসন্তবাবুর হাঁ বুঁজল। কেন বুঝতে পারছিলেন না ভেবে নিজের বোকামির ওপর নিজেরই রাগ হ'ল। সত্যিই, এ বলিদত্ত দাস তাঁকে কি না ভেবে থাকবে ?—এত বড় বুদ্ধু ! নিজের গত্ নিজে বাজাতে জানেন না ?

হঠাৎ তিনি শুরু করে দিলেন সায়েবের প্রশস্তি—"দেখবেন 'খন আপনি, এমন সায়েব কোটিতে একটাও মেলে না। মুখে কখন সখন কড়া। কিন্তু এমন লোকও ত' আছে—যারা মুখমিষ্টি, কিন্তু হাতে না মেরে ভাতে মারে। আমাদের সায়েব দয়ার অবতার, কারুর দানাপানির গুড়ে বালি দেয় না। এত জ্ঞান, এত বিবেচনা, এত ঠাণ্ডা মাথা ! আঃ, উনি অদ্ভুত, অতি অদ্ভুত।"

কথা গড়িয়ে চলল—সশব্দে।

কখনও বলিদত্ত, কখনও বসন্তবাবু; কখনও সমস্বরে উভয়ে—যুগ্ম সঙ্গীত, কর্তার প্রশস্তি। নিজেকে ছোট করে তাঁকে বড় করা, অতি বড় এমন কি অতিমানব করা। পাঁচমিনিটের আলোচনা,

দশ মিনিট পেরিয়ে গেল ঃ— তিনি জ্ঞানী, পারদর্শী, দয়ালু, বলবান্ ; তাঁর সন্তানেরা মেধাবী, তাঁর স্ত্রী গৃহলক্ষ্মী, তাঁর কুকুর কুকুরশ্রেষ্ঠ, তাঁর গরু—সুরভী !

যৌথ প্রশস্তির প্রতিযোগিতা—যেন দুই ভাট্ ।

অথবা ওরা দুই শিয়াল, কাছাকাছি মুখ এনে জুড়েছে রাতের প্রহর গোনার ডাক্ ।

দানাপানির কাদাটে চেতনায় নাক পর্যন্ত ডোবা প্রাণের বিকল আর্তনাদ ।

এ হরি সঙ্কীর্তন নয়, নয় দেশমাতৃকার বন্দনা, নিসর্গরূপবিহ্বল কবির স্খলিত কাব্য-আবৃত্তি নয়, কৌপীনধারী সাধুর খঞ্জনী সহ ভজনও নয়—এ কেবল ওপরওলার নির্জলা প্রশস্তি । দু'জনের রেষারেষির শেষ নেই—কে বেশী পয়েন্ট আবিষ্কার করে টপ্‌কে গেছে, কে গেয়েছে বেশী প্রশস্তি ।

এর শেষ নেই । এ যেন ঐতিহাসিক ; চলছে যুগ যুগ ধরে ।

এখন দুপুর বেশ । বাইরে ক্ষেতে এক পাল গরু, চরছে ত' চরছেই । রাস্তায় হাঁটছে হাটের পসারী, মজুর, ব্যাপারী ।

মুখে কালি মেখে, তেকোণা গাধাটুপী পরে রঙ্গরসে নেচে নেচে, ঢোল বাজিয়ে সং সেজে চলেছে একদল, সামনে তাদের প্রকাণ্ড কাগজে একটা বিজ্ঞাপনের ছবি ।

চারিদিকে দানাপানির কলরোল ।

সেখানে স্বপ্নই একমাত্র প্রত্যয়, নিদান ভয়ের, আশংকার, জড় স্বার্থের ।

বড়বাবুর সঙ্গে কথাবার্তার পর, বলিদত্ত ভেবে নিল, রেখে গেল সে একটা বাঁধ, দরকারের সময় কাজে লাগবে ।

সে চলে গেলে পর বড়বাবু মুচ্‌কি হাস্‌লেন ; তাঁর ধামাধরা দীনুবাবু জিজ্ঞেস করলেন "ব্যাপার কি, আজ্ঞে ?"

"বুঝবে পরে ধীরে ধীরে" বসন্তবাবু বল্‌লেন—"কিন্তু চিনে রাখ একে, অনেক এগোবে, বড় তুখোড় ।" এবার, অন্য বড় কর্মচারী ; নতুন কেউ এলে শিষ্টাচারের খাতিরে একবার দেখা করা নিতান্ত কর্তব্য । তাই বলিদত্ত তাঁদের দিকে এগোল । টেনেটুনে একটা সমতা-বোধ মনে আনতে পারলে প্রচুর আনন্দ হয় । ঈর্ষাও হয়, আগেই সে আসেনি কেন ?

প্রাচীন বটগাছের ছায়ায় কোম্পানীর বড় আপিস, কাজে গম্

গম্ করছে। সারি সারি ঘর, খোপে খোপে কুঠ্রী, কত লোকজন, ভীড়ের লোকের মাথায় মাথায় থালা পিছ্লে চলে যাবে অনেক দূর। এখানে খালি বিজনেস্—ব্যস্ততা। আর আছে বড় বড় চিম্নি, তা' থেকে ভোঁস্ ভোঁস্ করে ধোঁয়া ওঠে; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কলকব্জা, যেন অসুরের সৃষ্টি, হাজার হাজার শ্রমিক, তারা কাঁচামাল বানায়, কলকব্জাও চালায়। সে সব এই আপিস অঞ্চল থেকে খুব দূরে। এখানে শুধু কর্তৃত্বের কল, কাগজপত্রের কারবার, মাথার কাজ, নিষ্পত্তি পরিকল্পনা। কোথাও কোথাও এই রকমের সহস্রবাহু কেন্দ্র হ'ল কোম্পানীর হৃৎপিণ্ড।

লোকে এখানে করে দানাপানির আহরণ ও অপহরণ; কাউকে দানাপানি জোগায়ও। নীরবে এ সবের দাম কমে বাড়ে। যখন দাম বাড়ে, তখন অপরের আহরণ শুষে নেয় অগস্ত্য গণ্ডূষে। ঘরে ঘরে আগের মতই সাজানো—ভাতের থালা, গেলাসে জল, আসন পাতা—। অথচ সে সবের বারো আনাই লোপ পেয়ে যায় দর-দামের যাদুমন্ত্রে। অবাক চোখে গৃহস্থ চেয়ে থাকে—থালা আছে, ভাত নেই, জানে না—কে নিল, কেমন করে নিল তা।

তথ্য জানে না ক্ষেতের চাষী, কলের মজুর, আপিসের কেরানী—যাই হোক ওদের নাম, ও'রা কিনে খাওয়া লোক, কেবল জানে দর চড়লে হু হু করে, তা'র সেই মেহনতই বজায় থাকে, কমে না—কিন্তু খেটেখুটে যেখানে পাচ্ছিল আট বস্তা চাল, এখন সেখানে দেড় বস্তা। কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে ভগবান স্মরণ করে, ঠাকুরকে ডাকে, কবে শেষ হবে এ কাল!

সেই অর্থনীতির অন্ধকার ইন্দ্রজাল থেকে কিছু অংশ গড়া হয় এই আপিসঘরে, আর কিছু কিছু অন্যত্র। কিন্তু গোড়ায় উপাদান সর্বত্র একই।

এ সেই প্রাচীন বটগাছ। এ ইতিহাস দেখেছে—

রণোন্মত্ত কলিঙ্গে যোদ্ধবেশ; সাম্রাজ্যবাদী, জাতীয়তাবাদী জনতার সমরসজ্জা। আবার, অহিংস, ধর্মভীরু জাতি, অশোকের অনুশাসন, চৈতন্যের সঙ্কীর্তন।

বটগাছ বেড়ে উঠেছে।

আজ সে দেখে কোম্পানীর আপিস, ব্যবসার জন্য জীবন ধারণ, দানাপানির জন্য সমাজের ভিত্তি। জীবনের অর্থ এখন ঠিক করা হয়—দাঁড়িপাল্লায়।

বটগাছ দেখছে বলিদত্তকে—। আকারের তারতম্যে সে ছোট, চারফুট ন' ইঞ্চি। সে চায় না ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। সে চায় না নির্বাণ, খোঁজে না সমাধিযোগ বা পরলোক।

দ্রুত প্রমোশন চায় ক্ষুদ্র বলিদত্ত দাস, অর্থ চায়, চলন্ত গতিতে প্রতিপত্তি চায় যেমন ওপরওলা তেমনি অধস্তনদের কাছ থেকেও। এই উদ্দেশ্যে বাঁচা তাকে যতটা মদত্ দেবে, ততটুকুই হবে তা'র জীবন, সুন্দর জীবন।

আশা, কী আশা তার? প্রাচীন বটগাছতলায় সে চলেছে, তারই শ্রেণীর কর্মচারীদের খোঁজে। তখন তা'র মনে নেই—সরোজিনী, বাসাবাড়ী, কিছুই মনে নেই। এই জনসমুদ্র যেন অন্ধকার বন, এখানে সে দেখছে নিজে যেন একটা জোনাকী, উড়ে যায় ওপরে।

□

থাক্ থাক্ করে মুখোমুখি সাজানো আয়না, অতি কাছে; আবার দূরেও। দূরেরগুলোয় নিজের ভবিষ্যতের, বয়সের মাপ। কিন্তু গতি ত' শুধু সময়ের একচেটে নয়, মনেও গতি আছে, গতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন। বিভিন্ন দূরত্বে মনের পরিবর্তনের আভাস দিতে আয়নার কাঠামোতে আছে কিছু অসাম্য। ফলে, প্রতিফলিত ছবিতে বৈষম্য ঘটে। কোম্পানীর আপিস-বাড়ীতে সমশ্রেণীর বিভিন্ন কর্মচারী যেন আয়নার বিভিন্ন ছবি। বলিদত্ত একটি থেকে অন্যটির দিকে চম্‌কে চাইল। সব ছবিই তা'র, তা'রই ভবিষ্যৎ তারা, তা'রই বিভিন্ন অবস্থা। মনে পড়ে ছোটবেলা একবার ছ' পয়সার টিকিট কিনে সে ম্যাজিক দেখতে গিয়েছিল। ত্রিপলে ঘেরা ম্যাজিকের চত্বর, ভিতরে ছোট ম্যাজিকের ঘর; যেদিকে তাকাও, কেবল নিজের অগুনতি ছবি দেখবে। কিন্তু সে সবই কি নিজের? যেন এক অদ্ভুত কৌশলে নিজের বিভিন্ন অবয়বকে ছোট বড় করা হয়েছে। নিজের শরীরের আলোছায়া দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে ফের ফিরে আসছে নিজের কাছে, দেখাচ্ছে নিজত্বের বিভিন্ন বিকার। কৌতূহলী হয়ে সে ঢুকে গিছল—পেয়েছিল ভয়। ফেরার সময় জটিল ভাবনায় জড়ানো লাটাইয়ের মত ফিরে

এসেছিল, গুম্ হয়ে।

আজ নিভৃতে মনে ঠেলে ওঠে, উঁকি মারে সেই হারানো অনুভূতি, যদিও পরিস্থিতি পৃথক্। ঘরে ঘরে কোম্পানীর অফিসার; কেউ বছর খানেকের, কেউ বা কুড়ি বছরের পুরনো। নতুন অবস্থার সমতার দরুন সে তাদের মধ্যে দেখে নিজেকেই। কিন্তু বর্তমান-কালের-মনের গড়ন ভবিষ্যৎ দৃশ্যের বিভিন্নতার সঙ্গে তাল রাখতে অক্ষম, বলিদত্ত তাই একটা বেতালা অনুভূতি, বিহ্বল হয়।

তারপর শুরু হয় বিশ্লেষণ, আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে। কারুর কারুর কিছু কছু অংশ সে ছেঁটে ফেলে। মনে মনে, কাউকে এড়িয়ে এগিয়ে যায়। এই যে এত রকম বর্ণপ্রকর্ষ, এ সবই এক এক করে ভবিষ্যতে হতে পারে তারই, কিন্তু তা' সবই ত' সে চায় না। বিভিন্ন এই সব কয়েকটি রূপ সে আদর্শ বলে বেছে নিতে পারে, কারুর বা দু' একটি গুণ মাত্র। অন্য কয়েকজন—ভাগ্যচক্রে তা'রা অফিসার হ'লেও নিজের হিসাবের বইতে তাদের উল্লেখ করা দরকার মনে করে না সে। সে যাই হোক্, যে যত উপরেই থাক্, বলিদত্তর মতে, মূর্খতা সর্বত্র আছে; জীবনের প্রত্যেক স্তরে; আরও ওপরে উঠবার সুযোগ থাকলেও পড়ে থাক্‌বে অনেকে যারা নিজের মূর্খতায় আর ওপরে উঠতে পারবে না, বরং নীচেয় খস্‌বে।

তা'রা তা'র সাফল্যের পরিকল্পনায় উপরে উঠবার সিঁড়ির পায়ে-দাঁড়ানো এক এক ধাপ্। পিষে চট্‌কে সে চড়ে যাবে, পিছন ফিরে তাকাবে না।

কিন্তু মাথায় পা দেওয়ার আগে, কাঁধে হাত ফেলা নিতান্তই চাই। তাই মনে অতি উত্তুঙ্গ উচ্চাশা পুষেও মুখে সে অতি সাধারণ। শুধু কথায় নয়, তা'র ভঙ্গীতেও বশীকরণের প্রয়াস। সর্বত্র সে শিষ্যত্বই করবে। মার্জারও ত' জরদ্‌গবের শিষ্য হয়েছিল। প্রাচীন বটগাছের তলায় এ কুঠি থেকে ও কুঠি যাওয়ার সময় হিতোপদেশের বুড়ো শিমুলগাছের কথা তার মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে সেই কাহিনীটি। ব্যবহারের ভিতর দিয়ে উন্নতি হাসিল করার কায়দা কি শুধু ইংরেজী বইতেই আছে? বলিদত্ত ভাবছিল, অতি সরল চাণক্য শ্লোকে, হিতোপদেশের গল্পে, গেঁয়ো ছড়া-কিংবদন্তীতে আছে যুগে যুগে সংসারী লোকের অভিজ্ঞতার সার, সাফল্যকামীর জন্য অমোঘ নীতি! সংসারে এত লোক—তবু একদল যদি কাঠ, অন্যেরা আগুন; একদল খরগোস ত' আর একদল নেকৃড়ে; একদল যখন

ধর্মের বেগার খেটে খেটে পয়সা কামায়, অন্যেরা মজা করে জমিয়ে বসে রোজ ভোজ খায়। তারা বাহুবলের ছায়া মাড়ায় না, তারা বুদ্ধিজীবী। কিন্তু তাদের ভিতরেও অনেকে নীতির সূত্র সম্বন্ধে সজাগ নয়, কারণ না বুঝে করণিক। তাই যত লাভই হোক্, সে সব শুধু অপচয়। তাঁদের অগ্রগতি কেবল অমিশ্রিত ভাগ্যাধীন। তা'র কিন্তু এমনটি নয়; কারণ, তা'রা ভাবে না; সে ভাবে।

এইখানেই সে দেখে নিজের ভিতর প্রতিভা। নিজেকে বুঝতে পারে বলে লক্ষ লোকের মধ্যেও ফাঁক গলে বেরিয়ে যায় ছোট্ট বলিদত্ত।

বলিদত্তর ইতস্তত ভাব নেই। দু'মনা হ'লে দুই পা দুই বিপরীত দিকে গতি করে, ফল কিছু নেই তা'তে। তা'র মতে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উপায়ের ভালমন্দ বাছলে চল্‌বে না; উপায় আবার কি? হাসি পায় তা'র। যে মাংস খায়, সে জন্তু মারতে পিছোবে কেন? লোকে ভালবাসে ভাল খাদ্য, ভাল জামাকাপড়, দামী যানবাহন, কোঠাবাড়ী, জোতজমি, অথচ তা' অর্জন করতে যাবার সময় উপায় দেখে পিছ্‌পা হয়। ফলে? পরের ও'সব দেখে নিশ্‌পিশ্‌ করে দিন যায়। এই নিশ্‌পিশের দল আবার কখনও কখনও দাবী আদায়ে জিদে জোট বেঁধে গণ্ডগোল করে দুনিয়ার স্বস্তি উল্‌টে দিতে। তা'দের প্রতি তা'র দরদ নেই। পেটে খিদে, মুখে লাজ সে চায় না। মানুষ একদিন না একদিন নিজের ইচ্ছা, নিজের উদ্দেশ্যকে চিনবেই চিনবে। যত শীঘ্র তা' চিনে নিয়ে নিজের পথ কেটে যাবে তত ভাল। উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য যা করলে শীঘ্র সিদ্ধি মিল্‌বে, তা'ই সব চেয়ে ভাল উপায়। তা'র শুদ্ধাশুদ্ধির বিষয়ে চিন্তা করুক, খুঁজে মরুক, বই লিখুক ব্যর্থ হা-হুতাশ-করা লোক; তা'তে কিছু যায় আসে না। সে বলিদত্ত দাস; তা'র জন্ম ভোগের জন্য, সে চাকরী করে টাকাকড়ির জন্য। যা ভাবে ভাবুক গে অন্যে।

এবং খুঁটিয়ে দেখলে বড় বড় ধাপেও সেই দর্শনের প্রয়োগ। উপায়ের কথা ভাবতে বসলে কোম্পানী কোম্পানী হ'ত না, রাজ-নীতিতে এত বুদ্ধি খেলত না।

উপায় সম্বন্ধে ধর্মবোধ কেবল লোকদেখানো, আত্মরক্ষার জন্য প্রচারকার্য। আজ এতরকম অফিসারের ভীড়ে সে নিজেকে বেশ স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে। মুখে শিষ্যত্ব ও আচরণে দস্যি ভাবের

প্রাচুর্য দেখালেও মনের ভিতর অনুভব করতে পারছে ঐশ্বর্য। এক নজরে চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে অতীতের দৈন্য; সে তা শোধ রাবে।

চলেছে বলিদত্ত দাস। এটা জগৎবাবুর কুঠ্রী "আজ্ঞে নমস্কার, আমার নাম বলিদত্ত দাস—" নিজের পরিচয় দিল সে। "আজই জয়েন্ করলাম; এলাম আপনার দর্শন লাভে।" বুড়ো অফিসার জগৎবাবু, দু'টো ধাপ উঠেছিলেন; তারপর ডাঁটা গাছের মত খাড়া, বীচি পেকে পুরনো হচ্ছে ডালপালায়।

"আপনি এলেন, আর আমি যাচ্ছি, আর কি?" জগৎবাবু বললেন "আস্ছে মাসেই পেনসন নেব। তিরিশ বছর হল চাকরী। সেই কোন্ উইল্সন্ সায়েবের আমলে চাকরীতে ঢুকেছিলাম। সে-ই রংএর ফ্যাক্টরী বসাল—। আপনি ত' অল্পবয়েসী দেখছি, আমার নাতির মত। এখন থেকে ঘরকন্না আপনাদের। আমরা চললাম। এবার আমাদের দয়ালু কোম্পানীর পেনসন আর বোনাসের ক'টা টাকাই ভরসা। ওঃ, কী শীগ্গির জলের মত বয়ে গেল দিনকাল। মনে হয় যেন এই ত' সেদিন! এই করেই দিনগুলো গেল, কীই বা করলাম? রাখ্তেই বা কি পারলাম্? পৈতৃক বাড়ীটাও ভেঙ্গে গেল, ক্ষেত উজাড়। তখন সস্তা গণ্ডা— চাকরীতে সেই প্রথম কয়েকটা মাসেই যা কিছু! শহরে ছ'কাঠা জমি আর একটা বাড়ী করে ফেলেছিলাম—এখন তা'র কুড়ি গুণ দাম। সেইটুকুই যা সঞ্চয়, হাঃ হাঃ হাঃ- -

ফোক্লা মুখে জগৎবাবু হাস্তে লাগলেন—ছোট ছেলের মত। সে হাসিতে মুগ্ধ না হওয়া বলিদত্তর সাধ্যের বাইরে। বিশেষত এক্ষেত্রে শত্রুতা নেই।

বলিদত্ত দেখছে, প্রকাণ্ডদেহ বৃদ্ধ, চওড়া কাঠামো, এখনও সবল, চোখে চশমা, কপাল চক্চকে, ঢ্যাপ্সা, মুখে শান্তি। চুল সব পাকেনি, মাজা ভাঙ্গেনি। এক্ষেত্রে বার্ধক্য যেন তারুণ্যের নতুন ভেক্।

চাকামুখো পাকা বুড়ো লম্বা গোঁফওয়ালা একজন কেরানীবাবু নাকের ডগায় চশমার পথে দৃষ্টি চালিয়ে বললেন "সঞ্চয় করেন নি কেন বল্ছেন, আজ্ঞে.? আপনার সঞ্চয় ধর্মবল; সারা পরিবার শান্তিতে আছেন; মেয়েরা ভাল বর পেয়েছে; ছেলেগুলো সব যোগ্য; দশমুখে প্রশংসা। ধর্মই ত' শুধু মহত্ত্ব।"

জগৎবাবু হেসে ফেল্লেন, বল্লেন "ধার্মিক, ধার্মিক বলে একেবারে স্বর্গে তুলো না হে! আমরা বৈষ্ণব, না মহাত্মা? কাজ করে গেছি। চাকরীতে ঢোক্‌বার সময় ঈশ্বরের নাম ছিল মুখে। আজ সব ফেলে রেখে তাঁরই নাম নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। বিচার কর্‌বেন তিনি।"

বলিদত্ত বল্ল "আজ্ঞে, আপনাকে কে না চেনে? চাকরী যদ্দিন, তদ্দিন লোকে মান্য করে। আপনি চাক্‌রী ছাড়লেও জয়-জয়কার ;ধর্মবল, পুণ্যবল—সে সব কোথায় যাবে? হেঁঃ—"

"তাই বলে এই ছোক্‌রা বয়েস থেকেই তুমি আর ধর্ম, ধর্ম কোর না, বুঝ্‌লে? কিছু মনে কোর না, 'তুমি' বললাম।"

"আজ্ঞে, 'তুমি' ত' ছার, 'তুই' বল্লেও আমি খুশী হতাম্—হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ—"

বলিদত্তর পিঠ চাপড়ে জগৎবাবু বললেন "দীর্ঘজীবী হও তুমি। যোগ্য ছেলে। তুমিই উঠ্‌বে। এত অল্প বয়সে যা শিখ্‌তে পেরেছ, আমি বুড়ো হলাম, আমাকে দিয়ে তা হল না ; বুঝলে বাপু, আমার দ্বারা তা একদম্ হল না।"

বুড়ো কেরানীবাবু মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌ছেন। বলিদত্ত অবাক্ হয়ে বল্‌ল্ "কি?"

"বলে দিলেই গুমর বাড়্‌বে—নাঃ, থাক্। তবে তুমি আর এ ফাঁপা ধর্মবলের নাম কোর না আদৌ। দুর্বল হয়ে পড়বে। দেখলাম্ 'ধর্ম ধর্ম করে' লোকে গাঁজা খায়, গাঁজা টেনে স্বপ্নে বিভোর হয়।"

"আমার কি কিছু হবে মনে কর্‌ছেন?"

"হবে না? নিশ্চয় হবে। যাবে কোথায়? যার যা সাধনা—তা'র সে জোর নিশ্চিত যাবে কোথায়?"

আবার মনে পড়ছে—জরদ্‌গবমার্জার কথা! "স্যার, আমায় কিছু উপদেশ দেবেন না! কিছু হিণ্ট্‌স্, টিপ্‌স্ কিছু? তিরিশ বছরের দামী অভিজ্ঞতা।"

"দেব আশীর্বাদ—আমি যা হ'তে পারিনি, তুমি তা' হও।"

বুড়োর প্রতি মন নুয়ে আসছে, ভাঙা-মন বুড়ো। কি ভাব্‌ছে সে? আফ্‌সোস করছে? না, এ দিবাস্বপ্ন?

"শোন বাপু! জীবন রঙীন, পিছনের দিনগুলোর কথা ভেবে সুন্দর মনে হয়, সূর্যাস্ত কি না! হেঃ হেঃ হেঃ। তবে, তুমি আমার কাছ থেকে কি শোনাব আশা কর? যা'র যা'র হিণ্ট্‌স্ তা'র তা'র

—নিজের। যার যার টিপ্‌স্‌, তা'র তা'র। যার বাঁদর, সে-ই তাকে নাচাতে জানে। তা দিয়ে তোমার হবে কি? চাকরীতে ঢুকেছ—কাজ কর্‌তে। আমি কাজই করে গেছি—ভালমন্দ জানি না। তোমাকে আর টিপ্‌স্‌ কি দেব? তবে হ্যাঁ, মনে পড়ে—চাক্‌রীতে ঢুকে প্রথম জীবনে খেয়াল্‌ হয়েছিল, পিষে, মাড়িয়ে, টপ্‌কে যাব। দিনকতক দৌড়ঝাঁপ যে না করেছি তা নয়। কিন্তু ক্রমেই মনটা ফিরে এল। একটা ছোট ঘটনা বলি—স্মার্ট হবার জন্য ঘোড়া চড়া শিখছিলাম্‌—একটা মাদীঘোড়াও জুটিয়েছিলাম। একবার সায়েবের সঙ্গে ট্যুরে যেতে হোল। সায়েব ঘোড়ায়। পথে সায়েবের ঘোড়াটা চিঁহিঁহিঁ করে দু'পা তুলে আমার পানে দৌড়ে এল। মাদীটাকে সামলানো মুশকিল। ফলে, যা হবার হোত। ভাবলে মনে হয় ভগবান পরম দয়ালু—"

জগৎবাবু হো হো করে হেসে উঠ্‌লেন।

"এম্‌নি এক একটা ছোট ছোট ব্যাপার। তা আমাদের সজাগ করে দেয়, জানায় আমরা যেন বড় বেশী এগোচ্ছি। কান চুল্‌কে আমরা নিজের জায়গায় ফিরে আসি। সেইটা হয়েছিল আমার স্মার্ট হওয়ার জিগিরের ওপর প্রচণ্ড চোট্‌। পরে আরও অনেক কথা শিখ্‌তে হয়েছে। ধর, শিখ্‌তে হোল যে, যা'র পিছনেই দৌড়ই না কেন, যে যে রকম চায় তা'কে তেমনি ত্যাগও কর্‌তে হয়; আর চাক্‌রী—প্রথমেই এতে ত্যাগ করতে হয়—নিজের আত্মসম্মান। একবার একটা হাইল্যাণ্ডার সায়েব কথায় কথায় রেগে গিয়ে বলল—'শুয়োর কা বাচ্চা।' ধরলাম তার ঘাড়, কি যে কর্‌লাম্‌, তা এখন মনে পড়্‌ছে না। হুঁস হল যখন সে ত্রাহি ত্রাহি ডাক্‌ পাড়ছে। ভবিষ্যতে প্রমোশনের ওপর একটা কালো পর্দার যবনিকা পড়্‌ল। তবুও, চাক্‌রীটা গেল না; গেলে অবশ্য খুব ভাল হত। হেঃ হেঃ হেঃ—কি উপদেশ নেবে আমার কাছ থেকে?"

দেখ, পরের কাছ থেকে যদি সাহায্য আশা কর, তবে পরের মনকে ছুঁতে হবে তার প্রবৃত্তি মার্গে। প্রবৃত্তিই বা কি? প্রথম তার কামপ্রবৃত্তি—তারপর তার ক্রোধ অর্থাৎ তার শত্রুদের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করা—চুগলী জোগাড় করা থেকে তার তরফে লড়াই করা পর্যন্ত। তারপর তা'র লোভ—তাকে কিছু দেওয়া চাই। তারপর, তা'র মোহ; যে ভ্রান্তির মধ্যে সে তার জীবনের সত্তা খুঁজছে, সেই ভ্রান্তি। তা'র সেই ভ্যালুস নিজের বলে ধরে নিয়ে তা'কে

উৎসাহিত করতে হবে। তারপর তা'র মদ মাৎসর্য, অর্থাৎ তা'কে ষোল আনা খোসামোদ করতে হবে। তারপরও আছে—সেবা, কার্পণ্য, ফলদান, তা'কে স্মরণ, তা'র গুণকীর্তন—এইসব আর কি! সব শেষে তার হিতাহিত জ্ঞান—যেখানে কর্তব্য নিষ্ঠা ইত্যাদির দাম ওজন করা হয়। আখেরে তা'র এই বিবেচনা বুদ্ধির কাছে অ্যাপিল করার উপায়—এইটেই শেষ কথা। এই ত' চাকরীর ধর্ম, আমি সাম আপ করে দিলাম, বাপু! কিন্তু এর বিন্দুমাত্রও হাসিল করা সম্ভব হোল না আমার দ্বারা। কোন্ দুঃসাহসে তোমায় উপদেশ দেব, বল? আমি ত' নিজেই পারি নি। হেঃ হেঃ হেঃ। যাও, তোমার অনেক দামী সময় নষ্ট হ'ল। আচ্ছা আচ্ছা, আশীর্বাদ করি, জীবনে শান্তি পাও।" জগৎবাবু কাজে মন দিলেন।

থাকুন তিনি তাঁর খোপে, হলদে বার্ধক্য নিয়ে। বলিদত্ত পালিয়ে এসে যেন রক্ষে পেল। ওঃ, ও ঘরটায় কাগজগুলোও যেন পুরনো হ'য়ে গুঁড়ো গুঁড়ো ঝরে পড়ছে—ধুলো, সব ধুলোর গুঁড়ো, নাকে মুখে ঢুকে পড়ে। দম্ বন্ধ হয়ে যায়। অন্তরাত্মা ঠাণ্ডা মারে। ঘাড় নামিয়ে নীচের দিকে নজর রেখে বুড়োর কথা এড়িয়ে যেতে যেতে মনে হচ্ছে যেন, বুকের ভিতর চুপিসারে ঢুকছে একটা বেড়াল, নিজের ছোট্ট ব্যক্তিত্ব ইঁদুরের মত তার কবলে যেন শুধু ছট্‌ফট্ করছে, ছট্‌ফট্ করছে।

যাক্, পিছিয়ে গেছে সেই অনুভূতি। আবার জেগে উঠছে আশা—

এরপর রণজিৎবাবু—সুন্দর স্যুট, পরিচ্ছন্ন মুখ, চুল আঁচড়ানোতে আর্ট ফুটে উঠছে, যেন বিজ্ঞাপনের ছবিটি। বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, দরজার সাম্‌নে দেখা ও পরিচয়।

"চল্‌লেন, আজ্ঞে?"

"নিশ্চয়, দেখ্‌ছেন না, সাড়ে চারটে বেজে গেছে? আর আধ ঘণ্টা বাদেই ত' ছুটি—কে নজর রাখ্‌ছে? কাজ ত' খুব বেশীই করেছি। যে কোন সায়েবকে জিজ্ঞেস করুন গে, তাঁরা আজ আমাকে দেখেছেন আপিসে, অর্থাৎ প্রচুর ঘুরেছি; ঘোরাফেরা দরকার। কাজের এফিসিয়েন্সির প্রমাণ নিজের এফিসিয়েন্সি। তা বজায় রাখতে হলে গাধাখাটুনি বন্ধ রাখা চাই। দরকার নিজের শরীরের দিকে নজর, পরের সেন্টিমেণ্টের দিকেও। কাজ করে করে

ওপরওলা যখন প্রায় পাগল, তখন তা'র কাছে গিয়ে ছু'টো মিষ্টি কথা কইলে সে খুশী হয়; না, তা'র ছায়া না মাড়িয়ে, নিজের টেবিলে মুখ বুঁজে কাগজের ওপর উপুড় হয়ে থাক্‌লে সে খুশী হয়? অতএব কাজে নাম করার সিক্রেট্ হল—ডোণ্ট ওয়ার্ক, মানে নট্ লাইক এ বলদ। দেখাসাক্ষাৎ করা, বাড়ী বাড়ী ঘুরে বন্ধুত্ব পাতানো, তাদের ফটো তুলে তাদের ভেট্ দেওয়া, তাদের সঙ্গে টেনিস্ খেলা, তারপর তাদের চা-পানে আপ্যায়িত করা, কার কি দরকার, তা বুঝে নেওয়া চাই; ডাক্-হাঁক্ করা—বাব্বা-রে এ ত' সুপার ওয়ার্ক। এর জন্য বুদ্ধি চাই। ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট্‌ও কম দরকার নয়। আসুন, আমার নির্দেশ মানুন; সিওর সাক্‌সেস্। এই ত' টেনিসের সময় হয়ে এল; কাম্ অন্, বি এ স্পোর্ট, কি?"

"আমার একটু কাজ আছে—"

"ফের কাজ।" রণজিৎ বাবু হাস্‌লেন্ 'আচ্ছা, বাই বাই" তিনি এগিয়ে গেলেন। ক্ষিপ্রগামী রণজিৎবাবু। কিছু না ভেবে বলিদত্ত তাঁর দিকেই চলল। কিন্তু তিনি সাইকেল ছুটোলেন—তা'র মুখের এক ফালি দেখা যাচ্ছে, তাতে বাঁকা সিগারেট্ জ্বল্‌ছে—'পাসিং শো'।

উড়ন্ত দৃশ্য; উড়ে যাচ্ছে আগে, সাম্‌নে—।

নিজের ওপর অহেতুক রাগ হচ্ছে। মনে হচ্ছে সে যেন কচ্ছপ মাত্র—চিন্তাশীল একটি কচ্ছপ! আবার মনে পড়ে—বিজ্ঞাপন, ছু'দিকে ছু'রকম, পূর্ব ও পশ্চিম, সূর্যোদয়—সূর্যাস্ত। সাফল্যের বিজ্ঞাপনের ওপর লেখা আছে—"এস, আমাকে আশ্রয় কর—মামেকং শরণং ব্রজ—লেট বি ইয়োর ফাদার।"

মুগ্ধ বলিদত্ত বেকুবের মত চেয়ে থাকে।

হঠাৎ আপিস ছুটির শেষ ঘণ্টা বেজে উঠল—ঢং ঢং ঢং ঢং। কোম্পানীর আপিসবাড়ী থেকে পঙ্গপালের মত লাইন করে লোক বের হ'ল। হুঁস্ হ'ল—পিছনে তা'র কোট ও টুপি হাতে, বগলে একটা ফাইল চেপে—দাঁড়িয়ে তার পিওন নিতা। ঘাড় নীচু করে, দাঁত কেলিয়ে, নিতান্ত দাস্যভাবে বল্‌ছে—

"হুজুর কি হেঁটেই ফিরবেন, না গাড়ী ডাক্‌ব? একটা গাড়ীই ডাকি, নয়ত ধকল হবে।"

"হুঁঃ, কি আর দূর যে গাড়ী ডাক্‌বি নিতা; চল্, হাওয়া খেতে খেতে যাওয়া যাবে।"

"হাওয়া ? ভার ধুলো হুজুর ; আচ্ছা—আস্‌তে আজ্ঞা হো'ক্ ।"

□

বাসার দোরগোড়ায় পৌঁছতেই দেখল একটা ছোক্‌রা চাকর ঝুড়ি মাথায় চৌহদ্দির মধ্যে ঢুক্‌ছে—তা'র পিঠের দিকে দে
পাতলা, ফর্সা আদুড় চেহারার চুড়োয় ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া চুল। বেজায় ছেঁড়া গাম্‌ছা নেংটির মত পরা।

পিছন থেকে নিতা হাঁকল "এই হর্ষা, শা—"

হর্ষা ফিরে দাঁড়িয়ে নমস্কার কর্‌ল।

নেহাৎ কচি মুখটি, চাউনিতে একধরনের সহজ নিরাশ্রয়তা, লোককে নিজের করে নেয়। সরু সরু নির্জীব হাতের পাতা, আঙ্গুলের নখ লাল টক্‌টকে রাঙানো।

যেন জানে না এমনিভাব দেখিয়ে বলিদত্ত জিজ্ঞেস করল—"কে রে, নিতা ?"

"হুজুর, এ হোল হর্ষ, হুজুরের বয় ; হুজুর যা হুকুম করবেন, তা করবে ; ভাল, কাজের ছেলে ; আগে এক পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টরের কাছে কাজ করত ; তাঁর সঙ্গে সফরে খুব ঘুরেছে ; দেখবেন, ভারি কাজের।"

"হ্যাঁ হর্ষ, না হর্স—ঘোড়া, এ্যাঁ ? ওরে, হর্ষ, আয় ত' !"

"আয়, আয় রে হর্ষ, হুজুর সওয়ার হবেন, কেমন সওয়ার পরে জানবি ; একটু কাজে ঢিলে দিয়েছিস্ কি, টান্ দেবেন তোর চুলের ঝুঁটিতে"—নিতা ফিক্ ফিক্ হাসল। বলিদত্তর বেশ মজা লাগল, সেও হাসল, বলল—"কি রে ব্যাটা, নখ রাঙিয়েছিস্ না কি ? দেখি তোর আঙ্গুল—" তার হাতের পাঞ্জার জোড়াইয়ের ফাঁকে আঙ্গুল ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে চাপ দিল। হর্ষ লজ্জায় শুক্‌নো শাপলার মত, তবুও ঠোঁট কামড়ে নীচু মুখের পাশ থেকে চট্‌পট্ তাকাচ্ছে। বলিদত্ত তা'র হাত মোচড়াচ্ছে, ঘাড় চেপে ধরছে, বল্‌ছে—"আঃ, শৌখীন ছোঁড়া, নখ রাঙিয়েছে, বাঃ বাঃ, মাথায় চুলের জঙ্গল, নোলক পরিস না ?"

নিতা বল্‌ল—"হুজুর, ও দিনকতক যাত্রায় সখী সেজে নাচত।"

"বেশ, আবার নাচ্‌বে ; কাজ না করলে এমন নাচাব যে হাড়ে

হাড়ে বুঝবি।” তা'র ছেঁড়া গামছায় চিমটি কাটল। হর্ষ হেসে কেলে লাফ্ মারল। বলিদত্ত বলল “এগুলো কি? তুই গামছা পরেছিস্, না গামছা তোকে পরেছে, বল্ ত' আগে? এই পরে কাজ করবি?”

“গরীবের ছেলে, হুজুর—” নিতা বলল “কি আছে ওর? হুজুর কি দেবেন না?”

হর্ষ দুলতে দুলতে ঝুড়ি কাঁধে বাসার দিকে চলল; তা'র দিকে চাইতে চাইতে বলিদত্ত এগোল ধীরে ধীরে।

তা'র শরীরে আসছে অজানা উষ্ণতা, মন সতেজ, নতুন আমদানী করা 'বয়' ছোক্‌রার সঙ্গে মিনিট খানেক মনে এনেছে প্রবল উৎসাহ। এ একটা নতুন অনুভূতি যা তা'র দেহের খোলসের নীচে ঢাকা পড়ে কুঁচকে লুকিয়ে ছিল; উপযুক্ত পরিবেশে চাগিয়ে উঠেছে। অতীতের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া, যে সূত্রে হিংসার বলি মাটি কামড়ে পড়ে থাকে, পরে হিংস্রক হয়ে উঠতে, আহত আঘাত হানে—এ তা'ই। সারা জীবন লোকে তা'র ব্যক্তিত্বকে নাচিয়েছে—শিখণ্ডীর মত। সব মজা লুটেছে তা'র ওপরে, তারই খরচে; কারণ, সে খর্ব, সে দুর্বল। সে সব মনে হ'লে গা জ্বলে যায়, আতঙ্ক আসে। আজ প্রতিক্রিয়া, শোধ নেওয়ার সময় হয়েছে; উৎসাহ, উন্মাদনা তা'ই আটকানো কঠিন। একটাই দেহ, তা'তে লক্ষ প্রবণতা, লক্ষ প্রবৃত্তির বিকার, পিল্‌পিল্ করছে রোগজীবাণুর মত। কোন্ রোগের জীবাণু কোন্ ঋতুতে, আর্দ্রতা, তাপ ও পরিবেশ পেয়ে হঠাৎ জেগে ওঠে, ছেয়ে যায়; তেমনি মনের নতুন খেয়াল—এই হর্ষ ছোঁড়ার শরীরটাকে সে মুড়ে মুচ্‌ড়ে গুঁড়ো করতে চায়। ভাবলেও গা কাঁপে। ভাবতে ভাবতে সে ঢোকে প্রথম সাক্ষাতে শা' সায়েবের সত্তায়।

সরোজিনী অপেক্ষা করে আছে।

কিন্তু তা'র মুখের দিকে চাওয়া যায় না; নতুন খেয়ালের অব্যক্ত অন্তরা গুন্ গুন্ করছে মনে। ভিতরে ঢুকে দেখল, বাসায় সাজানো গোছানো শেষ। যেখানে যা থাকার কথা, টেবিল, চেয়ার, খাট, বিছানা, জিনিষপত্র—সব। চেয়ারে বসে চেঁচাল সে, “এই বয়, জুতো খোল্।”

হর্ষ জুতো খুলতে এসে মাটিতে বসে পড়ল। তা'র কোলের ওপর দু'পা চাপিয়ে বলিদত্ত বলল “জুতো খোল্, মোজা খোল্।”

হঠাৎ মনে পড়ল—গায়ের গাঁটে গাঁটে যেন ব্যথা, চাই মালিশ,

ডলাইমলাই। সরোজিনী জামাকাপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে। বলিদত্ত বলল, "বড় ক্লান্ত লাগছে, গায়ে ব্যথা, ওঃ যা কাজ!"

সরোজিনীর মুখ শুকিয়ে গেল, কপালে হাত দিয়ে বলল—"দেখি, হ্যাঁ, তেতেছে ত'—না! ডাক্তার ডেকে আনুক, নিতা যাক্।"

"না, না, কি এমন হয়েছে, ভাবো? ও কিছু নয়। এখানে কাজের চাপ। বেশী দায়িত্ব কিনা! সামান্য একটু আধ-কপালে; তুমি যাও, চা আন। হর্ষ আমাকে একটু ডলে দিক; 'হ্যাঁ রে, পারবি না, ছোঁড়া?' যাও না, ও ডলে দেবে আপনিই। তুমি রাঁধাবাড়া কর।" অতএব কাপড় বদলে শুয়ে পড়ল বলিদত্ত। হর্ষ তা'কে ডলতে আরম্ভ করল; প্রথমে—ভয়ে ভয়ে, পাশ থেকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে। পরে সাহস করে জোরে জোরে; তারপর তা'র কচি হাত চলল বেপরোয়া, যেন কাদা চটকাচ্ছে। বলিদত্ত পড়ে রয়েছে নির্জীবের মত ভান করে। মাঝে মাঝে হুকুম দিচ্ছে "হ্যাঁ, ওইখানে, ঐ জায়গায়, জোরে।" "হোল না, আরও শক্ত করে" "আর একটু ওপরে, এইখানে। ওঃ ছিঁড়ে যাচ্ছে যেন।" মুখ নীচু করে, ঘামে-ভরা হাতে বেচারা চাকর ছোঁড়া হাত চালাচ্ছে। কপালে ঘাম, তা'র গায়েও ব্যথা লাগছে, কিন্তু সে নীরব, মুখোমুখি চাইছে না পর্যন্ত।

এসব বলিদত্তর নতুন অভিজ্ঞতার পদক্ষেপ; ভাল লাগছে। এই মুহূর্তে এইটুকুই ত' জীবনের স্বাদ! ভাবনা চলেছে—জীবন! কত বড় তা? কত তা'র দিক, কতদিকে তার মুখ? জীবন ভোগের জন্য, যে পাখী যতদূর উড়তে পারে। যারা পারে না, হাঁসফাঁস-করা তারাই গড়ে সমাজের লালচোখো সংস্কার, আর তা মেনে চলে তারাই যারা নাচার। কিন্তু যে বলীয়ান, যে পরের পরোয়া করে না, যথা:—সে, অফিসার, তার জন্য নয় সে লাল চোখ; তার জন্য আরাম—এইরকম আরাম। এককালে ছিল নবাব বাদশা; তাদের মৌজী খেয়াল ছিল—সর্বসাধারণের কাছে তা মনে হত অদ্ভুত, তাদের সুরা অন্যের পক্ষে গরল। আজও আছে তাদের বংশধর ভিন্ন বেশে, ভিন্ন বৃত্তিতে, কিন্তু তেমনি সাধারণ লোকের নাগালের বাইরে। তা'রা ভোগী। নীচে থেকে দুনিয়া দেখে তাদের। তারা ইচ্ছামত নানা ধরনের তৃষ্ণার সৃষ্টি করে আর নানা পায় ফেঁদে সে তৃষ্ণা মেটায়। কুকুর চিল্লাতে থাকে; হাতী চালিয়ে, নিয়ে যায় তা'রা নিজের শোভাযাত্রা। ভয়? কত দৃষ্টান্ত—ছোটলোকে ফিস্‌ফাস্ করে—অমুক জঘন্য কামুক, সামাজিক

ভেদজ্ঞান রাখে না। স্বচ্ছন্দে নিজের প্রণয়িনীকে চালিয়ে দেয় বোন বা মেয়ে বলে। তমুক? ছি—ঠিক যেন রাস্তার কুকুর, হালে তার বৌ তার মাথা নেড়া করে গোবরজল খাইয়েছিল, কিছুটা দেখে ফেলেছিল বলে। সমুক? তা'র কথা ত' হাটে, বাটে, মাঠে গড়াগড়ি খাচ্ছে—লোকটার প্রবৃত্তিই অপ্রাকৃত, যেন বিশ্বামিত্রের তৈরী। ছোটলোকদের এসব কথার পরোয়া করে কে?

যারা কিছুই পায়নি, তারা অবশ্যই ঘেউ ঘেউ করবে।

কিন্তু জীবন! ফাউ মারতে জানলে, সর তুলতে [illegible], তাতে স্বাদ আছে বই কি—নানারকম। বাঃ, বেশ ডল্‌ছে জোড়া, কটি আঙ্গুল যেন কথা কইছে—জাগাচ্ছে মনে নতুন আনন্দ।

আধবোঁজা চোখে, সুখের কুয়াশায় ভাসছে বলিদত্ত; চেতনায় অর্থবহুল ভাবের স্পন্দন, অব্যক্ত, অর্ধোক্ত, অনুক্ত, মনে মনে—কানাকানি-করা ভাবনা; তার কতকগুলো মন থেকে নিজের কান শোনে, কতক্ মন শোনেই না, শুধু অনুভব করে। স্তরে স্তরে সুষুপ্ত মন থেকে, গহন মন থেকে ওপরে উঠে আসে ভাব। খুব তাড়াতাড়ি সে বদ্‌লেছে। দিনকতক্ আগেও এমন চিন্তার কথাও সে কল্পনা করতে পারত না। কেউ এসব বললে, হেসে উড়িয়ে দিত এই বলে যে, রাস্তার ফতুর ভিখারীর মন ঘাঁটলে কি দেখা য[illegible] পরাঙ্গপুষ্ট ধনীর অত্যাচারী মনোভাব যে নাকি [illegible]? অভাবে পচে পৃথিবীতে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য [illegible] দারিদ্রের মনে খুঁজ্‌লে কি পাওয়া যায় কোথাও বাঘে-মানুষে একাকার ম্যাকিয়াভেলী-দর্শনসুলভ তীব্র আকাঙ্ক্ষা! কেবল পরিস্থিতির চাপে দমে গিয়ে ধরেছে অন্য রাস্তা। তার সামনে [illegible] করলে অধর্মের কথা মানতে, যে ক্ষমতা পেলে গড়্‌পড়্‌তা লোকের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়, ভয় ও অসম্ভাব্যতার বেড়া টপ্‌কে তার অন্তর্নিহিত স্বেচ্ছাচারী ভাব নিজেকে প্রকাশ করে। উঞ্ছ গাইএর মত সমাজের সামনে ছ'পা তুলে পরের চালার খড়ের খুঁটি টেনে খেতে সে শংকাবোধ করে না, যোগী হয় ভোগী, অতীতে যে ত্যাগ করেছে তারই বড়াই করে সে রক্তমাংস খেয়ে চট্‌পট্‌ মাংসল হ'তে প্রকাশ্যে টেঁট্‌রা পিটে সোত্সাহে লেগে পড়ে।

কিন্তু দর্শনশাস্ত্র বলিদত্তর দুর্বলতা নয়; তার শাস্ত্র সাফল্যবাদী জন্তুর শাস্ত্র। মনের দিক থেকে সে ব্রাহ্মণ নয়। কাজেই নিজেকে সে

আল্‌তোভাবে ভাসিয়ে দিয়েছে সুযোগ ও সুবিধার চলন্ত ঢেউয়ে। সে চায় ঢেউয়ের মাথায় চড়তে, ঢেউয়ের সামনাসামনি আছাড় খেয়ে বালিতে গড়াগড়ি যেতে ছোটবেলা থেকে তার ঘৃণা।

তাই সে স্পন্দনে স্পন্দিত। "টেপ রে হর্ষা, হাত ব্যথা করলে শুধু হাত বুলো।" কখন থেকে সরোজিনী চা দিয়ে গেছে। রান্নাঘর থেকে শোনা যায় নিতার গলা।

অবশেষে হর্ষা উঠে দাঁড়াল। "এঃ কি সরু সরু তোর পা'হাত, রে হর্ষা,—মোটা হ'স্ নে কেন? খেয়ে দেয়ে গায়ে মাংস লাগা।" সেই কাহিল কচি দেহটা টিপেটুপে নিজের বল কষ্‌তে যে কী আনন্দ; এই কচি কাঁচা থেকে সে জীবন শুষে নিতে চায়।

চোরের মত হর্ষা তাকায় এদিক্ ওদিক্ "আঃ, হাতটা ভেঙ্গে যাবে, বাবু।"

"হেঃ, হেঃ, হেঃ, দেখছিস্ আমার গায়ের জোর।"

"খুব জোর আপনার বাবু, ছেড়ে দিন।"

"এমন জংলীর মত ব্যাভার কেন রে তোর? বেটাচ্ছেলে, যাত্রার দলে না নাচতিস্ তুই, কি সাজ্‌তিস?"

"রানী সাজ্‌তাম, বাবু।"

"বাঃ বাঃ, রানী; অধিকারী কেমন চোখ মারতে শিখিয়েছিল, দেখাবি না একটু। হাঃ হাঃ—"

হর্ষাও হাসল; বলিদত্ত বলল "ভাল করে কাজ করবি; থাক্‌বি আমার কাছে। গরমকালে পাখাটানার কাজ খুল্‌লে লাগিয়ে দেব তাতে তোকে, বড় হ'লে চাপ্‌রাশী হবি, নয়ত কোম্পানীর ডিপোয় কার্‌পর্‌দাজ করে দেব।"

"বেশ হবে, বাবু।" হর্ষা আবার হাসল; সে আর পর নয়, অচেনা নয়: সে অনুভব করল যে পরিস্থিতি বদ্‌লেছে। এই সুবিধায় তা'রও দানাপানির খালি থালাটি এগিয়ে ধরে সে বল্‌লে "এই দেখুন বাবু, কিভাবে ছিঁড়ে গেছে—একটা পুরনো সুরনো গামছা হলে—"

"মিল্‌বে, মিল্‌বে, সবই মিল্‌বে।"

"আর, আজ বাড়ীতে খাবার কিছু নেই, দু'আনা পয়সা দেন্‌ত"—

"আচ্ছা রে আচ্ছা, পাবি দু'আনা" উঠে গিয়ে কামিজের পকেট থেকে পয়সা এনে হর্ষার হাতে দিয়ে বলিদত্ত তা'র পিঠ্ চাপড়ে বলল "নে, নে। দেখ্‌লি, যা চাইলি, তা পেলি। একেবারে দু'

ছু' আনা। আবার কাল একটু পা টিপে দিস, এঁ্যা—"

হর্ষা গেল কাজে। বলিদত্তর মন অতি প্রসন্ন; এই তা'র প্রথম উদার দান, একেবারে ছু'আনা—বেজায় আত্মপ্রসাদ এনে দিয়েছে। ভিতরে ঢুকে সরোজিনীকে বলল—"ছোঁড়া খুব ভাল টিপ্‌তে পারে। আঃ, গায়ে ফুর্তি লাগছে। দাও ত' জামাকাপড়, বেড়িয়ে আসি একটু।"

অবসাদ ঢেলে পড়্‌ছে গায়ে। "নাঃ, থাক্ আজ" বলিদত্ত বলল— "তোমার একলা লাগ্‌বে। বরং আমি একটু গড়িয়ে নি।"

সরোজিনী কিছুই বল্‌ল না; বাস্তবিকই তার ভারী এক্‌লা মনে হচ্ছিল, যেমন কখনও কখনও তার মনে হত আগেও।

□

কাজ, শুধু কাজ। এবং কাজের ফাঁকে রোজ শুধু ফন্দির চিন্তা —কি উপায়ে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে পারবে। উপায় ভেবে সেইমত কাজ, আবার কাজ।

কতকগুলো সাধারণ কথা আয়ত্ত করে সে তার অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে। কোথাও সে বেশী ঘোরাফেরা করে না, যায় ত', শুধু বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এবং আপিস বা কোম্পানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যদি কাউকে দেখে, হঠাৎ সাধারণ বাঁধা গতের মত তার মুখ থেকে স্বতঃ বেরিয়ে পড়ে—"ওঃ, আজ যে কী কাজ গেছে, না। ঘাম মুছ্‌বার ফুরসৎ ছিল না! সঙ্গে সঙ্গে সে যে কাজটুকু করেছে তার একটা কল্পিত বর্ণনা দেয়; লোকে শোনে; কিন্তু কানের ভিতর দিয়ে মগজে পৌঁছনোর পূর্বে সত্যমিথ্যা বিশ্লেষণ করা সাধারণ মনের প্রক্রিয়ার বাইরে। এই মনস্তত্ত্বের সুবিধা নিয়ে বলিদত্ত পাঁচকে পনেরো, তিলকে তাল বলে বাড়িয়ে, ব্যাখ্যা করতে পারে। কে যেন কবে উপদেশ দিয়েছিল, তা'র মনে পড়ে, শাস্ত্রটির নাম 'ব্লাফোলজী'।

পথে সে পা চালিয়ে হাঁটে, অতি ব্যস্ত। জিজ্ঞেস করলে বলে "যা কাজের চাপ, দাঁড়াবার সময় ত' নেই।" যখনই কেউ তা'র বাসায় বেড়াতে আসে—সে যেই হোক্ না কেন বাইরে, ডাক শোনা মাত্র সারা বাড়ী তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত। দোর খুল্‌তেই দেখা যায়

টেবিলে কাগজ-পত্র ছড়ানো, থাকে থাকে রাখা ফাইল্; দোয়াতের ছিপি খোলা, কলমের নিব্ ভিজে। সে সব আস্তে সরিয়ে রেখে আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানিয়ে সে বলে "কাজ করে করে কোমর ব্যথা করছে। এই অল্প ক' দিন হোল এসেছি; কিন্তু কি যে ওঁর মনে হয়েছে—যত বড় বড় দায়িত্বের কাজ সব চাপাচ্ছেন আমার ওপর। কি যে করি! কাজ ত' তুল্‌তেই হবে। কোম্পানীর স্বার্থ না দেখলেই নয়; লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার; সর্বদা না চোখ রাখলে মাইনে হজম হবে কি করে? কোম্পানী যে আমার অন্নদাতা।" ব্লাফোলজী বলে একেই। গম্ভীরভাবে উপযুক্ত ভঙ্গীতে বলতে পারলে, তা'র প্রতি শ্রোতার আসে গভীর সম্মান, কিন্তু সে দেখে, ভাবুক সে একা নয়।

আগের চাক্‌রীতে কেরানী বন্ধুদের দলে ভিড়বার সময় সে ভাব্‌ত—তার মত বেশী লোক নেই যারা সাফল্যকে বিজ্ঞান বলে মনে করে। যারা তেমন ছিলও, তাদের পরিকল্পনায় ছিল না বিচক্ষণ সূক্ষ্মতা।

কিন্তু হঠাৎ এখানে দেখে—নেহাৎ গুটিকয়েক গবেট বাদে কোম্পানীর অফিসার শ্রেণীর অনেকেই মেধাবী। শুধু রণজিৎবাবু নয়, আরো আরো অনেকে। নানা ধরনের উপায় তাদের, লক্ষ্য করে খাতায় ঢুক্‌বার মত। নানা ধরনের প্রচেষ্টা, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম পর্যন্ত। বলিদত্ত বিহ্বল হ'য়ে পড়ে। যেখানে এত বড় বড় তোপ কামান, সেখানে সে ত' ছোট্ট ছুঁচোবাজি। থেকে থেকে ভবিষ্যতের আশায় জলাঞ্জলি দেয়। আবার লেগে যায় কৌশিশ্ করতে। খোঁজে সেই উপায়—যা তা'র আকৃতি, স্বাস্থ্য, বাড়ী প্রভৃতির পুঁজিতে চলতে পারে।

সেদিনের কথা—মেজ সায়েবের জ্বর। ওপরওলা অসুস্থ হ'লে সাফল্যবাদী অধস্তনের পক্ষে তা পরম সুযোগ। রণজিৎবাবু আঙ্গুর, বেদানা, কমলা ইত্যাদির এক ঝুড়ি হাজির কর্‌লেন। কিন্তু এ হ'ল অর্থকরী যোজনা। বলিদত্তর পক্ষে তা অসাধ্য। মুখ শুকিয়ে চুপচাপ তাঁর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সে নীরব সহানুভূতি জানিয়েছে। চাকরের কাছ থেকে পাখা কেড়ে নিয়ে হাওয়া করেছে খানিক, যদিও মেজসায়েব তখন চোখ বুঁজে ছিলেন।

দু'তিনবার নিজে গেছে ডাক্তার ডেকে আনতে। কিন্তু এক্ষেত্রে দরকার ছিল স্থূল যোজনার, যা পেরেছেন উমেশবাবু। উমেশবাবু আকারে দশাসই, যেন একটা অসুর। ভোজন, ক্ষুধা ও প্রবৃত্তিতেও

তিনি নির্লজ্জভাবে আসুরিক, বলিদত্তর মতে। কিন্তু শত ঈর্ষাতেও জ্বলে তা'কে দেখতে হোল, জ্বরে শয্যাশায়ী মেজসায়েবের বিছানার কাছে উমেশবাবুর প্রতিপত্তিই বেশী; কারণ, সকলের সামনে দুই সবল বাহু বিস্তার করে তিনি মেজসায়েবের পা ও উরু টিপতে পারেন এবং টিপে দিলেনও। ভয়ে ভয়ে বলিদত্তও বাড়িয়েছিল তার দুর্বল ছোট বাহুটি। কিন্তু অন্যমনস্কতার ভান করে উমেশবাবু তা'র হাতের পাতা সমেত টিপে দিলেন এত জোরে যে বলিদত্তর চোখ থেকে জল গড়াল। সে আর দ্বিতীয় চেষ্টা করে নি। তার পর, একবার যখন জ্বরের তাপে মেজসায়েবের চোখ টক্‌টকে লাল জবাফুলের মত, মাথায় যেন জ্বলন্ত উনুনের ঝিঁক্‌, বারবার ঠোঁট চেটে, জিভ্‌ লক্‌ লক্‌ করে তিনি দাঁত কড়মড় করতে লাগলেন, পা হাত ছুঁড়লেন, প্রলাপ শুরু করলেন "ফাইল্—ফাইল্‌টা আন" বলে এবং ডাক্তার বললে তাঁর মাথা নুইয়ে জল ঢালতে—সে কাজ করলেন উমেশবাবুই, বেশী বলবান বলে। তখন তাঁর হাবেভাবে মনে হচ্ছিল যেন তিনি জ্বরের সঙ্গে কুস্তি লড়ছেন। তিনি যা করেন, তা তাঁর খেলোয়াড়ী মনের উদারতা বলে আবেগে চালানো যায়। এতে তা হলে আর আশ্চর্য কি যে, তিনি হলেন মেজসায়েবের প্রিয়পাত্র।

তারপর। সেই উমেশবাবু, নিজে বড়লোকের ছেলে হয়েও, অনর্থক কর্তাদের কাছে গিয়ে আর্জি জানান "স্যার, খুব খিদে পেয়েছে, আনান কিছু—"। হাসতে হাসতে ছোলাভাজা, ঝালচানা, পকোড়া, বেগুনী—এসব মুখে ফেলতে থাকেন। আরো এগিয়ে, কাউকে ধর্মবাপ, কাউকে ধর্মভাই বলে সম্পর্ক পাতান। হাসতে হাসতে ওপরওলাদের ছাড়া পোষাক, পুরনো মাল হাত পেতে নেন—বলেন—"দিয়ে দিন আমাকে; আপনার অনেক আছে।"

প্রকাণ্ড উমেশবাবুর মুখে আহ্লাদে কথা শুনতে ভাল লাগে। বলিদত্ত তা' দেখে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, এ সব তার সাধ্যাতীত।

আর, আছেন নিরাকারবাবু—বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজে দিতে সিদ্ধহস্ত; এই উপকারের জন্য কর্তাদের কাছে তাঁর বিশেষ খাতির; অথচ সকলে জানে, তিনি একটু কুঁড়ে, কাজ করেন কম। কিন্তু একটু অবসর পেলেই তিনি পাত্রদের বিষয়ে কথা পাড়েন, পকেট থেকে নানা চিঠি বের করে ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে বলেন "এই ত', রাম

লিখেছে—এম্. এস্. সি পড়ে। লিখেছে—কাকা, আমার ভূমিষ্ঠ প্রণাম নেবেন। আহা-হা, কি খাসা ছেলে।" তারুণ্যের আলোচনায় তাঁর মুখে খই ফোটে, ওই হোল তার কলা, সেখানেও বলিদত্তর টক্কর দেওয়া অসম্ভব।

এবং আরও অসম্ভব পাত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার দুরাশা পোষণ করা; যেখানে বৈবাহিক সম্বন্ধের দরুন পদোন্নতির সূচনা, সে ক্ষেত্র তার কাছে দূর অস্ত্। এমন হওয়া সে ক্ষেত্রে অতি স্বাভাবিক—বিশিষ্ট সম্বন্ধের দরুন বিশিষ্ট আসন; কারণ, মুঠি বেঁধে ধরা ও ধরে রাখার প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত। কোম্পানীর ডিপো থেকে দ্বীপান্তর পর্যন্ত সর্বত্র [illegible] দেখা যায়—শালা-ভগ্নীপতি, বেয়াই-বেয়াই, শ্বশুর-জামাই-সম্বন্ধী-শালার ঘূর্ণি। তাছাড়া ভাষাগত দল, জাতিগত গোষ্ঠী, [illegible] নামকাটা। এ রকম দল গড়ে স্থানে স্থানে ক্ষমার [illegible]নাডোবা খুঁড়ে স্বচ্ছন্দে পাড়ে দাঁড়িয়ে লোকে মাছ ধরে। সেখানেও বলিদত্তর প্রবেশ নেই। সে কেবল দেখে—কোম্পানীর কর্মচারীদের স্থানান্তর সম্পর্কে যে সাময়িক আজ্ঞাপত্র ছাপা হয়ে ওপর থেকে আসে, তাতে স্থানান্তরগুলো যেন পাঁজির বিবাহতিথিগুলোর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে।

[illegible]নাপানির সংঘর্ষে এসব রোজকার ঘটনা। বলিদত্ত গম্ভীর হয়ে ভাবে—এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অসম্ভব। কারণ, চিরদিন, চিরকাল এরকম কত ব্যাপার থেকে যায় যেখানে নিজের কেরামতিতে আঁটা যায় না।

কিন্তু এ ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি পথ আছে, [illegible] পথের পথিকদের দেখে দেখে সে নিজের পরিকল্পনা গড়ে তোলে

এই ত' হরিবাবু, সর্বদা উনি ওপরওয়ালা[illegible] কাছেই, সব কাজে এমন তাঁদের জোগানদার আর জুড়ি নেই; কর্তাদের চাপরাশীর সঙ্গে উনি যোগাযোগ করেন, তাদের কাছ থেকে জেনে নেন কখন, কোথায়, কি আবশ্যক, কিভাবে তা জোগানো যায়। যার কাছে তিনি কাজ করেন, ক্রমে সে হাতপা লম্বা করে তাঁরই ওপর সব ব্যাপারে নির্ভর করে, যেন অন্ধের নড়ি। কাজেই তিনি তাঁর হাতে খড়ি ধরিয়ে সব কাজই করিয়ে নিতে পারেন, কর্তাকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে পারেন—নিজের জন্য সব সুপারিশ। তাই অতি নগণ্যভাবে শুরু করে গাছের গোড়া থেকে তিনি উঠে গেছেন প্রায় আধাআধি। সর্বদাই হাসিমুখ অথচ সর্বদাই কার্য-ব্যস্ত দেখা

যায় তাঁকে। তাঁর বাড়ীর সামনে বড় বড় তিনটে তক্তাপোষ পড়ে থাকে, ঠিক্ ঢুকতেই সেগুলো রাখা আছে। যখনই দেখ, সেগুলোর ওপরে ইট পাথর চাপা দেওয়া থাকে ফাইল্; হুঁকো হাতে কাজ করার বাহানায় তিনি সেখানে বসে থাকেন। গল্পচ্ছলে, তর্ক করতে করতে পাছে কোন গুপ্তকথা ফাঁস হয়ে যায়, তাই তিনি অন্যদের এড়িয়ে চলেন; কেউ যদি জিদ করে পাক্ড়াও করে নিয়ে যায়, তিনি একটি সাধারণ অথচ অতি অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে আত্মরক্ষা করেন—'আমি যাই আজ্ঞে, পায়খানা চেপেছে আমার।'

এঁর ঠিক উল্টো—ধনেশ্বরবাবু—সোনার খড়কের মত টক্‌টকে গৌরবর্ণ এবং স্বাস্থ্যহীন, পাতলা ছিপ্‌ছিপে শরীরে পাঁকাটির মত হাড় ক'খানি সার; ক্ষেত নিড়ানির মত ছাতি; কিন্তু মাথাটি বড়, মুখটি ভরাট্, খরগোসের মত বড় বড় দু'টো কান খাড়া, যদিও কানে ভাল শুনতে পান না। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে আগে "অ্যাঁয়-য়" বলা অভ্যাস হয়ে গেছে; তাই তাঁর লম্বাটে মুখের সাধারণ ভঙ্গীই দাঁড়িয়েছে একটি ছোট বাঁকা 'হাঁ'তে। চোখেও তাই কৌতূহল; মোটা চশমা। বয়স তিরিশ বত্রিশ; কিন্তু কানের ওপর-ঘেঁষে এক গোছা চিক-চিকে সাদা চুল আর কপালের ওপর কালশিরের মত দাগ। স্বাস্থ্য না থাকলেও চট্‌পটে, যেন তৎপরতার অবতার। ফিটফাট পোষাক, দেখা হলেই বাড়িয়ে দেন সিগারেটের টিন; কথায় কিনে নেবেন, মিষ্টি হাসি, চোখে যেন মোহিনী মায়া। বিকেলবেলা টেনিস্ চাই-ই চাই, যদিও ভাল খেলতে জানেন না। রাতে আড্ডায় ঘনঘটা সহ ব্রিজ খেলা, তাতে হারের মাত্রা বেশী। সঙ্গীত, সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি—প্রত্যেক বিষয়ে উচ্চস্তরের সাংস্কৃতিক যুক্তি শুরু করতে দক্ষ, কিন্তু শেষে হার মেনে শিষ্য হয়ে পড়েন প্রতিপক্ষের। তারপর বিজেতার গুণের বিশ্লেষণ করতে করতে তার দু'চারটি ভাল গুণ দেখিয়ে দিয়ে, চা-সিগারেট্ খাইয়ে খুশী করে ছাড়বেন যাতে বিজেতা আরো একবার দৌড় শুরু করে ও আর একবার জিতবার সুখ পেতে পারে। তাঁর প্রধান বড় গুণ—তিনি পরকে উস্কে, তার আক্রমণ প্রবৃত্তিতে ইন্ধন জুগিয়ে, তার কাছে হারতে রাজী। এহেন আচরণে, কর্তাব্যক্তি বারংবার ধনেশ্বর বাবুর সংস্পর্শে এসে একধরনের মানসিক তুষ্টি পান, তাঁর ওপর নিজের মানসিক উৎকর্ষ অনুভব করে আপন অহমিকায় উদার হয়ে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে পড়েন। কেউবা তাঁকে টেনিস্

শেখাতে যত্ন করে ; কেউ গায়ে পড়ে আপিসের কাজ শেখাতে কষ্ট করে। এম্নি ছলনায় তিনি সকলের পরিশ্রমে উপকৃত হওয়ার ভান করে দিন দিন উন্নতি দেখান—কত তাড়াতাড়ি শেখানো উপদেশ তিনি বুঝতে পারেন, কাজে লাগান। এইভাবে আলোচনা করে কর্তারা তাঁর বুদ্ধির তারিফ করে। সকলে নিজেকে তাঁর অভিভাবক মনে করে তাঁকে আগে ঠেলতে সাহায্য করে। মানুষের জন্মগত গড়নে প্রচুর পরিমাণে নেগেটিভ গুণ না থাকলে, এ রকম উন্নতিলাভ অসম্ভব। ধনেশ্বর বাবুর তা করতলগত, তা'র সঙ্গে সকলের কাছে অতিশয় নিরীহতার ভেক্ ধরতে তিনি ওস্তাদ। তা'রই আড়ালে তিনি কোম্পানীর প্রভাবকে বেচে ভেঙ্গে নানা প্রকার ফায়দা হাসিলের ব্যবসা চালাতে পারেন। তাঁ'র পরিবার গ্রামে। তাই আতিথ্যের পরাকাষ্ঠা দেখানোর জন্য নিজের বাসা খালি রাখেন ও পরিবার-সন্দর্শনে যাওয়ার ছুতোয় রোজগারের টাকাকড়ি পৌঁছাতে কোম্পানীর কাছ থেকে প্রচুর ছুটি পান।

এ হ'ল বুদ্ধির খেলা ; এ উপায় ধরতেও বলিদত্ত পিছ-পা। অন্যান্য অনেক আশাবাদী কোমর বেঁধে লেগে গেছেন দৈবীশক্তি আবাহনের জন্য। দেবেন্দ্রবাবু, তাঁর বাড়ীতে বারংবার ব্রাহ্মণ ভোজন, বারের পূজা, হোম, যজ্ঞ, মানত, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। একজন দাড়িওলা সাধু অধিকাংশ দিন ওঁর বাসায় থাকেন। এসব উদ্যমই পদোন্নতির জন্য, পদোন্নতি হয়েওছে। চন্দ্রকান্তবাবু কুষ্ঠির ফল ও ভাগ্যে বিশ্বাস করেন। তাঁ'র বাসায় নানাপ্রকার ভবিষ্যৎ বক্তাদের সমাগম। কেউ কর্ণপিশাচী সিদ্ধ, কেউবা ঘড়ি দেখে প্রশ্নের জবাব দেন। কেউ মুখ দেখেই ভবিষ্যৎ বলেন, কেউ হাত দেখে, কেউবা কুষ্ঠি দেখে। নানা গণৎকারদের দিয়ে বিপরীত গণনাফলময় দশাশুদ্ধি তিনি করিয়েছেন। কারো গণনা কারুর সঙ্গেই মেলে না। তবুও যে যখন যা বলেছে রিষ্টিশান্তির জন্য, তা তিনি করেছেন। নতুন গণৎকার খোঁজ করতে তিনি সর্বদা সমুৎসুক। ত্রিগুণা কবচ, দৈবী মাদুলী, অষ্টধাতুর আংটি, বশীকরণ রুমাল প্রভৃতি নানা সম্পদ তিনি জড়ো করেছেন। পদোন্নতির জন্য এ হল তার মার্গ।

বহু অর্থসাধ্য, অনিশ্চিতও ; বলিদত্ত তাই এতেও পিছ-পা।

তবে উপায় ? বলিদত্ত ধাঁধায় পড়ে, কিন্তু আশা ছাড়ে না। বারংবার অন্যদের দেখে, বারংবার ওজন করে বিভিন্ন উপায়, হার মেনে ফিরে আসে, তবুও হাল ছাড়ে না, চেষ্টায় ঢিল্ দেয় না।

সাফল্য-শাস্ত্রের আদিম নীতি অনুযায়ী প্রত্যহ ঘুমোবার আগে ভাবে সারাদিনের কথা, আজ সে অগ্রগতির জন্য কি কি করেছে, আর কি কি করতে পারত, সবই।

অবশ্য, উপায় সম্বন্ধে কতকগুলি স্থূল কথা কয়েকজনকে সে দেখেছে অভ্যাস কর্‌তে; কিন্তু সে দিকে সে উন্নাসিক। এই ত' সেদিনের কথা—আপিসে দেখে দাড়ি-গজানো গুরুবাবু হঠাৎ কামিয়ে সাফসুফ হয়ে এসেছেন। যেন একশ' বা ষাট টাকা ধার মাথায় ঝুলছে তাই, মুখভার থাক্‌ত যাঁর সর্বদা, তাঁর মুখে হাসি ধরে না আজ। ঝক্‌ঝকে মলাটের ইংরেজী একটা সাফল্য-শাস্ত্র পকেট থেকে বের করে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—স্যার, খুব ভাল বই। তা'র প্রথম সূত্রটি লাল পেনসিলে দাগ দেওয়া—"সর্বদা হাস্‌বে।" বেচারা গুরুবাবু! কোম্পানী বাড়ীতে তাঁর বার বছরের চাকরী, যেখানে শুরু করেছিলেন সেখানেই পড়ে আছেন, পরিবারে লোক বেড়েছে। দানাপানির শোকে বার বৎসর পরে, জেগে উঠে হঠাৎ আরম্ভ করলেন হাস্‌তে শেখা। এ'টা স্থূল উপায়; যেন কাটা দেওয়ালে কাদা ছিটানো। যত বৎসর চাকরী বাকী ততদিন তিনি হাস্‌তে পারেন, কিন্তু অবস্থা শোধ্‌রাবে না।

আরও আছে সেইসব লোক যারা অনর্থক খোসামোদের কথা মুখস্ত করে; করুক মুখস্ত তা'রা, বিশেষ কিছু উপকার হবে না।

কারণ, অতি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাময়, অতি জটিল উপায়ের কাটাকাটি, জোড়াতাড়া এখানে, বুদ্ধির খেলা!

তাই বলিদত্ত ভেবে চলে, মাথা ব্যথা করা পর্যন্ত ভাবে। আর এক সম্প্রতি পড়া আত্মোন্নতি পদ্ধতি অনুসরণ করে নিজের মধ্যে অটো-সাজেশন করে- ভাবে তা'র বুদ্ধি বাড়ছে। খোলা আকাশের নীচে বসে, দেহে ভারসাম্য এনে ঐ বিখ্যাত উপায় অবলম্বন করে মনে মনে বলে—

> "বিশ্বকে পরিপূর্ণ করে আছে প্রাণ।
> সেই শক্তি আমি শুষছি নিঃশ্বাসে।
> আমার দেহে প্রাণ পূর্ণ হয়ে উঠছে, ভরে যাচ্ছে।
> আমি প্রাণে প্রাণবন্ত
> আমি চাই চাকরীতে আমার উন্নতি হবে, নিশ্চয়।
> আমি আদেশ করছি—আমার টাকাকড়ি হোক্‌,
> চাকরীতে উন্নতি হোক।"

ভাবনার আর অন্ত নেই, ভাবনার পর ভাবনা উথলে ওঠে, খেই হারিয়ে যায়। তবুও সে অভ্যাস করে, রোজ রাতে, ঘুমোবার সময়।

অবশ্য কোম্পানীর কর্মচারীমণ্ডলীতে সকলকে সে সাফল্য-সজাগ দেখে না। অনেকে আছেন, যাঁদের কার্যপদ্ধতি তা'র সাফল্য-ব্যাকরণের মধ্যে পড়ে না। তবুও, তাড়াতাড়ি বা দেরীতে, কিছু সাফল্য যে তাঁদের কপালেও না ঘটেছে, এমন নয়।

দিবাকরবাবু—বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন বলে সরকারী চাকরী না করে কোম্পানীর চাকরীতে ঢুকেছিলেন। বাড়ীতে খদ্দর পরেন, কখনও কখনও ভাবুকতায় ডুবে থাকেন বলে কাছা খুলে মাটিতে লুটোয়। খড়ম্ ব্যবহার করেন। কেউ কেউ বলে যে, তিনি নিভৃতে যোগ-সাধনা করেন; তা'ই বলে মুখে কখনও তাঁর ধর্মের প্রোপাগ্যাণ্ডা শোনা যায় না। তিনি স্পষ্টভাষী; মন জুগিয়ে কথা গাঁথবার সূক্ষ্ম কলা যেন তাঁর বুদ্ধির অগম্য। শক্ত লোক। লোকে বলে কড়া হাকিম; কখনও নিজের পথ ছেড়ে জেনেশুনে কারও মন খুশী করেছেন—এমন কথা কেউ বলতে পারে না। সান্ধ্য আলাপের জন্য বেড়াতে যান না, সকল গোষ্ঠী এড়িয়ে চলেন। তথাপি লোকের মুখে তাঁর প্রশংসা উচ্ছ্বসিত এবং তিনি ধীরে ধীরে ওপরে উঠছেন, নামডাকে কোম্পানীর দায়িত্বশীল অফিসার।

গতীশ্বরবাবু—প্রচণ্ড তার্কিক, পেটে কথা চেপে রাখার চেষ্টা-মাত্র না করে কথায় কথায় সচিৎকার আক্রমণ চালান, অন্যকে ছিন্নভিন্ন করে কাটেন। যুক্তি ও জ্ঞানের প্রহারে ধুলোয় উড়িয়ে দেন তাকেই, যে তাঁর সামনে মুখ খোলে। খাদ, খাড়াই জানেন না। যাঁদের নাম করলেই সাফল্যকামী হাজার সেলাম্ জানায়, তাঁদের সম্পর্কে কড়া কথা ব্যবহার করে বলেন "চোর, ডাকাত, খোসামুদে।" তাঁ'র বলিষ্ঠ, ফর্সা তক্‌তকে চেহারা তাঁর কথায় জোর জোগায়। টাক্ পড়ছে তাঁর মাথায়—সেই প্রকাণ্ড মাথা তাঁর কথায় জন্মায় বিশ্বাস। মাটিতে মোটা লাঠি ঠক্‌ঠক্ করে ঠোকেন তিনি; তা যেন তাঁর কথায় ঢেরা কাটা। ইনিও বিলাস-ব্যসন-বর্জিত; জীবনে তাঁর একমাত্র ভোগ প্রত্যহ কিনে একপেট পেঁড়া খাওয়া।

অথচ তাঁর কিছুই লোক্‌সান হয় না; সিঁড়ির অনেক ধাপ উঁচুতে তিনি।

এঁদের বাদ দিলে, আছেন আর কতক মাঝামাঝি অফিসার। তাঁরা জানেন শুধু উৎপাদন করতে, দোকানদারী জানেন না। মুখ ও মাথা চেপে খেটে যান। উন্নতির জন্য তাঁদের নেই কোন ঘরোয়া যোজনা। তবুও তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ওপরে ওঠেন, বোধ হয় সময় করে তাঁরা ভাবতে বসেন না, উঠলেন, না পড়লেন। অন্তর্যামী বাবুর কথাই ধরা যা'ক্। ষোল বৎসর পড়ে থাকার পর হালে এখন এক পদোন্নতি পেয়েছেন ও কোম্পানীর কাছ থেকে মিলেছে প্রশংসাপত্র। তবু তিনি চিরকাল গোলগাল, সর্বদা হাসি-হাসি, সদালাপী; পাঁচ মিনিটে পরের কোঁদল মেটাতে ধুরন্ধর; বলেন "আমি আশাবাদী, আমি ফুটবল, আমাকে যত মার আমি তত ওপরে উঠি।"

বলিদত্ত ভাবে এদের কথা; তবু সে আপন সাফল্য শাস্ত্রে বিশ্বাস হারায় না। একটি যুক্তিতে এ সমস্তই সে কুড়িয়ে বাড়িয়ে একধারে ছুঁড়ে ফেলতে পারে, ভাগ্য, এ'রা হয় ত' ভাগ্যবান।

কিন্তু সে ভাগ্যের মুখ চেয়ে পড়ে থাক্তে নারাজ। তাই সে ধান্দার পিছনে ঘোরে। তথাপি বিশ্বাস রাখে, এমনি করে, মৌকা খুঁজতে খুঁজতে নিশ্চয় একদিন আঁধারে আলো দেখবে সে, সুবিধার নাগাল পাবে। কিন্তু কবে? কত দিন আরো? অসহিষ্ণু বলিদত্ত ভাবে। ভাবনার শেষ নেই।

□

কোম্পানী-জগতে গৃহিণীপনা সরোজিনী আয়ত্ত করেছিল ধীরে ধীরে। যত দূরেই যাক্ না কেন, তা'কে তারই সমাজে ঘুরতে হবে। প্রথমে নতুন মনে হ'ত, পরে করে আত্মসাৎ, যেন গোড়া থেকেই তা'র জন্ম তার মধ্যে। এত বড় পৃথিবীতে এত লোক, নানা জাতি, নানা ভাষা। কিন্তু ক্রমশ "জাতি" কথাটা তা'র সংস্কারগত অর্থ ছুঁড়ে ফেলে, গ্রহণ করছে তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, অর্থাৎ, বৃত্তিভেদে জাতিভেদ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি জাতি নয়—মজুর জাত, মালিকজাত, কেরানীজাত, অফিসারজাত, আবার একটা কোম্পানীর কর্মচারীজাত, অন্য কোম্পানীর কর্মচারী

জাত, সরকারী কর্মচারী জাত, উকিল জাত, প্রফেসর জাত, সাংবাদিক জাত।

বাইরের জাতি-বৈষম্য সম্বন্ধে মাথা খাটাবার সুবিধা সরোজিনীর নেই। সে মাঝে মাঝে ঘোরে আপন জাতি-রাজ্যে; দেখে, খতায়, ভাবে, আবার ফিরে আসে আপন গৃহস্থালীতে, যেখানে সে কেবল নারীজাতি।

বাসা ভরে উঠছে। থেকে থেকে অনুভব করে বুঝছে নিতা'র কেরামতি। সন্ধ্যার অন্ধকারে খিড়কির দিকে অচেনা লোকে, কেউ কখনো নিতা'র সঙ্গে এসে আর্জি, ওজর পেশ করে রাখে থলি, রাখে ভেট ও সমাধান হয় রাতে বলিদত্তর সঙ্গে। ঘরকন্নার এ নতুন খেলার মধ্য দিয়ে সে বলিদত্তর সঙ্গে এক সমতলে দাঁড়ায় একত্র হয়ে; ভালমন্দর বাণী বা বিবেকের খোঁচাকে তা'রা দাবিয়ে দেয় একটি মাত্র বাক্যে—"মানুষকে বাঁচতে ত' হ'বে।"

কাজেই বাসা ভর্তি হচ্ছে—কাঁদি কাঁদি কলা, বস্তা বস্তা ধান চা'ল, টাকাকড়ি। দু'জন, উভয়ে লেগে গেছে গৃহসঞ্চয় যোজনায়। কোন একদিন একবার সেই যে শুরু হয়েছিল পাওয়ার মোহ—সে কাজ এখন ঝোঁকে চলেছে।

ক্ষুদ্র বলিদত্ত নিজের তৃষ্ণায় প্রকাণ্ড ভালুক হ'য়ে স্ত্রীর সামনে ব্যাখ্যা করে তা'র নতুন দর্শনশাস্ত্র—"নিজে করলে তা'র নাম কেরামতি; অন্যের বেলায় তা'র নাম চুরি। কিন্তু বড় থেকে ছোট পর্যন্ত দেখ—সবাই লেগে পড়েছে; যে না লাগে সে মূর্খ, বেকুব।" দৃষ্টান্ত দেয়, বলে "পিঁপড়ে খুদ্ কুড়িয়ে নিয়ে যায়, সে কি জিজ্ঞেস্ করে—খুদ্ কা'র? তেমনি। কোম্পানীটা কি? লুটবার কল ত'? সুতরাং যদি—। এই দেখ, মিষ্টার এডোয়ার্ড দু'লাখ; মিষ্টার রাধারমণ এক থেকে তিনলাখ, মেয়ের বিয়েতে মিষ্টার বৈদ্যনাথ মেনন কণ্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে ভেট্ নিলেন ষাট হাজার—গাদা গাদা উদাহরণ। তা'রা দক্ষ লোক। আর 'উড়িয়া দেড় গোড়িয়া', করতে থাক্ বাপ, ছেঁড়া নেংটি পরে ন্যায়বিচার, আগে স্বর্গে যাবি। এ বাবা, আজকাল্‌কার দুনিয়া, সহজ নয়—কর না হ'লে মর। কি বলছে সবাই? আকাল পড়েছে, সঞ্চয় কর, উৎপাদন কর। না হ'লে মর। কোত্থেকে আসবে সঞ্চয় আর উৎপাদন? এ থেকেই ত'।"

বল্‌তে বল্‌তে চোখ মটকে ফিক ফিক হাসে। বিচিত্র দেখায় তা'র

ভঙ্গী। মুখ গোলগাল হয়ে যায়, দেহে মাংস লাগে, স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্যে দেহে ফুটে উঠছে চর্বির চিক্কণতা।

এক কেরামতির কাহিনী শোনায় "এক জায়গায় কোম্পানীর একটা লোহার সিন্দুক ছিল। বুদ্ধিমান বড়বাবুর চোখ পড়ল তা'তে। পরের বছর থেকে খাতায় তা' লেখা হ'ল শুধু 'সিন্দুক' বলে। পাঁচ বছর পরে লেখা হ'ল 'সিন্দুকটি উইয়ে খেয়ে ফেলেছে'। খাওয়ারই কথা, বহু পুরনো সিন্দুক কি না। কেরামতিতে লোহার সিন্দুককে যে উইয়ে খাওয়াতে পারে, সে কি কম লোক? তেমনি—"

কিন্তু বলিদত্ত যতদূর এগোতে পারে হেসে হেসে, সরোজিনী তা পারে না। একটা অহেতুক ঘৃণায় মন তা'র উথলে ওঠে, বলিদত্তর মুখের দিকে খটাশের মত কটা চোখে তাকায়। সে নারী, সে ভাত পেয়েছে, কাপড় পেয়েছে, গয়না পেয়েছে—

তা'ই কি সব?

মাঝে মাঝে উদাস হ'য়ে দূ[illegible] দিকে [illegible] থাকে।

মনে হয়—পাখীগুলো সবই [illegible]। পাতা শুকিয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়ছে; নদী মরে গেছে, [illegible]? নিজে যেন নিজেরই উপহাস; সেই উপ[illegible] বাঁধে, গয়না গায়ে দেয়, খালি চেয়ে থাকে— [illegible] ঘুমের ঝোঁকে, কখনো জাগ্রত সমাধিতে, হঠাৎ [illegible] দূরে ঢেউএর ছল ছল জীবন, যার অসংখ্য প্রবণতা: সেই [illegible] থেকে ভেসে আসে ভিজে হাওয়া, ছ্যাঁৎ করে মরা মন চমকে [illegible] চমকে তাকায়— সত্যিই কি সে প্রতীক্ষায় আছে? [illegible] অন্ত নেই।

☐

সদরে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কভাবে বাইরে তাকিয়েছিল সেদিন। হঠাৎ দেখল সিগারেট মুখে, ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে, হাতে টেনিস্ ব্যাট চমৎকার এক সুপুরুষ আগে আগে ও তা'র পিছনে মুখ গোঁজ করে পতি পরম গুরু বলিদত্ত—দু'জনে বাসার দিকে এগিয়ে আসছে। সরোজিনী ভিতরে ছুটল।

প্রগল্‌ভা সে কখনও নয়, বরং খানিকটা গম্ভীর। নিভৃত মনের নিঃসঙ্গ দীর্ঘশ্বাস সমতালে ছাড়ার অভ্যাস তা'র চিরকালের;

সেই অভ্যাসের বশেই সে তাকিয়েছিল দূরে মর্মন্তুদ সূর্যাস্তের দিকে। তখনই তা'র চোখে পড়ল বাসার দিকে আস্‌ছে দু'জন—ওই পরিস্থিতিতে তা'র মনগহনে খেলে গেল ছোট একটি ঢেউ। হয় ত' তা'র অবয়বেও সেই ঢেউ খেলে গিয়েছিল তা'র অজান্তে; মনে নেই—সে কত উচাটন হয়েছিল। চেতন মনে তা' যেন অজান্তে অযত্নকৃত; সে কথা ভাবলেই রাগ ধরে নিজের ওপরে—ছিঃ! সে কি! অতি ভদ্র, ডাকসাইটে বলিদত্ত দাসের অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রী, লোকের চোখে তা'র কত ইজ্জত, কী সম্মান! চেতন মন এই ভাবে যেন লাঠি উঁচিয়ে খেদিয়ে আসে—ছিঃ, লোকে কি না ভেবেছে? চেতন মন এইভাবে খতিয়ে দেখার সময় অবচেতনে খেলছে তরঙ্গ, এখন তা' স্বচ্ছন্দে বিরাট ঢেউ হয়ে উঠতে পারে—তা'ই নিয়েই ত' নারী সৃষ্টিশীলতায় রানী, লতা সৃষ্টিশীলতায় সুশ্রী। মানুষের মন চিরকালই প্রকৃতির আশ্রিত, ন্যায়ের নিক্তি, ভালমন্দ বিচারের অগোচরে। খতিয়ে দেখতে গিয়ে তা'র মুখ রাঙা হয়, খোঁপা খুলে এলো চুল ছড়িয়ে পড়ে, কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম, জানালার কাছে সূর্যাস্তের রঙে দূরান্তের দিকে চেয়ে তা'র নাসারন্ধ্র ফুলে ওঠে, যেন ঝোপের আড়ালে লুকানো থেকে শিকারীর পদশব্দ শুনে চকিতা বনহরিণী।

"এই হ'ল গরীবের কুঁড়ে, রণজিৎবাবু—এ' আপনার মত নয় মোটেই; আপনি রইস্‌-এর ছেলে, বিখ্যাত লোকের জামাই, নিজেই না কি কম—আপনি পায়ে হেঁটে এসেছেন ধুলো দিতে, পরম সৌভাগ্য আমার।"

"হ্যাঁ, ইচ্ছামত গালাগাল দিন, বলিদত্তবাবু, বাস্তবিক আপনি এত দিন ডাক্‌ছেন অথচ আমি আস্‌তে পারি নি—আমারই ভুল। আপনিও ত' কখনও ডেকে আনেননি, খাওয়াতে হবে বলে নাকি?"

"হ্যাঁ, খেতে দিতে হ'বে বলে বৈকি! বিদুরের ঘরের শাক-ভাত ত'! তা'র আগে, আপনাকে বসাবার জায়গা কৈ?—"

"হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ, কি যে বলেন! আচ্ছা, আপনার এত খালি জায়গা পড়ে আছে, জানালার কাছে, দূরে; কি সুন্দর একখানা বাগান হ'তে পারে। গোলাপ, ডালিয়া, ক্রিসেনথিমাম; ও'পাশে ক্যামা, লিলি, যূঁই, ম্যাগনোলিয়া—আঃ খাসা, বেড়ে হ'ত।"

জানালার দিকে চেয়ে দেখলেন না কি? মনে ত' হল—তেমনই, কিন্তু চেয়ে আছেন সদরের দিকে; বলিদত্ত বলছে "এই ফাঁকা জমি

দেখে আপনার ফুলগাছের কথা মনে পড়ল? বরং, আমি ভাবছিলাম, যদি করা যেত কিছু অধিক ফসল ফলানো, ডাঁটা, ন'টে, বেগুন, ঢ্যাঁড়স, পেঁয়াজ, কুমড়ো, লাউ—"

ফিক করে হেসে ফেলল সরোজিনী ঘরের ভিতরে, ফের তা' চেপে গেল; উনি হাস্‌ছেন—সুন্দর, চকচকে, কাছাকাছি ঘেঁষা দাঁতের সারি; দাঁত এমনও হ'তে পারে? রণজিৎবাবু হাসছেন, ইংরেজীতে কি বললেন সে বুঝতে পারল না; কিন্তু তারপর ওড়িয়া—"আপনার খুব প্র্যাকটিকাল ইনসাইট আছে, বলিদত্ত বাবু! অর্গানাইজিং এবিলিটি অত্যন্ত বেশী। অধিক ফসল ফলানোর কথা আমার আদৌ ষ্ট্রাইক করে নি। কিন্তু ব্যাপার কি, জানেন? এক এক জায়গায় দাঁড়ালে যে, সেই জায়গার মাটি থেকে বেরিয়ে নিজে থেকেই মানুষের মন ছুঁয়ে যায় এক একটা আইডিয়া—পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে। আপনার এখানে দাঁড়িয়ে যতই আপনার বাসা দেখছি, ততই মনে জাগছে ফুলবাগানের কথা, খুব মানাত কিন্তু।"

'ওঃ মানুষ বটে! শিকারী পুরুষ!' সরোজিনী ভাবছে। 'মণ্ডা পিঠের মধ্যে পুর ভরবার মত করে কথার ভিতর মানে লুকিয়ে কথা কইতে পারেন উনি।"

কিন্তু সরোজিনী জানে না—মানুষের আদিম প্রবৃত্তি, প্রথম বৃত্তি—শিকার।

সে চেয়ে থাকে। গানের মধ্যে যেন কাঠের পিপে মেরামত করা হচ্ছে এম্‌নি বেসুরো শোনায় বলিদত্তর কথা:—"আপনি অভিজাত, অভিজাত মাত্রেই স্বভাবে কবি। কাজেই আপনার মনে পড়ল ফুলগাছ; কিন্তু জানেন ত'—অবস্থা দেখে ব্যবস্থা—আমাদের চিন্তা খালি নীচের দিকে, দানাপানি সম্বন্ধে। বাজারে ডাঁটা হয়েছে ছ'পয়সায় একটা, বেগুনও তা'ই, নটের সের ছ' আনা আট আনা—কাজেই ডাঁটা, শাকের কথা—"

"খুব হিসেবী কথা" বাধা দিয়ে বললেন রণজিৎবাবু; "লাগান ডাঁটা শাক, তরিতরকারী প্রচুর হ'লে ত' ভালই; দুধও ত' আক্রা, দারুণ চড়া দর। বাগানের জন্য ভাল সারও ত' পাবেন না। তা হ'লে এক কাজ করুন—বাসার সামনে চাঁচের বেড়া দিয়ে একটা গোয়াল করে ফেলুন, ছ' একটা গাই রাখুন; জানালার সাম্‌নে গাইয়ের ওপর চোখও বেশ রাখতে পারবেন। গোবর গোরচনা

বাগানে সার জোগাবে। গরু খাবার জন্য এর মধ্যে খোল পচাতে পারেন ; পচা খোল বেগুনের জন্য হ'বে ফার্ষ্ট ক্লাস সার। অবশ্য গন্ধ একটু হ'বে, মশা মাছিও সামান্য বাড়তে পারে। তবে, তা'তে কি আসে যায় ? গৃহস্থবাড়ী—গন্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। আর, মশা মাছির জন্য মিউনিসিপ্যালিটি থেকে কিছু ডি ডি টি এনে ফেলাতে পারেন, চাইলে ওরা দেয়—"

রণজিৎবাবু সিগারেটকেস খুলে নিজে একটা নিয়ে আর একটা বলিদত্তর দিকে বাড়িয়ে ধর্‌লেন। সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে রণজিৎ বাবুর দেখাদেখি পা ফাঁক করে, বুকে হাত রেখে আড়া-আড়ি, ওপরের পানে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলিদত্ত বল্‌ল "আরে বাপরে, কী দামী সিগারেট ! এক একটা ছ' পয়সা হয়ে থাকবে বোধহয়—'আবদুল্লা'! আমরা যদি, আজ্ঞে, এরকম সিগারেট খাই ত' পাঁচদিনের মাইনে সিগারেটেই যাবে বেরিয়ে—"

"আপনি বুদ্ধিমান ; এ আমার একটা বদভ্যাস।"

"কেন খান ? সিগারেট খেলে নাকি কাশি হয়, চুল ওঠে, মাথা ঘোরে।"

"হেঃ হেঃ হেঃ, কিস্‌সু হয় না বলিদত্তবাবু, আমি ত' এসব চালাচ্ছি আমার পনের বছর বয়স থেকে। বরং, এ না হ'লে চলে না, এ থেকে ইনস্পিরেশন পাই—"

"লোকে যে বলে—"

"ও'রা হিংসুটে। লোকে ত' অনেক কথাই বলে। কিন্তু মরমীই বোঝে সত্যমিথ্যা। আপনি ত' খুব বড় অফিসার হবেন নিকট ভবিষ্যতে—নিজের অনুভূতি বাড়লে দেখবেন—লোকের হিংসুটে চোখে পরের সুখ সয় না ; লোকে যে বকে যায় ন্যায়, নীতি, মর‍্যালস—তা'র অধিকাংশই খালি জোটবাঁধা ঈর্ষার কথা, আপনি নিজে নিজে সেগুলো ডিসকার্ড করবেন—"

"আমি বড় অফিসার হ'ব, আপনার আগে ?"

"আঃ, আমার কথা ছেড়ে দিন। আমি চাই খালি দিন কাটাতে। সৌন্দর্যের পুজো করি, ফুর্তি করতে ভাল লাগে, আমার দেবতা—আনন্দ ; প্রমোশন সম্বন্ধে ইনটারেষ্টেড নই মোটে—"

"একথা বললে চলবে ? আজ্ঞে। তবে ডিঙি বাইবে কে ? আপনি বড় হবেন, নিশ্চয় হবেন।"

"হোঃ হোঃ—অনেক ধন্যবাদ। সত্যি আপনার সঙ্গে কথা বলে

ভারী আনন্দ পেলাম ; কী ব্রেনস ? এমন বুদ্ধি খুব কম্ দেখেছি।"

"আঃ, খালি দাঁড় করিয়ে রেখেছি আপনাকে—এমনই আমার ব্রেনস ; খেলা শেষে এসেছেন, গায়ে ঘাম ঝরছে—ওরে হর্ষা, হাওয়া কর ত' এসে ; দাঁড়ান, চা বলে আসি। ওরে পান আন্ কি পান খান ? সাদা না দোখতা ?"

"ওঃ, ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন যে বলিদত্তবাবু, বাড়ীতে বর এসেছে নাকি ?—"হো হো করে হেসে উঠলেন রণজিৎবাবু—"দেখুন, মিছামিছি আপনি আমার জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন ; পান আমি খাইই না ; ওরে ছোকরা, সত্যি সত্যি পাখা করতে শুরু করলি যে, যা যা—"

"আচ্ছা, যারে হর্ষা, যা ; দাঁড়ান আমি এখুনি আসছি—"

"হর্ষা, হর্ষ—যা রে ঘোড়া, জলে যা, কাঁহাকা টাট্টু, কাঁহাকা তু' ? যা রে টাট্টু—টামাক টু। হোঃ হোঃ—"

নেপথ্যে সরোজিনী সবই শোনে; শোনে আর ভাবে—তুনিয়ায় এমন মানুষও থাকে, যেন হাসিখুশী উথলে পড়ছে। তবে—

বাইরে থেকে শোনা যায় গুন গুন গীতধ্বনি—

আবার, আবার যেন মনের গভীরে ঢেউ খেলছে; বাইরের রাগিণী যেন ভিতরের প্রতিধ্বনি।

মনমরা হয়ে এই ভর সন্ধ্যায় কিভাবে যেন নিজের কথাও মনে পড়ে যায়—ছেলেবেলায় যে বাড়ীতে সে বড় হয়েছে, সেখানেও এ জাতের লোক বেশী ছিল না—সে এক আলাদা জীবন—যেন পাঁচিল ঘেরা চারিদিক। অতি বেশী তুঃসাহসে সেই পাঁচিল টপকে বাইরে উঁকি দেওয়া যেত, তা'র বেশী কিছু সম্ভব ছিল না। তারপরে গাঁটছড়ার পরের জীবন—যেন ব্যাঙ আর ইঁতুরে দৌড়াদৌড়ি! পথ চলতে পদে পদে বাজে যেন পায়ের ঝাঁঝর—ঝমর ঝম। শুধু পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা, বুঝিয়ে দেওয়া—সীমার পরিসর কতটুকু। তবুও কতবার সে মনে মনে ভেবেছে—তুনিয়ায় কত না জাতের মানুষ আছে। প্রাণবন্ত মানুষ, ফুর্তিবাজ, সুন্দর মানুষ। কিন্তু আজকের মত এত তীব্রভাবে, এত তীক্ষ্ণভাবে সে এর আগে কখনও ভেবেছে কি ? ভাবতে ভাল লাগে, যদিও ভাবলে দেহটা কাঠ মেরে যায়—যেন বাইরে একটি প্রতিমা, কেউ থাকতো যদি মন মাফিক তা'কে বানিয়ে নিয়ে যেত—গতানুগতিক চেনা রাস্তায় নয়, বিপথে, যে পথে কেউ হাঁটে নি, যে বপথের ইশারা আসে মনের গহনে, নাগালের মধ্যে মনে হয় স্বপ্ন !

নিজের মত করে বানিয়ে নিয়ে যেত যদি কেউ, বেপরোয়া এগিয়ে যেত; তা'র দায়িত্ব থাকত না একটুও। এমনই ভাবনায় তা'র সত্তা পায় অনাগত পুনর্জন্ম। বলিদত্ত এসে ফিস্ ফিস্ করে বলল—

"এই, দাঁড়িয়ে আছ কি, গো। ওঠ না, চা কর, খাবার আন; জানো কে এসেছে? খুব বড় একজন, একে হুক করতে হবে।"

"এ্যাঁ, কি বললে—হুক না ফুক, ও আমি পারব না বাবা—"

"আরে, 'হুক' মানে বুঝতে পারলে না? টোপ ফেলে বড় মাছ ধরে না? তেমনই আর কি? এ বড় মাছ—"

"আর, টোপ কে হ'বে? তুমি না আমি?"

বলে ফেলেই মুখের ভিতর জিভ কামড়াল। কিন্তু বলিদত্ত তা'র পরিকল্পনায় এত ব্যস্ত যে কথাটা ধরতে পারল না, বরং বোঝালো—"এ একজন খুব বড় লোক, ওপরওলার ওপরে এর খুব ইনফ্লুএন্স, মানে, প্রভাব; নিজে খুব বড় ঘরের ছেলে কি না, সেই জন্য। আজ কি সুযোগ, বাড়ী ব'য়ে এসেছে আমাদের বাসায়। ভালভাবে খাতির দেখাতে হ'বে, তারপর, সুযোগ একটা পেলে, কোপ মেরে ওপরে, আরও ওপরে—"

কোপ মারার কথা বলেই বলিদত্ত দুই হাত তুলে দিল এক ঝাঁকি। সরোজিনী বলল "বন্ধুটি তোমার ভারি পেটুক, না?"

খানিক বাদে। চা জলখাবার চলছে। রণজিৎবাবু বললেন "একা একা আপনার স্ত্রীর ভারী কষ্ট হচ্ছে, বোধ হয়। তবে, আমাদের বাড়ীর দিকে যদি নিয়ে যান; আমার বাসা ত' ভদ্র-মহিলাদের ক্লাব বললেই হয়। গেলে আপনি বুঝবেন। মনুষ্য সমাজে থেকে যদি আমরা সমাজে না মিশি, তবে বাঁচবার সুখ কোথায়, বলুন? আর এমনিতে, চাকরী বাকরী ত' আছেই—যে কোনও একটা বৃত্তি বৈ ত' নয়? তা'ত' সকলেরই থাকে। তাই বলে সবাই ত' আর সভ্য নয়। লাইফে ফান আছে। ফান জোগায় সভ্যতা। সেজন্যই সভ্য হ'তে হবে প্রত্যেককে। কেবল যে শিক্ষা, দীক্ষা, নীতি—তা নয়। প্রচুর মেলামেশা করে—"

খুব জোরে, খুব জোরে। বলিদত্তর মনে হ'ল গলার কাছে কোটের কলারটা চেপে বসছে যেন। বলল—"আমাদের দোষ কি জানেন? মানে, আমাদের বাড়ীর মেয়েরা বিশেষ ফরওয়ার্ড নয়।" "বিশেষ" কথাটা সে জুড়ে দিল হয়ত নিজের লেজে একটু আত্ম-সম্মান, একটু আত্ম-বিশ্বাস জুড়বার উদ্দেশ্যে। কিন্তু রণজিৎ বাবু

উল্টে বললেন—"ফরওয়ার্ড বলতে লোকে যা বোঝায় আমি সে সব পছন্দ করি না মোটে। 'ফরওয়ার্ড,' 'ফরওয়ার্ড' করে কথাটার একটা খারাপ মানে লোকে করে ফেলেছে; এই যেমন ধরুন—ফাজলামি করে অনেকে বলেন 'স্কিন এ্যাণ্ড স্কিন, নো সিন'—ধরুন একটি স্ত্রীলোক, তাঁর একটি পুরুষের কাছে কাজ নেই কোনও, অথচ লোকে যা'তে তাঁকে ফরওয়ার্ড বলে সেজন্য গায়ে পড়ে সেই পুরুষের সঙ্গে কথাবার্তা, ঘোরাফেরা ইত্যাদি করছেন, তাঁকে কি বলব? তা' ত' সংস্কার দৌরাত্ম্য—"

"হিয়ার, হিয়ার" বলিদত্ত হেঁকে উঠল "আমি ভেবেছিলাম আমিই একা সেকেলে, রক্ষণশীল—বাঃ বাঃ"; বলেই শব্দ করে চায়ের কাপে চুমুক লাগাল।

রণজিৎবাবু বলে চললেন—"রক্ষণশীল বলতে ভুল জিনিষ বোঝায়—ট্র্যাডিশনাল। ট্র্যাডিশান জাতিমাত্রেরই মজ্জা; তা' ছেড়ে দিলে জাতির অস্তিত্ব নেই"।

প্রশংসায় অবাক হ'য়ে বলিদত্ত তাকিয়ে রইল। তা'র মনে আর 'কিন্তু' নেই, নেই খটকা। রণজিৎবাবু বললেন—"ট্র্যাডিশনাল হওয়া আভিজাত্যের লক্ষণ। এই দেখুন, সামান্য টেনিসে—"

"সামান্য নাকি? আপনি ত' চ্যাম্পিয়ন" বলিদত্ত খোঁটা দিয়ে বলল। কিন্তু রণজিৎ বাবু উৎফুল্ল হলেন, বললেন "চ্যাম্পিয়ন হয়ত এই কারণে যে এখানে 'এরণ্ডোহপি দ্রুমায়তে'। কিন্তু যত ব্রিলিয়াণ্ট খেলি না কেন, আসল হোল মানুষের ট্র্যাডিশনাল ষ্টাইল—প্লেসিং হ'লে লোকে অবাক হ'য়ে তাকায়, কিন্তু সেট জেতা যায় না—"

"চমৎকার।"

"আদৌ নয়। যাক, যেতে দিন ও কথা। কিন্তু ফরওয়ার্ড ও রক্ষণশীলের মাঝামাঝি আছে আর একটা জিনিষ—তা হ'ল শিক্ষিত হওয়া—হাবভাবে, রুচি, কথাবার্তা, চালচলনে—যা'তে বিদেশী কেউ আমাদের দেখে না বলে—'খোদাকা চিড়িয়াখানামে উড়িয়া এক জানোয়ার হৈ'—"

"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—"

"এবং ওসব জন্মায় মেলামেশা করতে করতে, লোকদের দেখে; না দেখলে আপনা আপনি জন্মায় না। কালচার বাড়ে সামাজিকতায় এবং আমাদের মেয়েদের পক্ষে তা বিশেষ প্রয়োজন;

কারণ, তা'দের ওপর নির্ভর করে আমাদের অনেক ভবিষ্যৎ উন্নতি—"

"একদম ঠিক" বলিদত্ত বলল "দেয়ার ইউ আর।"

"যাবেন নিশ্চয় আমার বাড়ী" রণজিৎ বাবু বলে চলে গেলেন—"মিসেস দাস যেন যান।"

বলিদত্ত অতি আগ্রহে সম্মতি জানাল।

□

তা'র পরদিন।

কোম্পানীর কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারী বলিদত্ত দাস আপিসে যাওয়ার আগে ভাতের থালার সামনে বসে প্রতিদিনের অভ্যাস অনুযায়ী স্ত্রীকে লেকচার দিতে দিতে বলল—"তোমার—জানলে সরোজ—বদলানো এখন খুব দরকার। যে সমাজে আমরা উঠেছি, সেই সমাজের সঙ্গে তাল রেখে গৌরব অর্জন করে ওপরে, আরও ওপরে উঠবার ইচ্ছা থাকলেও, আমার একার পরিশ্রম যথেষ্ট নয়। তোমারও পরিশ্রম করা চাই, মানে, বেশী নয়। সামান্য দু অক্ষর ইংরেজী পড়া, আধুনিক ঢং-এর অল্প কিছু কায়দা কানুন—এই আর কি। এমনি একটু আধটু। তা হ'লেই আমরা মিশে যাব; নয়ত লোকে হাসবে।" খুব গম্ভীর হয়ে বলেছিল কথাগুলো, বারবার এ রকম বলে এসেছে, সরোজিনী তর্ক করে, বলিদত্ত উত্তেজিত হয়ে বক্তৃতা দেয়, তারপর ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই বক্তৃতা মুলতুবী রেখে হন্তদন্ত হয়ে আপিসে ছোটে। এই নিত্য দিনের নিয়ম।

কিন্তু আজ সরোজিনী প্রতিবাদ করল না।

সে যে না বদলাচ্ছে, তা নয়। সামনেই থাকেন পশু ডাক্তার বাবু। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে চেনা শোনা হয়েছে। তাঁরা খৃষ্টান। তাঁর কাছ থেকে শিখেছে উল বোনা। একটা কুকুরের গলা পর্যন্ত বুনেছে। কুকুরটা শেষ হ'লেই সগর্বে সে তার নীচে নিজের নামটি বুনে দেবে—"সরোজিনী।"

সেই হ'ল তা'র গোপন পাণ্ডুলিপি। হঠাৎ একদিন বলিদত্তকে অবাক করে দেবে নিজের বাহাদুরীতে।

মনে মনে সে'ও অনুভব করেছে ডানা গজাবার কথা; সমাজ—

ঠিক কথা ; সে সমাজে মিশতে চায়।

"ইংরেজী বই একটা এনে দি এবার ; না, কি বলছ ?"

"মা—গো, ইংরেজী ? কে যেন বলছিল—কা'র বাড়ীর বৌ দু'অক্ষর ইংরেজী পড়েছিল বলে লোককে শুনিয়ে শুনিয়ে ডাক পাড়ে 'বেয়ারা-বৃ, শূজ'—তেমনি করবে আমাকে ?"

"মস্করা রাখ, এনে দি ?"

"আচ্ছা, আন—"

"কিন্তু মুখস্ত করতে হবে তাড়াতাড়ি—"

"তাই হয় নাকি ? তুমি কত জলদি মুখস্ত করেছিলে ? আচ্ছা—বলছ যখন, আন একখানা। দেখা যা'ক। হ্যাঁ, তুমি না বলছিলে, কা'র বাড়ী যাওয়ার কথা ?"

"যেতে হয় ত' আগে রণজিৎবাবুর বাড়ী।"

"আজ ত' শনিবার, আজ ফের অমাবস্যার রাত।"

"বেশ ত', আজ যাওয়া যাবে—"

"তুমি তাড়াতাড়ি এলে ত'—"

"আমি তাড়াতাড়ি আস্‌ব।"

□

আজ সে বেড়াতে যাবে। ভাবতে ভাবতে উলের কুকুরটা আর ঘাড় থেকে নীচে বোনা হয়ে ওঠে না। কুকুরের ছবিটি যতই সে দেখে সেটাকে কুকুর বলার মত ইচ্ছা হয় না। এমন কুকুরও থাকে ? তা'র ত' অভিজ্ঞতা নেই। বিলিতি কুকুর না দেখলেও মানতে হবে কুকুর বলে। নয়ত, সে বলত "ভেড়া।" কিন্তু তা'র বলায় কিছু যায় আসে না। দুনিয়ার বাঁধা গত্‌ জারী থাকে।

দুপুর গড়িয়ে গেল। বেলা পড়ে এল। তারপর সে তৈরী হ'ল। বেশী বেশী পান সাজল—যেন কোন দূর দেশে যাবে। সময় খরচ করে করল প্রসাধন—যেন কিশোরী বয়সের কথা মনে পড়েছে। বলিদত্ত ফিরতে ফিরতে তা'র কৌতূহল চল চল; খোলস-ছাড়া বাচ্চা সাপ আর কি ! ক্লান্ত হয়ে ফিরে বলিদত্তও আকৃষ্ট হয়ে দেখল—সরোজিনী বদলে গিয়েছে তা'র পুরনো ব্যক্তিত্ব থেকে।

সরোজিনী বদলে গেছে—বলিদত্ত দেখছিল—আধফোটা পদ্ম ফুলটি যেন, বোঁটায় ঢলঢলে দেখন-হাসি, কথার ফেরে কথা বলে ঠাট্টা করে—নড়ে ওঠে আধফোটা পদ্মফুল, টলটলে জলে নিজের ছায়া দেখে নিজে মুগ্ধ; ফুলে উঠছে। আর সে নিজে? যেন পদ্ম তুলতে যাঁচ্ছে নড়বড়ে ডোঙ্গায় চড়ে; যতবার ডোঙ্গা ঠেলে হাত বাড়ায় ততই নাগালের একটু বাইরে সরে গিয়ে পদ্মফুল মাথা নাড়ায়।

মনে পড়ে সেদিনের কথা—নতুন তা'র বিয়ের বাসর।

স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে কিলবিল ছোট চালাঘর ও ছোট উঠোন—সেখানে বাসন মাজা, হাঁড়িধোয়া জল, এঁটো সকড়ি—জমা হয়ে সৃষ্টি করে ছোট খাটো পচা ডোবা; মশা ভন ভন করে তা'তে। সেখানে বিয়ের প্রথম ক' মাসের নতুন জীবনের যাতুর মায়া বারবার কেটে গিয়ে দাঁত দেখায়। মনে পড়ে, সে তা'ও অনুভব করেছিল। তবুও তখনকার সরোজিনী কেমন যেন অন্য রকমের।

ঠিক কি রকম ছিল—ভাষায় কিংবা ভাবনায় গড়া যাবে না—কিন্তু ছিল সে অন্যরকম।

গরীব ঘরের ঘরকন্নার হাজারো ছেঁড়া নেংটির ভিতরেও তবুও ঝলক দিত তা'র মূর্তিমান আনন্দময় ব্যক্তিত্ব। হাসিখুশীতে, রঙ্গ-রহস্যে সে গড়ে রেখেছিল অপরূপ মায়াজাল। দেখা দিয়েও ধরা না দেওয়ার ভঙ্গীতে, পরিহাসে সে তা'কে তাতায়, তা'র পৌরুষকে উস্কায়, তা'কেই শুধু জয় করার আদর্শকে সজাগ রাখে—তা ছিল বন্ধনের মধ্যে স্বাধীনতার স্বাদ, সে বিজয়ে ছিল আত্মবিশ্বাসের আনন্দ, সে ছিল সেদিনকার সরোজিনী।

মাটির মেঝেতে সতরঞ্চি বিছিয়ে নতুন জীবনের ফুলশয্যা রচনা করে, অলসভাবে চেয়ে চেয়ে বলিদত্ত তখন নিজের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের চেতনায় লীলায়িত হয়ে নীরবে জীবনের পূর্ণতা অনুভব করত, নয়ত ঘুমোত নিবিড় শান্তির কোলে—অশান্ত আকাঙ্ক্ষায় নয়।

তখন ছিল না তা'র বড়লোক হওয়ার আশা কিংবা যোজনা। মাথায় খেলত না সাত পাঁচ বিচার।

খালি সে ও সরোজিনী।

চাকরী? তখন তা বৃত্তিমাত্র, জীবন নয়।

সেই অদেখা আনন্দের প্রতি লোমকূপ-ভেদী নিবিড় অনুভূতির

শান্তিতে হাত পা লম্বা করে, এলিয়ে পড়ে থাকার সময় মনে ঘুরত—ত্যাগের ইচ্ছা—কি উপায়ে সে তা'র স্ত্রীর জন্য সব ঢেলে দিয়ে আরও খুশী হ'তে পারে, তা'ই ছিল তার ভাবনা, তা'র সুখ।

নিজেকে সে নিজেই সজাগ করার জন্য ভাবে:— যখন বিয়ে করতে নিতান্ত নারাজ ছিল, নিজের দারিদ্র্যের জন্য—একবার তা'র বুড়ো বাপ বলেছিল "কি বলে তোকে বোঝাব রে পাগলা। এ হ'ল বেহায়ার কথা। বিয়ের জন্য চাই না ধনরত্ন; একটা পেট আর দু'টো পেটের মধ্যে তফাতই বা কত? আসল কথা—ঘর করা, সংসার পাতা। স্ত্রী চায় পুরুষ; পুরুষ চায় স্ত্রী—আর কথা কি? মন যদি মেলে ত' এক কাঁসি থেকে এক মুঠো ভাত দু'জনের, এক কাপড়ের দু'খুঁট দু'জনের "ধানের ভিতর চাল"—এই ত' ব্রহ্মজ্ঞান। কি যে ছোঁড়ারা বকে—'টাকাকড়ি নেই, রোজগার নেই, বিয়ে হয় কি করে?' তোমাদের মত বুদ্ধি সকলের হলে তোমরাও জন্মাতে না, কেউ বিয়েও করত না দুনিয়ায়, সংসার পাতত না কেউ কখনও। যুগে যুগে বেশী লোকেরই ত' 'নেই-নেই'—ক'জনের বা কিছু আছে?"

তখন সরোজিনীর মায়ায় মনে পড়ত বুড়ো বাপের কথা মাঝে মাঝে। গরীব অবস্থাতেই ত' সে বিয়ে করেছিল, পস্তাতে হয় নি ত'।

কোন্ ছলে অন্ধকার থেকে উঠে দাঁড়ায় অতীতের ঝলকানি। রণজিৎ বাবুর বাড়ী বেড়াতে যেতে যেতে সে দেখে অতীতের সেই সরোজিনীর এক ঝিলিক।

তবুও আজকের যোজনাবাদী বলিদত্তর কল্পনায় খেলে অতীতের সেই মন-দেয়া-নেয়া দিনগুলোর চারপাশে জমাট অন্ধকারের পাতাল-পুরী, দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মনে পড়ে বারবার—অভাবের সেই ফাঁক তা'র জোড়া হয় নি, সারানো হয় নি। জীবন হয়ত হত অন্যরকম যদি থাকত ধনবল।

মনে মনে সে তুলনা করে—মর্মর প্রাসাদে বসে যে প্রেম, ঠিক সেই প্রেম কি পাওয়া যায় কুঁড়ে ঘরে? বড় কুঠির বাগানে ফুল-গাছের ফাঁকে ফুলফোটা, লতাজড়ানো ঝোপের আড়ালে যে পিছু-নেওয়ার খেলা, ঠিক সেই আনন্দ কি পাওয়া যায় পোকা-খাওয়া কঞ্চির বেড়ার আড়ালে ঝিঙে লতার তলায়? স্যাঁতসেঁতে খিড়কির দিকে ঝাঁঝরা পাতা বোঝাই ঢ্যাঙ্গা ঢ্যাঙ্গা ডাঁটা আর ঢ্যাঁড়স গাছের ফাঁকে? অসম্ভব—বলিদত্ত ভাবে; জীবনের একাংশ, অভাবে

শুকিয়ে সিঁটিয়ে ঝরে গেছে ; সে কিন্তু হ'তে পারত ভিন্নরকমের।

দালান-দলিজ. কোঠাবাড়ি, তাতে বাগবাগিচা, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কড়ি, একটা মোটরগাড়ী—যা ইচ্ছে তা কিনবার ক্ষমতা—এসবের পটভূমিকায় নতুন বিয়ে কি ভিন্ন রকমের হ'ত না ?

এখনও সময় আছে, বহুদিন পড়ে রয়েছে সামনে ; জীবনভোর আশা, জীবন হ'তে পারে মনমাফিক, তা'র উপকরণ জোগাড় করার জন্য দানাপানির যুদ্ধে ষাঁড়ের দেহবল, শিয়ালের চতুরতা—সবই সে প্রয়োগ করবে। কেবল মানুষের হৃদয়, মানুষের বিবেক—এসব সে রেখে দেবে তাদের জন্য, যাদের চিন্তা করা দরকার হয় না। সে দুর্বলতা তা'র নেই, তা'র পক্ষে শুধু উদ্দেশ্যমুখী উপায়।

দানাপানির যুদ্ধ—অতএব চাকরী—তা'র কুরুক্ষেত্র, তা'র ধর্মক্ষেত্র—রণজিৎবাবুর কাছ থেকে কি উপায়ে সুবিধা হাসিল করা যায়—এই তা'র বর্তমান চিন্তা।

শেষে সেই তার নিত্যকার অবসরের ভাবনা—চাকরী, ফন্দী— ; ভাব্‌লে মানুষ বড় হয়, বলিদত্ত উপায়ের ফল কষে দেখছিল, সরোজিনীর অস্তিত্ব ভুলেছিল—তা'র কাছে চাকরী, খালি চাকরী।

চলেছে আগে আগে সরোজিনী ; তা'র মনে হচ্ছে যেন বিয়ের আগের দিনগুলোর মত, যেন সে মুক্তি পাগলিনী। মনের গহন গ্রহণ করেছে সংকেত, পথ দেখাচ্ছে দৈব, পবনে বিজলীর আমেজ, রক্তে তা'র উৎপ্রেক্ষণ।

জীবন—তা'র লক্ষ বাঁকের মাথায় লক্ষ অনুভূতি। আজ কি ?

□

তা'র কাহিনী—মানুষের।

সে ত' শুধু অবয়বের নয়, পিতৃপুরুষের বাস্তব দেহের ওপর শ্রী মেণ্ডেলে'র তথ্যের সার্থকতা। ফিল্মের জন্য নেই তা'র চেহারা, কাব্যের যোগ্য দেহ—লালিত্যও নেই। অসম খাদ্যে অপুষ্ট চলনসই কায়া। তাতে গর্বের কিছু নেই, লজ্জারও কিছু নেই।

কাহিনী শুধু তা'র মন গহনেরও নয়। অন্ধকারে অপর্যাপ্ত ভূত-প্রেত। আলোর পথমুখে অসংখ্য লাঠিধারী প্রহরী। নিঃসঙ্গ মুহূর্ত, তা'র জীবনে আসে অল্পই। তখন কোন্ প্রহরী চক্কর মেরে যায় !

কেউ ফেলে একগুলি আফিম্—সবাই ঘুমিয়ে পড়ে; কিন্তু ক' মিনিট? গোটা জীবনের কতটুকু ভগ্নাংশ? শুধু প্রহরা—স্বতন্ত্র মন ভয়ে পঙ্গু—ক্ষতির ভয়, সমাজের ভয়, দারিদ্র্য, মৃত্যু, নৈরাশ্যের ভয়—কেবল ভয়। খালি সম্ভাবিত প্রবণতার ইতিবৃত্ত, তা'র কাহিনী নয়।

তা'র কাহিনী—শুধু সে ত' নয়, মানুষের দলে তা'র বিকাশ। তা'র বিকাশ নেই, সে নগণ্য পিঁপ্ড়ে। এক ঝাঁকের একটিমাত্র—সেইটুকুই সে।

কাহিনী তা'র সাফল্য-বিফলতাময় জাগতিক ঘটনার বর্ণনাও নয়। একটার পর একটা চল্তি সমস্যার সংঘর্ষ, সাত পাঁচের হিসাব। ঘটনা নেই, আজকের ঘটনা কাল ভুলে গেলে—ঠানদির গল্পের ঝুলি হয়ে পড়ে। গ্রাফ্ এঁকে দেখলে, সামান্যই উঠতি পড়তি—সমান নয়।

তা'র কাহিনী নয় প্রকৃতি সম্পর্কে তা'র অবস্থিতির পরিচয়। প্রকৃতি, নিত্যই তা' আছে। এত বড় আকাশ, তা'তে কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, নানা বর্ণ, নানা ছবি, নানা ভাব। তার তলায় খাল, খাদ, পাহাড়, সমতল—অসংখ্য দৃশ্য। প্রকৃতি, গাছলতা, শস্য, গাইগরু, পক্ষী, পশু থেকে কোষ-মাত্র "অ্যাল্জি" পর্যন্ত! তার কোন স্তরে হারিয়ে যায় নগণ্য বলিদত্ত; হারিয়ে গিয়ে সে বাইরের প্রতি বিশিষ্ট চেতনাও হারায়। জলের মাছ দূর থেকে জল দেখ্তে পারে না, সে সুবিধা পায় না খতিয়ে দেখ্তে স্রোতের তোড়, স্রোতের গতি। আকাশে কবে কোন্ তারা ওঠে, কি ধরনের চাঁদ দেখা দেয়—এ সবের দিকে তা'র নজর নেই। সে দেখে না দূর দিগ্বলয়ে কবে কোন্ ভাব, কখন কোন্ দৃশ্য বিরাজ করে। ছেলেবেলায় সে দেখেছিল রাতের আকাশ। বাড়ীর সদরে মাদুরে শুয়ে ওপরে তাকিয়ে সে দেখেছিল চাঁদ ও মেঘের দৌড়াদৌড়ির খেলা। তারপর আর না। তারপর আকাশের বদলে, ওপরে যদি ঝুল্ত সেলাই-করা চটের চাঁদোয়া, তাহ'লেও সে সজাগ হত না, যদি না তা'তে তা'র কাজ আট্কাত। গাছ সে প্রচুর দেখেছে, তেমনি মাড়িয়েছে পায়ের তলায় ঘাস। অনুভব করেছে সে সব শুধু প্রবৃত্তিতে, তার ভাবনায় তা'রা স্থান পায়নি।

তা'র কাহিনী নয় অনন্ত সময়ের সম্পর্কে ভাসমান ভাবরাজি। সব বাস্তবতা, সব জড়ত্ব লোপ হ'য়ে কেবল মহাশূন্যের তরঙ্গ—আগা

নেই, শেষ নেই, মাঝখানে নেই কিছু ; অ্যারিষ্টটল প্রবর্তিত কাব্য সূত্রের নীতি নেই, ত্রিস্তর নেই ; কেবল আছে রসঘন অনুভূতি, এক এক স্পন্দনে যা'র পরিপূর্ণ ইতিহাস, সূত্রে মণিগণা ইব—গাঁথা রয়েছে সময়ের ডোরে ; যে দিক থেকেই মালা জপ, জীবনের নাম উঠ্‌বে, সহস্র লক্ষ নামে সেই জীবন জপ—পবিত্র ভাগবত নাম।

সে'ও নয় তা'র কাহিনী—বেচারা বলিদত্ত 'সময়' মানে বোঝে ঘড়ির দুই কাঁটার অবস্থিতি একটা গোল চাকৃতির ভিতর। সব জায়গায়ও সে আট্‌কে থেকে দেখে না ; সকাল থেকে নিত্যকর্মের সময় ও প্রত্যহ দশটা থেকে পাঁচটা—আপিস্—সেইটুকু। সময় নয় নির্ঘণ্টে সূচক। তা'ও তা'র কাহিনী নয়।

সবকিছু মেশামিশি—মানুষের সত্তার এই ছ'দিক্ ছ'টি ডাইমেন্-শনময় ; এ'রই এক একটিতে নানা লাস্য, নানা ছটা। আবার এগুলোর মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াজনিত সমাহৃত সম্বন্ধ থেকে সহস্র সহস্র রূপ। অদৃশ্য জহুরী কারিগরের হাতে অসংখ্য আঁশকাটা মুখ, সেই একই হীরার ; নগণ্য বলিদত্ত দাস কোহিনূরের মত আলোর ঝলক্ হানে, আলোয় উদ্ভাসিত হয়—সেই তা'র কাহিনী. নীরব, ভাষাময়।

চলেছে সে, সে চলে এসেছে। অতীতের যুদ্ধ-কুয়াশায় হারানো কত সহস্র বর্ষ পূর্বের আদি পিতৃপুরুষদের যুগ থেকে। কখনও কোথাও অনুপ্রাস পড়েছে চেতনায়, শক্তিপাত অনুপ্রাসে সৃষ্ট হয়েছে দেবতা ও আদর্শ। আজ হয়ত দেবতারা গড়া—তা'র দানাপানির চেতনায় ; দেবতাদের সে পূজা করছে, নাম দেয় নি তাঁদের।

তবুও চলেছে—

□

বেড়ার ফটকের অন্যদিকে রাস্তার পাশে তিনখানা মোটরগাড়ী, দু'খানা ঘোড়াগাড়ী। সবই থেমে, স্থির।

রাস্তা যেন ঘুমন্ত ; মাঝে মধ্যে এক আধ জন পথিক—একই দিকে চলেছে, জুতোর শব্দ দূর থেকে দূরে খস্‌খস্ করে ; তারপর আবার

সব চুপ্‌চাপ্‌। বাগানের জমাট অন্ধকারের ওপাশে ঘরের ভিতর থেকে সাদা আলো ছিট্‌কে পড়ছে, অন্ধকার বাড়াচ্ছে তা'র শ্রী। থেকে থেকে উঠছে সমবেত হাসি ; তা'তে জান্তব উল্লাস বা আর্তনাদ শুন্‌লে চমক লাগে।

"এ'টাই রণজিৎবাবুর বাড়ী"—বলিদত্ত বল্‌ল।

"এটা!" সরোজিনী ভাল করে তাকাল—ছোট "এটা" শব্দে যেন তা'র কাকলী ; বড় ফটক্‌, বড় বাগান, বড় পাকাবাড়ী, সব মিশিয়ে বড় ঘর—বুকের ওপর চেপে বসে—এত ফুলের সমারোহে কি মানুষ থাকে? এ'ও জীবন।

একটা ঈর্ষার দীর্ঘশ্বাস।

তারপর রেষারেষিতে চোখা হয়ে ঝলসে ওঠে মন। দেখা যাক্‌।

"মা গো! এতবড় বাড়ী অথচ ফটকে আলো নেই কেন? দেখে শুনে চল। হোঁচট্‌ খাবে"—সরোজিনী বল্‌ল।

অন্ধকার রাস্তা, লম্বা পথ—দু'পাশে অন্ধকারের লহর খেলছে, চমক্‌ জাগায় টাটকা ফুলের ভিজে সুবাস। বহু ঝোপ ঝাড় ; অন্ধকারের আড়াল থেকে গহন মনের নীরব প্রবণতায় সঙ্কোচ লাগে যেন—সরোজিনী না ভেবে থাকতে পারে না।

বলিদত্ত ভাবতে চেষ্টা করে কে কে এসেছে সেইসব মোটরে, ঘোড়াগাড়ীতে। চেনাশোনা, দেখাসাক্ষাতের সাহায্যে কিভাবে সে সুবিধা হাসিল করতে পারবে তা'র চাকরীর বাড়তির জন্য। তাই সে কান পাতে হাসিতে, মনোযোগ দিয়ে শোনে গলার স্বর—মুচকি মুচকি হেসে পথ চলে আশাবাদী।

"সুন্দর বাগান"—সরোজিনী বলল।

"ডাকি, দাঁড়াও" বলিদত্ত বল্‌ল "কে আছ ওখানে? রণজিৎ-বাবু আছেন? কে ভীমা?" ভীমা চাপ্‌রাশী। "যা, বল্‌গে যা—"

বেশীক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হ'ল না। খট্‌ করে সুইচ্‌ টিপে বাসার সদর আলো করে হাস্‌তে হাস্‌তে দাঁড়ালেন রণজিৎবাবু।

ঢিলে ডোরাকাটা পায়জামা, ঢিলে পাঞ্জাবী, সুঠাম দেখাচ্ছে নধর শরীর, হাসি হাসি মুখে অপরূপ চাউনি। হঠাৎ চোখের পলক্‌ ধাঁধিয়ে আলোয় ঝিকিয়ে উঠল বাগানের ফুলপাতার ঢেউ-এর পর ঢেউ, বাইরের ঘরের সাজসজ্জা, ছবি প্রভৃতি। ঝাপ্‌সা চোখে সরোজিনী দেখল সদর দোরে দাঁড়িয়ে রণজিৎবাবু।

"হ্যালো মিষ্টার দাস! নমস্কার, নমস্কার, আসুন আপনারা। আঃ, বহু ভাগ্য, বহু ভাগ্য, আসুন, আসুন—" তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে যাচ্ছেন্—এক এক পদক্ষেপে শরীরটা টেনে নেওয়ার ভঙ্গীতে, কসরত্ করা চলার ঢং, সুন্দর মানুষের দেহের বিশিষ্ট ভঙ্গীগুলো—চলা মানেই যেন পদে পদে 'পোজ্' দেওয়া। "আসুন, আসুন, মা, মিলি, নিলি, বিন্দ্—কোথায় গেলে সব?"

"সব" মানে অনেকে, হঠাৎ একবারে ফর্দ পড়া যায় না।

ওদিক থেকে শোনা যায় একটা গুঞ্জন, বাড়তে বাড়তে কাছে আসছে।

বেচারা বলিদত্ত এদিক ওদিক চাইছে। সরোজিনীর পা যেন চলতে চায় না; পৌঁছে গেলেন তাঁরা, অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যারা।

"মিষ্টার বলিদত্ত দাস, আমার সহকর্মী, ইনি হালে বদ্লি হয়ে এসেছেন এখানে—মিসেস্ দাস্—"

"নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার—"

"আপনিই মিষ্টার দাস; আপনার নাম এত শুনেছি যে, মনে হচ্ছিল চিনে ফেলেছি আপনাকে—বহু ভাগ্য—"

"এ আমার সিষ্টার মিলি, বলিদত্তবাবু, হুঁশিয়ার্—টার্ট্ অ্যাজ্ এনিথিং—"

"আঃ দাদা কি যে কয়—"

"এই, আর একটি—নিলি; বোন্ নয়ত'—তু'তু'টো মহাজন; আজকাল বর পাওয়া যে কী কষ্ট!"

"আরে—"

"আপনি ভাগ্যবান, রণজিৎবাবু—"

"আর, এ বিন্দু, মানে মিসেস্—"

"হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ।"

"লজ্জা পেয়েছে বিন্দু, দাদার যা ইণ্ট্রোডাকশন্, অ্যাটম্ বম্—ইউ নটি বয়—" দাদার থুঁত্নিতে আঙ্গুল গুঁজে দিল মিলি। বিন্দু সরোজিনীকে প্রায় কোলে করে ঘরের ভিতর দিকে চল্তে শুরু করেছে; মিলি আর নিলি—তু'জন বলিদত্তর তু'দিকে বডি-গার্ডের মত, উভয়েই বলিদত্তর চেয়ে ছ'ইঞ্চি লম্বা।

শোভাযাত্রা এগোল।

কিন্তু বলিদত্তর যেন হুঁস্ নেই আর। ক্ষণে ক্ষণে হুঁস্ হচ্ছে যেই সে নাকে পাচ্ছে উৎকট কি একটা বিদেশী সুবাস; তা'কে চঞ্চল

করছে, উগ্র করছে, অতি উগ্র, অতি ঝাঁঝালো করে তা'র সত্তাকে ঠেলে দিচ্ছে উত্তাপের স্তরে। তারপর সে যেন গলে যাচ্ছে, ভাপ্ বেরুচ্ছে তা' থেকে, তা'র হুঁস নেই, চল্ছে আপনা আপনি। আবার হুঁস ফির্ছে, দেখ্ছেঃ—মিলি, নিলি আর বিন্দু, তিনজনেই মিশে একটা অপরিচিত দুনিয়া।

শুধু সুগন্ধ—আর রক্তের মত রাঙা ঠোঁট, বরফের ওপর ভোরের আলোর মত মুখ; মিলির খোলা বাহু, সালোয়ার পাঞ্জাবী—ফিন্‌ফিনে পাত্‌লা। ওপরে অধিক আচ্ছাদন নাকি দম্ভের পরিচায়ক, তাই; সে সবুজ পরী—নিলির বেশভূষা অবিকল সেইরকম, কিন্তু সে গোলাপী পরী। উভয়ের দু'ভাগ করা বেণী গঙ্গাযমুনার মত বুকের ওপর উঁচু উঁচু চূড়া বেষ্টন করে বয়ে যাচ্ছে নীচের দিকে, নেমে গেছে সূঁচালো হয়ে; কম্পাসের কাঁটার মত দু'টিরই নীচের শেষ বিন্দু—কিংবা কালো সাপের লেজ যেন। ওপরের পোষাকে দু'জনেরই সূঁচালো ভি-এর মত কাটা বুকের আচ্ছাদন, তা'র মাঝে ফাঁকের ইশারায় দু' দু' ইঞ্চি বর্তুলতার পরিসর, মধ্যে গভীর উপত্যকা, তার ওপর শোভা পাচ্ছে একটি রাঙা পাথর বসানো পদক, তা'র নীচের দিক কোণাচে নিক্তির Falcrum কাঁটার মত। সুন্দর ভি আকৃতি, দিগ্বিজয়ী ভি আকৃতি—কোথায় যেন দেখেছে! ঠিক্, ঠিক্—গত মহাযুদ্ধের সময় "ভি" চিহ্ন ছিল বিজয়ের সংকেত, "ভি ফর ভিক্টরী —ভি ফর্—"

তখন অক্ষশক্তি থরথর, আজ থরথর ক্ষুদ্র বলিদত্ত। হুঁস লোপাট্, ভাপে ভাপে গলদ্ঘর্ম—ফের ফিরছে চেতনা—নারীরূপ কি সুশ্রী! সত্যিই, আচ্ছাদন, বল্কল নয় যে শুধু চাপা দেবে, মানুষকে করবে আষ্টেপৃষ্টে মাদুরে মোড়া বিছানার বাণ্ডিল আর তা'র নীচে দুখানি পা, গোড়ালি থেকে। আবরণ হ'তে পারে রূপের আভরণ, লুকোতে নয়, দেখাতে—। কী সুন্দর! কী সুঠাম! কী লালিত্য! মানুষের দেহের ঢল—ঢেউ'এর মত তা'র সংকেত সৈকত, চলনেও ঢেউ খেলে।

আর সাম্‌নে বিন্দু; শাড়ী পরেছে; তা'ও আবরণ নয়, আভরণ। ব্লাউজ্—সেখানেও যেন ভি-এর জয়জয়কার। ওপরে এক কাঁধে ঝুলছে শাড়ী—তা'তে গিঁট যেন ফুলের মত—সবই রক্ত রাঙা, যেন দেহ ঘিরে রয়েছে একটা লাল কুয়াশা। ভাবলেই হুঁস্ থাকে না।

তা'র পাশে চলেছে সরোজিনী—কাঠের পুতুল মোটা ন্যাক্ড়া-জড়ানো, ঠক্ ঠক্ করে এগোচ্ছে।

নতুন দুনিয়ার সঙ্গে প্রথম মোলাকাতের ধাক্কায় নিজের ওপর শুধু ধিক্কার। কৈ তা'র সভ্যতা? সভ্যতা না সৌন্দর্যের জন্য? সহজ গতি, সুন্দর রূপ, সুন্দর পরিবেশ, তা'র সঙ্গে চিন্তায় সৌন্দর্য। আর সে? কত নীচে! কত ফারাক্, তা'র আর এ দুনিয়ার মধ্যে। তা'র নেই সে শিক্ষা সংস্কৃতি; মনে নেই সেই সহজ আভি-জাত্য। গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব ভাবনা। কখনও সে এই দৃষ্টি-কোণ থেকে ভাবে নি। তা'র শুধু—চাকরী, কোম্পানীর কাজ, আপিস; সেখানে অবশ্য তা'র দম্ভের অবকাশ আছে। এখানে তা'র পা উঠে যাচ্ছে মাটি থেকে, এ মেঝেয় পা ফেল্‌তে কুণ্ঠা লাগে, এখানে সে থই পায় না। সে চল্‌ছে যন্ত্রের মত; সে সালিশ খোঁজে, মনে পড়ে 'হর্ষা'। ঠিক্, ঠিক্, সে ক্লান্ত, বাসায় ফিরে হর্ষার হাতে এক চোট ডলাইমলাই চাই। পরিস্থিতি ততক্ষণে সয়ে গেছে তা'র।

যেন জেগে উঠে সে দেখে টেবিলে আছেন অন্য তিনজন—মোটা-সোটা প্রৌঢ়া একজন উঠে আস্‌ছেন—

"এই মা—" রণজিৎবাবু বল্‌ছেন—"মিষ্টার ও মিসেস্ দাস—বলিদত্ত দাস—"; "নমস্কার—নমস্কার—নমস্কার।"

"আর, পরিচয় করিয়ে দি—মিষ্টার সাক্‌লাতওয়ালা, বিখ্যাত কণ্ট্রাক্‌টার—এখানে কোম্পানীর চিঠিপত্রে আপনি বরাবর এঁর নামই পাবেন। মিষ্টার ত্রিপাঠী—স্বনামধন্য নেতা। মিষ্টার ব্রতচারী —আমাদের কোম্পানীর সহকারী বড় সাহেব, দেখা হয় নি বোধ হয়, অধিকাংশ সময় ট্যুরে থাকেন কি না—মিষ্টার বলিদত্ত দাস—।"

চেনাশোনা, পরিচয়—অকারণ মনে পড়ে বন্ধুর বাসা, সেখানেই এইরকম খালি পরিচয়, পরিচয়—

কিন্তু সেখানে সন্টুদার কথার মধ্যে চাপা ছিল মোটে একটি লাইন কথাই—পরিচয়টা মুহূর্তে ঝল্‌সে উঠত, তারপর কেউ কাউকে চেনে না।

সাক্‌লাতওয়ালা সরোজিনীর দিকে মুখ করে বস্‌লেন। মিষ্টার ব্রতচারী গম্ভীরভাবে নীচে মুখ নামালেন, শুধু তা'র চোখ জোড়া মাঝে মাঝে ওপরে তুলে পরিস্থিতির সার গ্রহণ করে। মিষ্টার ত্রিপাঠী হেসে হেসে অনুকম্পায় কৃতকৃত্য ক'রে বলিদত্তর প্রতি

সম্ভাষণ শুরু করেন, যদিও তাঁর চোখের জ্যোতির ছটা তির্যক্।

নমস্কার ও চেনাশোনার ঝাঁঝালো পালায় ঝল্‌সে গিয়ে সরোজিনী ঘোমটায় মুখ ঢেকে বসে থাকে। বিন্দু চেষ্টা করে তার সঙ্গে কথা বলতে। সরোজিনী ঘেমে নেয়ে দু'এক কথা বল্‌ছে। বলিদত্তর নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে, কি বলছে সে তা' জানে না। এইটুকু বুঝছে—বোকার মত বকছে, যা বলবে ভাবছে, বল্‌ছে তা'র উল্টো কথা, উল্টো কথা কে যেন তাঁকে দিয়ে বলাচ্ছে; সব কথার গুঞ্জনে বুঁজে যাচ্ছে তা'র কথা; সবাই হাস্‌ছে, সে'ও হাস্‌ছে।

□

এই ছিল আরম্ভ,—সরোজিনী ভাবে—কত পাগল করা রাত! ঝপ করে বিদ্যুৎ চম্‌কায় সে রাতের স্মরণে; মনে মনে অবিশ্বাস হয়; এত কিছু ছিল তার মধ্যে, অথচ—

মানুষ বোধহয় নিজেকে চেনে না যতক্ষণ না সে পরের মুখে শোনে, সে নিজে কি? পরের মুখে তারিফ—শুন্‌তেও মিঠে—সত্যিই কি মিঠে? সব কথাতে ক্লান্তি আসে ঘুরে ফিরে শুন্‌লে কেবল প্রশংসা বারবার শুন্‌তে মিষ্টি।

সরোজিনী অবিশ্বাস করে ভাবতে শিখেছে বলে, নিজের ওপর তা'র ধারণা, কালক্রমে নিজের ভিতর আবিষ্কার করেছে কত বুদ্ধি, কত ফন্দি, কত হিম্মৎ—

আবার কত রুচি, কত মতামত, কতরকমের বিশ্বাস, কত জ্ঞান, কত প্রবণতা—

রুচির একটা সাদাসিধে কথাই ধরা যাক;— আগে সে কখনও জান্‌ত না যে, খোঁপা বেঁধে ডান দিকে আঁচল দিয়ে, তা'র একফালি খুঁট টেনে এনে দুইবাহু খোলা রাখলে তা'কে খাসা দেখায়—ভাল লাগে প্রসাধনও। নখ রাঙিয়ে পালিশ না করলে বারংবার মনে পড়ে জন্তুর থাবা। মতামতের কথা অনেক, সে বিষয়ে সে নবাগতাদের উপদেশ দেয় আজকাল—আচরণ থেকে বিচার পর্যন্ত বিষয়ে, ছোট থেকে বড় বড় কথা পর্যন্ত। অতি ছোট কথা—সভ্য ও অসভ্যের মধ্যে সরল ভেদ পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণে। সভ্যতার বিশিষ্ট ভেদ আছে এবং তা পরীক্ষিত, উপকারে যাচাই করা:—

যথা, জুতো। জুতো না পরলে পা নষ্ট হয়—এতে কার দ্বিমত থাক্তে পারে? নিজেকে আনন্দে না রাখলে সংসারকে আনন্দ দেওয়া যায় না। সুতরাং যারা নিজেদের শুকিয়ে মারে, তা'রা শেষে ঠকে। তা'র বিশ্বাসের নমুনা—সে ভাবে, সংসারে যে যেভাবে আছে তা তা'র পরিশ্রমের ফল—মানুষ প্রায় নিজের ভাগ্য নির্মাতা। বলিদত্ত এ অবস্থায় আছে, কারণ এ অবস্থা তার প্রাপ্য; আর একজন মজুর খাটছে; সে অবস্থা তার প্রাপ্য। সুতরাং, সংসারে ছোট বড়, উচ্চনীচ, ধনী-দরিদ্র ভেদ কেবল যে আছে শুধু তা'ই নয়, এ ভেদ একপ্রকার নিয়ম ও সে নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। সরোজিনীর কল্পনায়ও মূল্যের তত্ত্ব পরিশ্রম-সাপেক্ষ, কিন্তু তা'র তথ্য বিন্যাসের প্রণালী অন্য রকম—এই যা! তা'র এ হেন বিশ্বাসে পরের দুঃখে দুঃখ বা দরদ অবান্তর। যে যা হয়েছে তা' যদি হয় তা'র পরিশ্রমের ফল বা পরিশ্রমের অভাবের ফল, তবে তা'র প্রতি সহানুভূতি বেকুবী ছাড়া আর কিছু নয়। বরং দরদ দেখানোর সেই সময়টুকু নিজের কাজে ব্যবহার করলে উপকার হয়।

এতগুলি ধারণা তা'র নতুন আমদানী; এ ছাড়া আছে কত নতুন জ্ঞান। সরোজিনী এখন ছাপা কথা পড়ে শিক্ষিত লোকেদের মতই। প্রথমে খবরের কাগজ; তা'তে দেশ-বিদেশের খবর পাওয়া যায়। খবর চর্চা করার জন্য দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান "অতি জরুরী" যদি কেউ বলে তবে মিলির ভাষা অনুকরণ করে সরোজিনী সহজে বল্‌তে পারে "আমি আপনার সঙ্গে একমত নয়।" "ওয়াল্ ষ্ট্রীট্ ভেঙ্গে পড়ছে, আহা ভেঙ্গে পড়ছে।" বেশ মজা। ওয়াল্ ষ্ট্রীটের মত একটা খট্‌মটে নাম ওড়িয়ার মুখে। তবে অবশ্যই তা ভেঙ্গে পড়ার মত চিজ্, কারণ, খবর কাগজ তা' ছেপেছে; অতএব, এক কাপ চা হাতে, পায়ের ওপর পা রেখে বেশ আলোচনা চল্‌তে পারে তা'র ওপর—"আপনি ওয়াল্ ষ্ট্রীট জানেন? আজকের খবর কাগজে দেখবেন তা ভেঙ্গে পড়ছে, ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। আহা! কি দুর্ভাগ্য! লিখেছে, 'এতে এত লোকের ভাগ্যের ওপর চোট লাগবে।' না লেগে থাকতেই পারে না, লাগতেই হ'বে; ওয়াল ষ্ট্রীট। কম বড় কথা নাকি? কথায় বলে—'যতটা ওঠে, ততটা পড়ে।' বড় দারুণ যুগে আমরা বাস করছি। রোজ সকালে উঠে পড়বেন সব খালি ভাঙ্গছে ত' ভাঙ্গছেই, ধ্বংস হচ্ছে, লোকে মরছে—কি বিপদেই না পড়েছে সমগ্র মানব সমাজ।"

□

ছাপা লেখা কথা কওয়ার খেই জোগায়; ভেবে, বুঝে দেখতে কষ্ট হ'তে পারে, কিন্তু জিভের ডগায় ওল্‌টাতে পাল্‌টাতে এক লহমাও লাগে না। সরোজিনীর আত্মবিশ্বাস আছে—সে জানে এ হ'ল শ্লোগানের যুগ। লোকে দল বেঁধে সমস্বরে শ্লোগান্‌ দিতে দিতে রাস্তা পরিক্রমা করে, একসঙ্গে একটা কথা স-গর্জনে বলায় প্রচণ্ড মজা, বুঝতে গেলে মজা মার খায়; তাই বোঝার প্রয়োজন নেই; আসল কথা—গাওয়া, পুনরাবৃত্তি করা, মুখে মুখে চিৎকার করা, অন্যদের দিকে কথাগুলো ছুঁড়ে মারা—এই ত' ব্যক্তিত্ব। শ্লোগানের মানে জিজ্ঞেস কর্‌তে সে-ই আস্‌তে পারে, যে কোন দলের নয়, সুতরাং হেয়। সে বেকার, যা'র কোনও শ্লোগান নেই। তেমন লোক গোড়া থেকেই একটা ভুল করে এসেছে যে, যে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যত খুশী, কিন্তু অন্য লোক উত্তর দিতে বাধ্য নয়। বাধ্য না হওয়াই ত' স্বাধীনতার লক্ষণ! তবে? সরোজিনী বিনা আপত্তিতে তা'র নতুন জ্ঞান ব্যাখ্যাসহ ছুঁড়ে দিতে পারে সকলের ওপর; সে তা' বোঝাতে বাধ্য নয়।

তা' ছাড়া—মানে থেকে কে কি পেতে পারে? অর্থ অনর্থের মূল। আজকাল সংস্কৃতির প্রধান পরিচয় হ'ল—একটা কথার দশরকম বিভিন্ন মানে দশজনে করতে পারে। যে নতুন কোন মানে বের না করতে পারে, তা'র বলবার কিছু নেই। কারুর কথা খুব সহজেই যদি বোঝা যায়, তবে সে ত' অতি সাধারণ, অতি বাজে। বাহাদুরী—যা বোঝা গেল না তাই, তা'কেই বলা হয় জ্ঞান, মায়াবাদ, মিষ্টিসিজম্‌ ইত্যাদি, ইত্যাদি। নারীপ্রকৃতি স্বভাবতই অবুঝ। সে মায়াবাদ না বোঝাই পছন্দ করে। সুতরাং আশ্চর্য কথা বলতে তা'র সহজাত প্রবৃত্তি—এখান সেখান থেকে, ছাপা বই থেকে শ্লোগান কুড়িয়ে তা' উলটো করে রেখে দাও, দেখবে কদর বাড়বে। খবর কাগজ এ'তে সাহায্য করে, তা'ছাড়া চাই কয়েকখানা বই যা বোঝার দরকার নেই—মনস্তত্ত্ব, আর্য দর্শন, সাহিত্যদর্পণ—ইত্যাদি। যে কোনও একটি থেকে এক লাইন মনে থেকে গেলে শিক্ষিত মহলে বসে একটি সন্ধ্যা, দু'কাপ চা ও

আলোচনা সহযোগে কাটিয়ে দেওয়া যায়।

তা'ছাড়া—নিজে সে প্রশ্ন তুলতে জানে। সামান্য পরীক্ষার পর তা'র অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, পুরুষেরা তা'র প্রশ্নের উত্তর দিতে মারামারি করে। সামান্য প্রশ্ন—"আচ্ছা, আজকালকার খাদ্য সমস্যার বিষয়ে আপনার মত কি?" নতুবা—"এ যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে আপনি কি ভাবেন?" না হ'লে "পঞ্চাশ বৎসর পরে ফিল্মের ভবিষ্যৎ কি, আপনি তা ভেবেছেন?" এ সব জিজ্ঞেস করা বড় সহজ।

তারপর উত্তর—ধৈর্য থাক্‌লে, তা' থেকেও অনেক শেখা যায়।

পাঁচজন একত্র হ'লে একটি প্রশ্ন করা মাত্র বাদানুবাদ লাগে, শুনতে, আড়ালে থেকে হাসতে অনেক উপাদান পাওয়া যায় তা থেকে; বিশেষত একটু তলিয়ে দেখলে যখন জানা যায় যে সবাই সমান অজ্ঞ, সমান মুর্খ, অথচ শ্লোগান হেঁকে দোরে দোরে ঘুরতে সবাই সমান ব্যগ্র।

তারপর তা'র অনুভূতি—সে কথা সে নিজেও আলোচনা করে না। কিন্তু সে জীবনের জন্য কৃতজ্ঞ, যা পায় তা'র জন্যও কৃতজ্ঞ; যা হাতের নাগালে পায় তা' সে কুড়িয়ে নেয়, তারপর ভুলতে চেষ্টা করে। নিজের জানাশোনার মধ্যে সে দেখেছে—সে-ই পাপী যা'র মুখে লেগে আছে পাপের ছাপ; সে-ই চোর, যে চুরির কথা স্বীকার করে তা' বলে বেড়ায়, সে-ই হারে যে লোক্‌সানের পিছনে পস্তাতে থাকে। আর যে মুখ মুছে ফেলে সব ভুলতে পারে, জটিলতার ভিতর শিশুর মত সরল হাসি হাসতে পারে, ভেবে মরে না, পিছনে তাকায় না, সে চিরসবুজ, চির-শ্যামল, চির কাম্য।

তাই সে দেখে সাদা ফুর্‌ফুরে দাড়ির আড়ালে লুকিয়ে থাকে কখনও-না-বলা কথা, সাদা টুপির নীচে স্বচ্ছন্দে খেল্‌তে পারে কালো বাজারের অশ্রু রক্ত ঝরা ফন্দি, অতি কমনীয় পোষাকের পিছনে ঘাপ্‌টি মেরে থাকে ভয়ানক বন্য প্রবৃত্তি।

সরোজিনী—তা'র বন্ধন নেই, তা'র সন্তান নেই; সে দেখতে পারে, সে শিখতে পারে।

কিন্তু সে কবে থেকে মানুষ হয়ে উঠল? সে কথা ভেবে সে নিজেও অবাক হয়। যদি কেউ বলত—'এই ত' ক'দিন বই পড়ে সে বদ্‌লে গেল', তবে সে বিরক্ত হ'ত, অবিশ্বাস করত। যদি কেউ বলত 'কৈ বদ্‌লায়নি ত' ?' কেবল পরিবেশের সুরটি বাজাতে শিখেছে

নিজের ভিতর, তার তা'ও সে মেনে নিত না। নিজের চেতনার ক্রম ভেঙে বাঁদ্‌রামি করতে নাওয়া খাওয়া ফেলে সে দৌড়ত না। তবু অবাক লাগে যে, সেই পুরনো মানুষই গোটা আছে, কিন্তু পৌঁছেছে নতুন দুনিয়ায়—সেখানে সবই নতুন।

তা'র বাঁধ ভেঙেছে; একবার তা' ভাঙলে স্রোত চেপে তেড়ে আসে নিজে নিজে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে এগোয়।

সেই প্রথম সন্ধ্যা রণজিৎ বাবুর বাড়ীতে, তারপর আরও কতবার সভায় বস্‌তে তা'র সাহস হয়েছে ক্রমে, বুকের পাটা হয়েছে কথা কইতে, বেড়াতে যেতে, অচেনা মানুষকে মুখোমুখি দেখতে। দুনিয়াটা খালি সাহসের খেলা—সে ভাবে। যে পারে সে ভোগ করে, জীবনের স্বাদ পায়; যে না পারে সে অন্যকে খোঁড়ে, শাপ দেয়।

সরোজিনীর গেঁয়োত্ব কেটে গেছে; বলিদত্ত চেয়েছিল—সরোজিনী বদলাক্। সে বদলেছে অথচ বলিদত্ত তাল রাখতে পারেনি। মনে মনে কখনও ক্ষুণ্ণ হয়েছে, হয়ত ছোট প্রতিবাদ করেছে—"সরোজ আজ না গেলে—"

কিন্তু সরোজিনী যেমনি "তোমার ইচ্ছা" বলে একটু নেতিয়ে পড়ে, অমনি সে ওপর-পড়া হ'য়ে বলে "যাও, যাও, অপেক্ষা করে আছেন হয় ত' ওঁরা।" গর্বিত হ'তে চেষ্টা করে, আপন মনে বিশ্বাস জন্মানোর জন্য নিজেই নিজেকে বলে—"এ ত' আমার কাজ, এ গড়ে তোলার কাজের গোড়ায় ত' আমি।" দেখে অতি আধুনিক রুচির ঝক্‌ঝকে তা'র স্ত্রী। কেবল কি লিপষ্টিক্, নেল্-পালিশ, ক্রীম, পাউডার, সিন্দূরের টিপ, আলতা ও হাইহিলের সমাবেশ? না; ভাবে সে, দেখতে পায় তা'র মনও—সে মন আধুনিক, জ্ঞানও আধুনিক। কত তাড়াতাড়ি সরোজিনী বেশ খানিক ইংরেজীও শিখেছে। সে তা'র সম্পদ!

বলিদত্ত দাস নিমন্ত্রণ পায় প্রচুর—মিষ্টার ও মিসেস্ দাস; সরোজিনীর প্রশংসা ছড়ায় সমাজে।

নিজে এগিয়ে চলে।

দানাপানির যুদ্ধে সে আগুয়ান; তা'র খ্যাতি ও প্রতিপত্তিও বেড়েছে যথেষ্ট। পদোন্নতি ঘটেছে একটার পর আর একটা।

তথাপি সে ভাবে, আরো তাড়াতাড়ি হ'ত যদি। খুব তাড়াতাড়ি তা'রও বাঁধ ভেঙেছে। মনে অসহিষ্ণু ক্ষুধা। সে তা'র সাফল্যের

যোজনায় ব্যস্ত। অন্যদের ছোট করে সমালোচনা করে। রাতে ভাত খাওয়ার সময় সেদিন বক্তৃতায় বল্‌ল—"জানো সরোজ, এযুগে প্রতিভার আদৌ আদর নেই। দেখতে যদি আমাদের মেজ সায়েব মিষ্টার জেনাকে, সাক্ষাৎ অজ্, মাথায় কিস্‌সু নেই। অথচ খেপে খেপে জাল ফেলে ওপরে উঠ্‌ছে। কি করে হ'ল, জানো। এস, তোমার কানে কানে বলি। একটি মেয়ে আছে ওঁর—শুভ্রাঙ্গিনী, ভাল নাচে সে। কোম্পানীর এক বড় অংশীদার মিষ্টার কার্‌কারে এসেছিলেন বম্বে থেকে। বয়সে পাকা বুড়ো, ফোক্‌লা, কিন্তু নকল দাঁতের বম্বেওলা খুব নাচগান ভালবাসে। তাঁকে এক সম্বর্ধনায় আপ্যায়িত করা হয়। সে সভায় নেচেছিল শুভ্রাঙ্গিনী; তবলা কে বাজিয়েছিল জানো—স্বয়ং মিষ্টার জেনা। যে লোক চাকরীর কাজে কখনও হাসে নি, খালি খিটিমিটি, চটে ওঠা, রাগারাগি করেছে, সে বুড়ো বয়সে তবলা বাজাতে পারল। শুভ্রাঙ্গিনী নাচল। তারপর কার্‌কারে পুরী গেলেন, কোনারক গেলেন; ছাড় সে সব কথা—মেজ সায়েব হলেন মিষ্টার জেনা, মাথায় যদি কিস্‌সু থাকে! আর আমি বাড়ীতে গাড়ী গাড়ী কাজ এনে রাতের পর রাত লেগে পড়ে দেখ্‌ছি—ছাড়, কাকে আর বল্‌ব?"

সরোজিনী চুপচাপ হাসে।

তা'ই যথেষ্ট।

বলিদত্ত স্বপ্ন দেখে।

□

সন্ধ্যা—

নিতা তাকাল এদিক ওদিক।

মুখে হাতের দুই পাতা চেপে গলার আওয়াজ চেপে অথচ জোরে হাঁকল—"হর্ষা, হর্ষা—"

যেন বাঁশের নলের ভিতর দিয়ে কেউ উনুন ফুঁক্‌ছে।

হর্ষা কাছে এল। তা'র কাঁধ চেপে ধরে নিতা নিয়ে চলল তাকে, নির্জন বাইরের ঘরে।

দু'জনে চুপচাপ অন্ধকারে সেঁধুল। যেন দুই ষড়যন্ত্রকারী; খুব সন্তর্পণে।

হর্ষা কি বল্‌তে চায়। নিতা তা'র মুখ চেপে ধরে, কান পেতে শুনল—আওয়াজ আসৃছে নাকি কোথা থেকেও। অন্ধকারে হর্ষা শিউরে উঠল।

নিতা দেশলাই জ্বালল। অন্ধকারের ভিতর থেকে বের করল একটা কালো, কুচুটে ভাঙ্গা লণ্ঠন। লণ্ঠন জ্বল্‌ল। নিতা পোষাক খুলে ফেলল—সারাদিন গায়ের ওপর ও'টা চড়ানো ছিল।

"বোস্‌ না, হর্ষা।"

সারা ঘর জঞ্জালে ভর্তি। নিতা'র সারাদিনের সঞ্চয়—ছোট ছোট পুঁটলি। হর্ষা তা থেকে একটা পুঁটলি খুলতে যেই গেছে, নিতা তা'র ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল বাঘের মত; কিন্তু ততক্ষণে হর্ষা খুলে ফেলেছে। সজনে ডাঁটা ক'খানা, চারটি বেগুন, তিন্‌টি আধপচা কলা। হর্ষা কলায় মন দিল।

"এমনই ব্যবস্থা করলাম যে খেয়ে খেয়ে তোর পেট ফাটো-ফাটো—ফের্‌ কেড়ে খাচ্ছিস আমার জিনিষ, কাঙ্গাল, পেটুক কোথাকার—"

হর্ষা হাস্‌তে হাস্‌তে সাব্‌ড়ে চলেছে কলা, নিতা বক্‌বক্‌ করছে। তারপর নিতা কল্‌কে ধরাল। হর্ষা কলা শেষ করে নিতা'র ময়লা পোষাকে হাত মুছে, হাত বাড়াল।

"না, না" নিতা বল্‌ল "তোর সইবে না, বারণ করেছি না তোকে? ব্যাঙের পেটে কি ঘি হজম হয় রে? বিড়ি খা, ওই টিনে আছে।" হর্ষা বিড়ি বের করে ধরাল। দুই স্যাঙ্গাত্‌ মুখোমুখি বস্‌ল—

এমন নির্জনে প্রাণ খুলে কখনও কখনও কথাবার্তা হয় ওদের।

নিতা জিজ্ঞেস কর্‌ল—"খবর কি?"

"বাবু বোম্‌ বনে যাচ্ছে।"

নিতা হাস্‌ল, বল্‌ল—"বাবু নয় রে, 'সায়েব' বল্‌, সায়েব। এই বেলা যা গুছিয়ে নিবি, নে—এমন সুযোগ আর আস্‌বে না।"

"কি করি? দিচ্ছে না কি কিছু? কাজ করিয়ে করিয়ে ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছে।"

"আরে, তোরও খাঁই বেড়ে গেছে।"

হর্ষা হাসৃল—"না, সত্যি বলছি···"

"জানি রে, সবই জানি। বলিস্‌নি, করে যা। সবই এ নিতা'র খেল্‌। এখন দেখ্‌ বাবুর বাড়ী কেমন ছিম্‌ছাম্‌। বাবু—সায়েব, মা—মেম্‌; কাঙ্গাল—বড়লোক; হর্ষা—বাবু। আঃ, মাছি পিছলে

পড়ছে তোর গা থেকে, কেমন? এ্যাঁ? কি চাইবি চা, দিয়ে দেব।"

"আমায় একটা টর্চলাইট্ কিনিয়ে দে।"

"হুঁ, হাত চুলকোচ্ছে, না? কৈ, গোঁফ ওঠেনি ত'! আচ্ছা, দেওয়া যাবে, দেওয়া যাবে। আমাদের হর্ষা বাবু হবে।"

"আচ্ছা, কোন্ ব্যবসা চালাচ্ছিস এখন নিতা ভাই?"

"তা দিয়ে তোর কি কাজ? আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজে? ব্যবসা ত' হাতে হাতে। সায়েবের জন্য ব্যবসা—সবকাজে 'নিতা, ও নিতা।' আবার মেমের জন্য ব্যবসা, টাকা ধারে লাগাও, চিনি বেচে দাও, তরিতরকারী বিক্রী কর, কত কি বিক্রী কর; খালি টাকা আন। এসব বড় বড় বেচাকেনার কথা, তুই ছেলেমানুষ, কি বুঝ্‌বি? শুধু এইটুকু দেখ্‌ছি কাঙ্গালের পেট ভর্তি হয় না, ঠিক্ তোর মত। যত পায় তত চায়।"

"এই, বয়—বয়—" মা ডাক্‌ছেন।

"চাপ্—রাশি—এই—এই, কোথায় গেল সব?"—

নিতা তা'র ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উর্দি চট্‌পট্ তুলে পরে নিল, তাড়াতাড়িতে আধো-খুলে-যাওয়া পাগড়ীটাও। তারপর দুজনে বাইরে বের হল। কপাটের ওপর শিকল টেনে হর্ষাকে ঠেলে দিল নিতা উল্টো দিকে "আরে বোকা, তুই ওদিকে আমি এদিকে। দু'জনে একসঙ্গে দেখা দিলে বাবু ঘুষি ওঁচাবে আমার ওপর, জানিস্ ত?"

□

ধক্ ধক্ করে প্রাণটা বলিদত্তর। ধক্ ধক্ করে কোম্পানীর একটা বড় ইঞ্জিনের অন্দরের মত।

এই ত' সবে দু'টো বেজেছে তা'র আপিসের বড় ঘড়িতে। ফাইলের ওপর থেকে মাথা তুলে সিগারেট লাগিয়ে সে হেঁকেছে ইতিমধ্যে—"নিতা, চা—"

নিতা'র টিফিন ক্যারিয়ার খোলার খট্‌খট্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। লম্বা লাল ফ্লাস্ক থেকে সে চা ঢাল্‌ছে; সিগারেট জ্বলে যাচ্ছে। ফাঁকা চোখে চেয়ে রয়েছে বলিদত্ত; একটা কথা গ্রামোফোন রেকর্ডের মত তা'র মনে বাজছে—

"সরোজিনী বাসায় আছে ত' ?"

সিগারেট পুড়ে খাক্। হ্যাঁ সিগারেট খাওয়া সে অভ্যাস করেছে—গরম জল, গরম ধোঁয়া—এ না হ'লে গাড়ী গাড়ী কাজ তোলা যায় না। তা'ছাড়া, সে ত' আর গরীব নয়।

গরীবের প্রতি তা'র দরদও নেই এক কণা; সে বড়লোক হয়েছে। গরিবির ওপরে প্রতিশোধ নেওয়ার মত সে জেনেশুনে খরচ বাড়ায়, নিজের পোষাক, নিজের খরচ—যদিও অনেক কথা এর মধ্যে তা'র রুচিকর মনে হয় না। দামী কাপড়ের স্যুট্, কিন্তু রঙটা হয়ত নিজের চামড়ার সঙ্গে খাপ্ খায় না। ঘর সাজাতে দামী উপকরণ, কিন্তু বৈঠকখানা ঝিকিয়ে ওঠে নাপিতের সেলুনের মত, নয় ত' যেন থিয়েটারের স্টেজ। সরোজিনী এসব কিছু কিছু শোধরায়, কিন্তু বলিদত্ত এ বিষয়ে ভাবেই না।

দৃষ্টি তা'র আটকে রয়েছে পোষাক পরা, পাগড়ীবাঁধা চাপরাশি নিত্য'র ওপর। তা'র জলখাবারের প্লেট রাখা, চা দেওয়ার ভঙ্গীতে সত্যিই বলিদত্তর আভিজাত্য ফলিত হচ্ছে। চিত্রিত পোষাক, চক্‌চকে পিতলের চাক্‌তি, প্রকাণ্ড পাগড়ী; তাকালে বলিদত্তর প্রাণ ঠাণ্ডা হয়—সে তা'র এক দিক্।

কিন্তু অন্য দিক্‌টা—সরোজিনী আছে ত' বাসায় ?

দীর্ঘশ্বাস—দীর্ঘশ্বাস, সিগারেট পুড়ে খাক্।

সেই নীরব অন্যমনস্কতা তলে তলে ঠেলাঠেলি করে লহরী তুলছে নিদান মানুষের অনুভূতি মেশা কয়েকটি প্রশ্ন :—মানুষ কি চায় ? সুখ কি ? জীবন কি ? ব্যবহারের মধ্যে যে কোন স্তরে টেবিল চাপড়ে যদি প্রশ্ন করা হয়—কেন ? তবে সে প্রশ্নের উত্তর কি ? অজস্র প্রশ্ন; কেউ বোঝে দীর্ঘশ্বাসে, কেউ হাই তুলে, কেউ শুধু চেয়ে থেকে; টেলিগ্রাফ তারে ঢিল্ লাগার মত ঝন্ ঝন্ করে ওঠে ভিতরটা যদিও ভাষায় কোনও প্রশ্ন নেই।

বলিদত্ত চা জলখাবারে মন দিল—সুখের জন্য নয়, ডিসপোজালের জন্য। ফাইলের পাঁজা দেখলে, ডিস্‌পোজাল না করা পর্যন্ত যেমন শান্তি পাওয়া যায় না, সব কাজেই তেম্‌নি—গাদা গাদা এগুলো। তবুও সে ভাবছে একটি বিষয়—সরোজিনী। ভাবতে ভাবতে একই পাল্লায় ভরে উঠছে আরও কত চিন্তা তা'র তরাজুতে—সুখ কি ? সংসারের সুখ ? স্বাধীনতা কি ? কি হ'লে মানুষ স্বাধীন হয় ?

বড় ব্যবসাদার—মাড়োয়ারী হরনারায়ণ থেকে আরম্ভ করে এ

দেশী মহান্তি, মিশ্র পর্যন্ত—ব্যবসা বেড়ে বেড়ে ওঠে প্রকাণ্ড উইঢিবির মত। ব্যবসায়ী ব্যবসার কেনা গোলাম। নিজত্ব ডুবিয়ে, ব্যবসায়ের জয়ধ্বজা উড়িয়ে, লালবাতির বিভীষিকা দূরে রাখতে কত না পরিশ্রম করতে হয়, কত যে যাতনা, নির্যাতন—দামী মোটরে চেপে রাস্তায় বের হ'লে বাঁয়ে ডাইনে ভেঙ্গে পড়ে। বার বার নমস্কার করতে করতে শেষে ক্ষমতাশালী মানুষ দেখলে তা'র মর্জি মানিয়ে কত না বাঁদরনাচ নাচতে হয়। খাওয়াদাওয়ার ঠিক নেই, পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই, ছেলেমেয়ের খবর নেবার তর্ সয় না। বিজনেস্-ব্যস্ততা। মাঝরাত পেরিয়ে বালিশে মাথা রাখলে বিভীষিকার স্বপ্ন—ভয়, ফন্দি, দুশ্চিন্তা, এই আসে আর এই যায়। মানুষ খালি বড় হয় উইঢিবির মত, ব্যাংকে ব্যালান্স বাড়ে—বেচারা পুঁজিপতি।

বড় চাকুরে, মোটা মাইনের কোম্পানী অফিসার, ফাইল বা কলকব্জার জগতে তা'র দিন কাটে। নামে সাত ঘণ্টার নোকর হ'লেও চব্বিশ ঘণ্টাই তার মাথা বাঁধা দেওয়া, ভোর থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত পরের কাজ, পরচিন্তা, পরের ধান্দা—সময়ের নিশ্চয়তা নেই। অর্ধেক রাতে ভাত ঘুমের মধ্যেও বড়সায়েবের চাপরাশি বিছানা থেকে উঠিয়ে কাগজ পেশ করার অধিকার জারী করতে পারে—"সেই দূরের ডিপোর কুলির দলে গণ্ডগোল শুরু করার সূত্র-পাত শোনা যাচ্ছে—জল্‌দি যাও, রাত্তিরেই—।" স্ত্রী অসুখে পড়েছে, ছেলেরা বখাটে হচ্ছে, গাঁয়ে চাষ উজাড়; সামান্য আপত্তি অভিযোগ করলে সকালেই একখানা লাল চিঠি—"দেখা কর।" তারপর কুড়ি মিনিট লেকচার—"অসুবিধা হলে ইস্তফা দিয়ে দাও, বাপু। অনিচ্ছুক কর্মীর স্থান কোম্পানীতে নেই।" এছাড়া, অবসর সময়ে কর্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া নানা রকমের; পরের তবলা ঠোকার তাল মিলিয়ে নাচা, পা ফেলা, পরের হাসির সঙ্গে তাল রেখে হাসি, সব সময়ে নিজের কাঁধে পরের 'সিন্ধবাদী' বুড়ো —তা'র নির্দেশ—"এখানে বস, দাঁড়াও, হাস একটু, কাঁদ, মার, রাখ—"

উপায় বলে মানুষ যাকে আশ্রয় করে, তা হয়ে ওঠে নিজেই নিজের উদ্দেশ্য। মানুষের কাজ শুধু, তা'রই পাথরের চাকার নীচে বুক পেতে দেওয়া, হয়ত নিজেকে ভোলাবার জন্য মানুষ টাকাটার কারুকার্যের ওপর চোখ রেখে বলতে পারে—কখনও কদাচ—

"পাথরের এ চাকা সুন্দর, জীবন্ত, যেন এ সত্যিকার রথচক্র, কি সুন্দর কারুকার্য, কি পরিকল্পনা, কত শিল্পীর ঘামঝরা রত্ন! কি যোজনা!"

পাথরে তৈরী রথের চাকাকে প্রশংসা করলেও, সে চাকা পাঁজরের হাড়ের ওপর চাপায় জগদ্দল ঠাণ্ডা; উপায় নিজে নিজের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। অথচ তা' ঠাণ্ডা পাথরের চাকা মাত্র—থোড়াই খাতির করে মানুষের রক্তমাংসের দেহের জন্য? তা'র নরম মনের মরম-কথার জন্য? চাকা গড়িয়ে চলে, গুঁড়িয়ে চলে আয়ুর পর আয়ু।

যখন উপায় পায় উদ্দেশ্যের মর্যাদা, হাতিয়ার পায় বুদ্ধি—তা'র তখন বিবেক বলে কিছু থাকে না। টুঁটি চেপে কাজ করিয়ে নেয়। মানুষ স্বাধীনতা হারায়। সুতরাং দুনিয়ার সমস্ত হাসির বড় অংশই হ'ল অর্ধপরিণত মাথার—শিশুর বা উদ্দেশ্যহীন সরল হতভাগাদের।

জেনেশুনে হাস্‌তে কে পারে? সিভিলাইজেশান্‌ ইজ্‌ সিভিলাইজেশান। ড্যাম্‌ রট, চামড়ার তলায় ছোট ছোট স্নায়ুগুলোতেও সোরাবিষ; চেতনায় দাহকারী সিফিলিস্‌, বুদ্ধি বিবেচনায় সাইকোসিস্‌।

হেল্‌, হেল্‌, হেল্‌—এ দুনিয়া নরক। সরোজিনী বাড়ীতে আছে ত'?

চেতনায় ঢেউ খেল্‌ছে, অস্ফুট তার ভাষা, অস্পষ্ট তা'র রূপ—ঢেউয়ের মাথায় জোনাকির মত আলো, ঢেউয়ের জল বিদ্‌ঘুটে নোনা—বমি আসে।

দেখা যায় নিতা'র মুখ; মুখ ত' নয়, মুখোস; নির্বিকার, নির্লিপ্ত। থাক্‌ না খানাখোঁদল, সে যেন গ্র্যানাইট পাথর! এক কোণে, একই ভঙ্গীতে সীসার তৈরী চোখ তুলেই আছে। চোখের পাতায় লোম নেই; তাই মনে হয় যেন অপলক চোখ, গ্র্যানাইট চোখ। না, ইউরেনিয়াম, আদিম ইউরেনিয়াম, পৃথিবী যখন তৈরী হচ্ছিল তখনকার। হিলিয়াম্‌ ঝেড়ে ফেলে সীসা হয়ে গেছে চোখ, সীসার মত তা'র কপালের চুল। সেই সীসার মধ্যে পৃথিবীর আয়ুর হিসাব—তা'হলে নিতা'র হিসাব কত দিনের? অস্থির ভাবনা স্থির হয়ে আসে, মনের ধক্‌ ধক্‌ বন্ধ হয়, এক লহমার জন্য, এই ইউরেনিয়ামের মানুষ, সীসার মানুষ, মাটির মানুষ দেখে এসেছে কত দপ্‌দপানি, আলোর ঝলকানি, কত জাঁকজমক, কত অফিসার, কত প্রকারের—এই দুনিয়ার কোম্পানীর! প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে—এই বনেদী কোম্পানী চালু আছে, নিতা'র মত লোকে তা' দেখে এসেছে,

গালমন্দ সয়েছে, চড়চাপড়ও খেয়েছে, আবার মৌকা দেখে ঠেলে দিয়েছে উনুনের মধ্যে কুচো জ্বালানী, সেই একই কোণাচে মুখে। নিতা বলে, ছিল একজন মিলিটারী অফিসার, কাগজ চাপা কাঁচের ঢেলা ছুঁড়ে মারত; আর একজন ম্যাক্—হাইল্যাণ্ডার; কথায় কথায় হাত তুলত। নিতা বলে, তা'কে শায়েস্তা করেছিল দাড়িওলা চাপরাশি রহমন মিয়া; হাত তুলে যেই না এগিয়েছে, তা'র কব্জি চেপে ধরে, সাপুড়ের মত চোখে মিয়া বলেছিল "সায়েব, এ ক্যা করতে হো; লড়োগে ত' আও, উতর যাও?" সাহেব ম্যাক্ তা'র সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। ইউরেনিয়াম মানুষ, সীসার মানুষ নিতা, রহমন তার এপিঠ আর ওপিঠ, অর্ধেক পুরুষ, অর্ধেক স্ত্রী, অর্ধনারীশ্বর। সয়ে এসেছে, দেখে এসেছে; কেন এ'রা বাঁচে? বাঁচায় কি আনন্দ এদের? মরে না কেন? সেই একাকী জীবন, একই ধাঁচের চাউনি।

হেল্ল্ ও হেল্ল্—ফস্ করে মাথায় আগুন ধরে।

সিভিলিজেশন ইজ—

সোরাগরল গর্ গর্ করছে মনে, মাথায় চড়ছে, রক্তে ছেয়ে যাচ্ছে। তাই ছটফট করা, মারামারি, ছোরাছুরি, রক্তারক্তি, অ্যাটম্ বম ছোঁড়াছুঁড়ি—সিভিলিজেশন ইজ—

তা'র চোখ ঘোর লাল, মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে, নিতার পানে ছুঁড়ে মারল সিগারেটের জ্বলন্ত অবশেষ, গর্জে উঠল—"নিতা, ইডিয়ট, বুড়ো কাঁহাকা—"

"হুজুর—"

"কি দেখছিস বেকুবের মত? কেন সরাচ্ছিস্ না এ কাপ ডিশ, এঁটো বাসন?"

মুখ থেকে কথাগুলো বেরোতে না বেরোতে মাথা নুইয়ে উঠিয়ে ফেলেছিল সে সব নিতা—সে যেন একটা যন্ত্র। সীসার মানুষের নিজস্ব গত্ আছে। সব সাফ্ করে দিল। তারপর খবরের কাগজ পেতে সিগারেটের লাল রং-এর বাক্স খুলে রেখে দিল। এই পাঁচ মিনিট সায়েব বলিদত্ত দাস খবরকাগজের শিরোনামগুলো দেখেন।

অতি চমৎকার খবর। পৃথিবী-প্রসিদ্ধ স্থলযুদ্ধ বাহিনীর সেনাপতি জেনারাল্ ডড্সনের স্ত্রীকে পৃথিবীখ্যাত আকাশযুদ্ধ বাহিনীর সেনাপতি এয়ার কমোডোর কৈজারলিং হরণ করে নিয়েছেন। ডড্সন ছাড়পত্র দেওয়ার অধিকার পেয়েছেন।

বৃদ্ধ ডড্‌সন. নানা যুদ্ধে অভিনন্দন, উপাধি ও পদকে ভূষিত। উঠতে উঠতে পৌঁছেছিলেন খুব উঁচু পদে। আজ তা'র পরিবার নাস্তি। চার ফুট ন' ইঞ্চি বেঁটে বলিদত্ত ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তা'র আত্মাভিমান আছে যে, সে সায়েবদের মন বোঝে, দুঃখ বোঝে, নিজেও প্রায় সায়েব কিনা।

হঠাৎ বুকটা ছাঁৎ করে উঠল, চোখের সামনে বড় বড় হরফে চমক লাগানোর মত মনে হ'ল খবরের কাগজের শিরোনামা—

মনে পড়ল—সরোজিনী, গোটা সরোজিনীই, সরোজিনীর সমস্তই তা'র ; কত ভালবাসে সে তা'র সরোজিনীকে। আপিসের ঘড়িতে দু'টো পনের। হয়ত সরোজিনী বেড়াতে গিয়েছে ; আজকাল তা'র অনেক পার্টি ; সরোজিনী যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে, এগিয়ে আসছে, জীবনের বিকাশ পথে।

যাক্‌ সে বেড়াতে ; ফিরে ত' আসবেই।

□

সাড়ে তিনটে এগিয়ে আসছে।

মাঝে মাঝে বুকে হাত দু'টো আড়াআড়ি রেখে, চিৎ হয়ে, পাশ ফিরে পড়ে রয়েছে সরোজিনী। জেগে আছে কিন্তু আলস্যে এলিয়ে।

প্রতীক্ষার নৈবেদ্য যেন সে।

খোলা জানালা ও দরজা দিয়ে হু হু করে আস্‌ছে হাওয়া, সরোজিনী অনুভব করছে তা'র স্পর্শ। হাতের কাছে একটা ছোট খাতা, চক্‌চকে চামড়ায় বাঁধানো, তার পাতাগুলোর ধার সোনার জলে ছোপানো। সরোজিনী তা'তে লিখে রাখে তা'র উদ্বুদ্ধ জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা,—পার্টি, নিমন্ত্রণ, সভা-সমিতি, পরিকল্পনার খসড়া।

কে বলেছিল না—"জীবনকে করা চাই উদ্দেশ্যময়, সময়কে বাঁধতে হবে কার্যসূচীর মধ্যে, সে কার্যসূচী লেখা চাই রোজ নাম-চায়।"

সাফল্য কি নিজে নিজে আসে?

সরোজিনী শূন্যের দিকে চেয়ে আছে। গদীর ওপর একটা

পা এপাশে ওপাশে নাড়াচ্ছে। ঘড়ির টিক্ টিকের মত মাথায় চেতনার প্রবাহ।

সাড়ে তিন—কি যেন খুব কাছে এসে গেছে!

এবার কান পেতে রয়েছে আওয়াজ বেছে নিতে।

যা মোটামুটি নিঃশব্দ বলে মনে হয়, সেই নৈঃশব্দ্যের ওপর কান পেতে রাখলে কত রকমের শব্দের অস্তিত্ব জানা যায়। খুট্-খাট্-ভুম্—দূরে হর্ষা নিশ্চয়, সবসময় কিছু না কিছু কর্ছে; সব কাজে তা'কে চাই। সে যেন ডবল জোরে মনের ভিতর স্থান করে নিচ্ছে, তবুও মাঝে মাঝে তা'র ওপর রাগ ধরে। কেন? খালি সর্বদা একটা না একটা আবিষ্কার করা তা'র চাই! কখনও কখনও সে বড় নোংরা হয়ে থাকে। তখন আরও রাগ ধরে।

হর্ষার শব্দ। দূরে মাঝে মাঝে কাকের রব, আর একটা কি পাখীও ডাকছে; দূরের শব্দসমষ্টিও, গাড়ীর, লোকজনের, ভীড়ের।

হু হু হাওয়ার আওয়াজ; আড়াল থেকে যেন দু'জনের ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের মেশামিশি; আর চোরা গোপ্তা হাসি ফিক্ ফিক্।

ভাবলে কেমন লাগে যেন। চট করে সরোজিনী গা তুলে ঠেস দিয়ে বস্‌ল বালিশের ওপর। মুখে যেন আবির মাখা। চারদিকে চোখ বুলাল, কই? কেউ ত' নেই।

রোদ্দুর পড়ে আস্‌ছে; হাতের সরু ঘড়ি দেখল সে। সাড়ে তিন হ'ল বলে, সে ত' তৈরী। এবার হয় ত'—। জানালা দিয়ে দূরে তাকাতে, নজর পড়ল পাকাবাড়ীগুলোর ওপর। মনে পড়ল "ওনাকে"। কোম্পানীর বিশিষ্ট কর্মচারী। কাজে মগ্ন হয়ত। কিন্তু কাজ কে না করে? কাজ করতে হয় বলে মানুষের সখ-আহ্লাদ কি থাকে না? বাড়ী ফেরার সময় মুখে কালঘাম ছুটতে থাকবে? সন্ধ্যে হ'লে "হর্ষা, পা টিপে দে ত' একটু?"

"হেঃ হেঃ হেঃ হর্ষা—"

হাতের কাছেই তুলনা করার লোক—রণজিৎবাবু, কি ফিট্‌ফাট, সপ্রতিভ! নরেন্দ্র যাদব—সর্বদা তাঁর মুখে চুরুট্, পোষাকের ছাঁট-কাট ফ্যাশন মাফিক্, প্রকাণ্ড চেহারা, চওড়া কাঁধ ঘাড়ের কাছ বরাবর, যেন বিধাতা গোড়া থেকেই গড়েছে গুরু দায়িত্ব ঘাড়ে নেওয়ার জন্য। মিষ্টার ত্রিপাঠী—দেখ্‌তে বেঁটে হ'লেও, চালচলনে আছে এক মোহিনী মায়া; হাত পা'র গড়ন, না টোল-খাওয়া গালের ভঙ্গী, না কপালের বিস্তার, না চোখের ছেলেমানুষী দুষ্টুমি,

না ছোট ছোট মোটা মোটা হাতজোড়ার খল্‌বলানি, না অন্য কিছু এ মায়ার উৎস—বলা যায় না। তবে, আরও লোক আছে; তাদের ভেক্‌ ভিন্ন, আলাদা তাদের হাবভাব; তবুও তাদের মধ্যে জীবন ঢেউ খেলায়। কেউ নিজেকে প্রকাশ করে নরম ব্যবহারে, এবড়ো খেবড়ো শক্তির খেলা দেখায় কেউ, কেউ দেখায় নিজের অসহায়তা, সহানুভূতি জাগায়; কা'রও বেহায়া-পনা, কারো মুখ মসৃণ, কারো বা 'দাড়ি' কাঁটার মত, খাড়া গোঁফ। জন্তুদের সঙ্গে মানুষকে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে—ভিতরের ইঞ্জিনে শক্তি থাকলে মানুষ-জন্তুর কী শোভা! বিশেষত দলের মধ্যে, পার্টিতে, যখন মনের অজান্তে সে জন্তু পরের সঙ্গে পাঞ্জা কষে নারীর চোখের সামনে নিজস্ব বাহাদুরী দেখানোর জন্য।

সেই জন্তুদের মধ্যে সে ম্যাঁ ম্যাঁ করে—
মাথায় দু'টো শিং, ছোট একটি লেজ।

ঐ ত' একটা ছাগল, আস্‌ছে ত'; ফটকের কাছে ছুঁক্‌ ছুঁক্‌ করছে। ফটক বন্ধ। ঠিক. হয়েছে, বেশ হয়েছে, হতাশ হয়ে ছাগল গলা উঁচোচ্ছে, তা'র চোখ যেন মাটিগোবর-মেশা জলের মত ঘোলা, মুখ থেকে কালঘাম ঝরছে।

তা'র মাথায় দুটো শিং।

ওঃ, কী উদ্ভট চিন্তা! সরোজিনীর সত্তা আর একটা পর্দা ঠেলে সাম্‌নে নেমে পড়ল। হাতঘড়িতে তিনটে চল্লিশ। ছাগলটা চলে যাচ্ছে—।

ফের মনে পড়ছে "ওনাকে"। জলখাবার রাখা আছে, চা দেবে নিতা, কিন্তু ওঁর উচিত নিজের আরও যত্ন নেওয়া। গম্ভীরভাবে ভাবছে সরোজিনী—উনি খেতে বস্‌লে আজকাল সরোজিনীই লেকচার দেয়, বলে—জীবনের কথা, সুখের কথা, বিশ্রামের কথা, পরের বাড়ীর কথা। উনি আর বকেন না—আগের মত—ভাত খাওয়ার সময়ও বোধ হয় মাথায় চাকরীর গুরুভার। খাওয়ার পর মাঝরাত পর্যন্ত ফাইলের কাজ। কি পেয়েছেন জীবন থেকে উনি? কিন্তু শত বললেও, না; শত বোঝালেও, না; তিনি যেমন গড়া, তেমনই।

এ কি? তিনটে পঁয়তাল্লিশ যে! সরোজিনী তার ছোট খাতা খুলে মিলিয়ে নিল। হঠাৎ শব্দ হ'ল মোটরের হর্নের; সেই চেনা শব্দ, হর্ন ত' নয়, যেন তূরী-ভেরী। কোন ফিলমে দেখেছিল এমনি—রাজারানী চলেছেন রথে, টানছে লোকে, তূরী ভেরী বাজছে আগে

আগে, শব্দ বলছে—"হটে যাও, হটে যাও।"

রণজিৎবাবুর দামী বড় মোটর দাঁড়াল এসে ফটকের কাছে। ওই রণজিৎ বাবু নামছেন, মিলি নামছে। খুকীর মত আলুথালু, বসবার ঘরে ফ্রেমে-বাঁধানো ছবির মত এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দৌড়ে গেল সরোজিনী, তার বুক উঠছে, নামছে। এক লহমায় সে ফিরেও এল।

আজ একটি ছোট আউটিং; দূরে আছে একটা খুব বড় মাঠ—সেখানের জমি ঢালু হ'য়ে নেমে গেছে, কিনারায় সারি সারি গাছ। নাকের ডগা ফুলিয়ে ঘরের ভিতর ছুটে যেতে যেতে সরোজিনীর নাকে আসছিল সেই ঘাসের গন্ধ। চোখের বিচিত্র চাউনিতে খেলছিল ডাইনী-রোদের গলানো সোনা, মনের গহনে ভরা ছিল খাঁ খাঁ মাঠের নিশ্চল বিস্তার। চেতনায় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, সারি সারি গাছের দিকে হাঁসের মত দল বেঁধে ঘাসের ওপর ধীরে যেন সাঁতরে যাবার সময় মিলির মুখে জীবন সম্বন্ধে গম্ভীর তথ্য।

হয়ত দূরের দিকে লক্ষ্য করে ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়তে মিলি পিছিয়ে পড়বে—যেমন সে করে।

আর রণজিৎবাবু ফিস্ ফিস্ করে বলবেন—"কি ভাবছেন আপনি?"

হয়ত দূরে, গাছের আড়াল থেকে পাখী ডাকবে—কু, কু, কু—

□

যাক্ না সরোজিনী বেড়াতে।

বলিদত্তর মনে মনে অহঙ্কার; সে ঘরকুনো নয়, সে কাজের মানুষ। নিজের জীবন গড়তে পেরেছে তিল থেকে তালে, তাই তা'র শ্রেষ্ঠ কলাকীর্তি। পরকে উপদেশ দেওয়ার স্তরে সে পৌঁছেছে—'এই দেখ আমাকে, দেখে দেখে কাজ কর, জীবন গড়তে পারবে তুমিও।'

আর, সরোজিনী—সে'ও তা'র গর্বের বস্তু। সমাজের প্রত্যেক পর্যায়ে একদল এমন লোক পাওয়া যাবে যারা কোন না কোন জিনিষ প্রশংসা করবেই করবে হৃদয়ের ভিতর থেকে না হলেও, অন্তত মুখে। এই ত' সেদিনের কথা—বিদেশী এক কণ্ট্রাক্টার,

কিছু স্বার্থ ছিল মেজ সায়েবের কাছে। চিরকুট পাঠাল সে সাক্ষাতের জন্য; তারপর সিগারেটের ধোঁয়ায় আলাপের মধ্যে বারবার সে ওঠাল বম্বে'র নাচের কথা, ক্রমে শুভ্রাঙ্গিনীর নাচের কথা, করে গেল অনেক তারিফ; অথচ তা'র মোটে হাজার টাকার স্বার্থ, এগিয়ে গেল বহুদূর। বলিদত্তর বাড়ীটাও লোকে প্রশংসা করে; শুনে শুনে মনে হচ্ছে, মিছে নয় ত'!

ভাবে, সরোজিনীর বিকাশ ঘটানোর জন্য সব সুবিধা দেওয়া—তা'র দায়িত্ব; স্বর-সংযোগ করলে সব গানই গাওয়া যায়।

তা'ছাড়া, ভাববার সময় কৈ? সে কাজের লোক। কোম্পানীর স্বার্থ বজায় রেখে চাকরীর এত ঘোরালো কাজ, সময় পেলে তা' যায় নিজের হিত চেষ্টায়।

এর মধ্যে অবশ্য তা'র কর্তব্যও আছে। সুবিধা পেয়েছে সে মানুষ চরাতে। স্পর্ধার ভঙ্গীতে সে যখন তা'র ক্ষুদ্র শরীরটি স্ফীত করে, দেখে অধীনস্থদের ভয়-বিহ্বল চোখ, যখন তা'র কলমের আঁচড়ে সাঁই সাঁই করে উড়ে যায় ছোটখাট দানাপানির ব্যবস্থা, কখনও শোনে কারুর আকুল প্রার্থনা, কখনও বা কারো বিকট কান্না, বলিদত্ত তখন অনুভব করে যে, সে কত বড়। কথায় গর্জন করা তা'র পক্ষে সম্ভব নয়, কাজের মানুষ সে, তাই ক্ষুরের মত চালায় কলম; সংস্কারের নামে কোতল করতে করতে আসে গভীর আত্মপ্রসাদ, যেন নিজের নোংরা অতীতকে সে নির্দয়ভাবে সাফ্ করে গড়ে, উঠছে ওপরে, আরও ওপরে।

জানাশোনা লোকে তা'কে যমের মত ভয় করে; সে খুশী হয়, সে বিশ্বাস করে, কাজের জন্য ভয় স্বাস্থ্যকর। সে বিশ্বাস করে, কাজের লোকের মুখ হাসিখুশীতে চিক চিক করা উচিত নয়। সুস্থ শান্ত আর নিষ্ফলা নিষ্কর্মা—প্রায় সমার্থক। তাই সে ফিকিরে থাকে, চুগলী শোনে এবং এসব কাজে খরচ করে বহু সময়। কাজ করে সে নাম কামায়, লোকে তা'র তারিফও করে।

কেবল ভয় লাগে মিষ্টার শা'কে। সেখানে সে পাত্তা পায় না, লগিও চলে না, যেন ঘুমোচ্ছে অতল অন্ধকার জল। কিন্তু খালি অন্ধকার ত' নয়, কখন কি হালে তা'র কি বর্ণ, কেমন ব্যক্তিত্ব, চোখের পলকে সে ব্যক্তিত্ব ফের বদলে যায়—আশ্চর্য লাগে, এখানে কিছুই কি স্থির নয়? কি ধরনের ব্যবহার এখানে খাপ খাবে? তারিফ করতে করতে তাড়া খায়, সেই ক্ষত চাটতে চাটতে

শোনে—'সাবাস, সাবাস' ; হাসতে হাসতে সে মুখে মেঘ দেখে মুখ ভার করতে হয়। বারবার চেষ্টার পরে, বারবার ঠ্যালা সামলাতে সামলাতে মনে হয় তৃষিত, অতৃপ্ত। নিদান থেকে যায় শুধু ভয়!

সেই প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতি—'সীট ডাউন ও গেট আউট' এর তুফানী গর্জন কান ঝাঁ ঝাঁ করে দেয়। প্রথম পরিচয়ে, প্রথম হিসাবে কিভাবে লোকের সঙ্গে সম্বন্ধে কখনও কখনও যে ভিত গাঁথা হয়, শেষ পর্যন্ত সে অনুপাত মনে থেকে যায়, যেন নিজে যত বড়ই হয়ে উঠি না কেন, ছেলেবেলার মাষ্টার মশায়কে দেখলেই মাথা নামিয়ে, কোমর বেঁকিয়ে মুখ থেকে বের হয়—"স্যার"।

শুরু থেকে সায়েব, তারপর মিষ্টার শা'—সেই অনুপাতে বলিদত্ত পায় পাথর পূজা।

কিন্তু পাথর ত' নিশ্চল, হাসি, কান্না, শখ, স্নেহে সেই একই মূর্তি, তা'র চিরন্তনী স্থিরতা হৃদয়ের ঢেউকে অবকাশ দেয়, নিজের মধ্যে হাত্‌ড়ে নিজেই নিজের ভিতর জবাব খুঁজে পেতে।

কিন্তু দানাপানির ক্ষেত্রে এই যে বড় বড় পাথরের দেবতা, বলিদত্ত দেখে—তারা কর্কশ দন্তুরতায় শুধু পাথর, কিন্তু চলৎশক্তিতে বিস্ফোরক—সেক্ষেত্রে পূজা দেয় না শান্তি; পূজা জন্মায় আরও পূজার জন্য প্রচেষ্টা; তুচ্ছ পরিশ্রম, মনের তারতম্যে বলিদত্ত যেখানে, সেখানেই।

পদোন্নতির দরুন মিষ্টার শা'র সঙ্গে বারংবার উঠ্‌বস্‌ করতে হয়। আগের মতই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কখনও অকস্মাৎ—"বস, বস" ; হয়ত তিনি আর কারও সঙ্গে কথা বলছেন, বলিদত্ত আগের মতই মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে তাঁর পদযুগল ধ্যান করছে জেনেশুনে ; হঠাৎ মুখ তুলে গর্জন—"চুপ করে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখা হচ্ছে নাকি? স্বপ্নবাদীর জন্য এখানে জায়গা নেই ; এই এই বিষয়ে কি ব্যবস্থা হয়েছে—জানতে চাই।" যদি বা গদ্‌গদ্‌ ভাবে মুখস্ত করে আনা কথাগুলো কপ্‌চাতে শুরু করা যায়, হঠাৎ মাঝখানে চিৎকার হবে— "ওঃ, শোন ত' আগে—"

আগন্তুক মুচকে মুচকে হাসতে থাক্‌বে।

হয় ত' সে অতি সাধারণ লোক ; নিরক্ষর মুটেমজুর, সারা পায়ে ধুলো, হাঁটুর নীচে নামে না এমন ছোট ধুতি পরা, কাঁধে ঝোলা— কিন্তু বড়সায়েবের চোখে সে মুহূর্তে সে বড়লোক ; কারণ, তার কাছে স্বার্থ বাঁধা। হতে পারে এরপর অন্য পরিস্থিতিতে

সে দশবার দৌড়াদৌড়ি করলেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পাবে না, কিন্তু এ পরিস্থিতিতে সে বসে বসে হাসবে, দম্ভের বড়াই করবে, অথচ বলিদত্তকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হবে, গালমন্দও সইতে হবে। বাইরে গিয়ে ওই লোকটা প্রচার করবে, কোম্পানীর বড় সায়েব বড় আলাপচারী, ভারী দক্ষ, খুব ঠিক্ লোক, সারা আপিস তোলপাড় করে কাজের হিসাবনিকাশ করলেন। সর্বসাধারণের প্রতি তাঁর সহানুভূতি অশেষ।

কিন্তু বলিদত্ত আজ বড়, বেড়েছে তার অহমিকা; তার জ্বালা বেশী অথচ হজম করতে হয় সবই। পরক্ষণেই আবার ফিরে পায় সে তা'র সাফল্যবাদ, সে কাজে লাগে।

সেবার বড় সায়েবের সঙ্গে সে সফরে গিয়েছিল কোম্পানীর এলাকায়; সেখানে বহু কুলি, অনেক কাজ, কোম্পানীর কারখানা, ধাঙরবস্তি। আগে থেকে বলিদত্ত নির্দেশ দিয়েছিল পাঠিয়ে; তাই জায়গায় জায়গায় তোরণ, কুলি সর্দারদের দল, কুলিকামিনদের ঘোমটা, উলু ও শঙ্খধ্বনি। সে আশায় ছিল যে, মিষ্টার শা' গাড়ী থামাবেন, খুশী হবেন। কিন্তু গাড়ী আট্‌কাল না। তোরণগুলোর তলা দিয়ে রেগে গর্জন করার মত মোটরের হর্ন ভিড় তাড়িয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে চলল। বলিদত্ত ভয়ে ভয়ে ভূমিকা ফাঁদ্‌ল—"কোম্পানীর এলাকা কিনা, লোকে বড়সায়েবকে দেখতে, শ্রদ্ধা জানাতে দল বেঁধে এসেছে,—কি গভীর শ্রদ্ধা—"

"থুঃ" বড় সায়েব সশব্দে থুতু ফেলে, বনজন্তুর মত গলা ঘড়ঘড় করে গর্জে উঠে বিড়বিড় করলেন, তারপর শুধু গালাগালি। হুঙ্কার দিয়ে তিনি বল্‌লেন "শ্রদ্ধা! ছোঃ! হাফ বেকারের দল! কোন্ বুদ্ধু এদের মাতিয়েছে এমন যাত্রা দেখাতে? সারা রাস্তা কাজের পাত্তা নেই! যত সব যাত্রা, পঞ্চরং। আমি জানতে চাই কে এখানে তদারক করে?"

সেই জনসমাগমের দিকে একটা বিষাক্ত দৃষ্টি, তুফানে নুয়েপড়া সুপুরী গাছের মত লোকে নমস্কার জানাচ্ছে; ভীড়ের মধ্যে ধীরে এগোচ্ছে মিষ্টার শা'র গাড়ী, তাঁর মুখে এক অপ্রাকৃত ছবি—দাঁতের দু'পাটি অসমভাবে কড়মড় করছে, মাড়ির ওপর উঠে গেছে ঠোঁট, হাসি না বিরক্তিতে দাঁত দেখাচ্ছেন? উভয়ত অর্থ করা, ধরা যায়।

"যে অন্নদাতা, তা'কে হৃদয়ের স্নেহশ্রদ্ধা জানানো, সে ত' নিজে

থেকেই হয়, আট্‌কানো যায় না—" নম্রভাবে তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে বলিদত্ত বলল।

খেঁকিয়ে উঠলেন মিষ্টার শ'—"হৃদয়! হৃদয়!" তারপর অকথ্য গালাগালি,—"সব ঠকামি, সব দুর্বলতার জন্য হৃদয়ের দোহাই। ননসেনস্। কত বড় ইডিয়ট্‌ তুমি—"

"হুজুর"! নিজের উঁচু পায়া থেকে বলিদত্ত সেই চিরচেনা সম্বোধনে পিছলে পড়ল। শা' গর্জে উঠলেন ঃ—

"কথায় কথায় যে হৃদয়ের কথা মনে আনে, সে বেকুব; আমি চাই না তেমন অফিসার—একথা মনে রেখ। আমরা কোম্পানীর অফিসার—আমরা যন্ত্র, কাজের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ, হৃদয়ের সঙ্গে নয়। কোম্পানীর ক্রেন দেখেছ? দেখ নি ইঞ্জিন, বয়লার? আর কিছু? আমরা তা'ই। যন্ত্র বিগড়ালে, তুমি বল্‌বে হৃদয়, না? ইডিয়ট। আরে, আমরা হলাম ছুরি, যে আমাদের যেমন কাজে লাগাবে, কেউ বল্‌বে ঘাস কাট, কেউ বল্‌বে গলা কাট। আমরা পাকানো কাঠ, রোদে তাতব না, জলে গলব না, এতে হৃদয় আসে কোথা থেকে?"

খাতায় লিখে রেখেছিল বলিদত্ত—তার মনে হয়েছিল এ একটা দামী দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা, অথবা গদ্য কবিতা!

কিন্তু ব্যাখ্যা খাপ খায় না মিষ্টার শা'র সঙ্গে। কিছু দূরে গাড়ী আটকাল এক ডিপোর সদরে। বড়সায়েবের এ ডিপোও এই সফরে তদারক্‌ করার কথা। ডিপোর কর্মচারী, ঢ্যাঙ্গা নর্সায়া দোরা দৌড়ে এসে মাথার পাগড়ী খুলে গাড়ীর ওপর জমা ধুলো মুছে ফেল্‌ল; সঙ্গে তার লোকজন গাড়ীর দরজা খুলে পিছনের দিক অর্ধেক ভর্তি করে দিল ঝুড়ি ঝুড়ি কমলা, কাঁদি কাঁদি পাকা কলা, কয়েক হাঁড়ি জমাট ছানা দিয়ে। গাড়ীতে বসে বসেই সায়েব জিজ্ঞেস্‌ করলেন "কেমন, দোরা? ভাল চল্‌ছে ত' সব?"

"হুজুর।"

"আচ্ছা, খাতাটা দাও।"

গাড়ী থেকে না নেমে শা' তদারকী টিপ্পনী লিখে দিলেন—সব ঠিক, নর্সায়া দোরা কাজে খুব পটু। গাড়ী চলে গেল।

আবার, বেলা পড়ে এলে একটা হতশ্রী এলাকাতে গিয়ে এধারে ওধারে দলে দলে কুলি দেখে বলিদত্ত যখন সায়েবের মনে লাগসৈ দু'কথা শুরু করল—"খালি ইদিক ওদিক ঘুরছে, নিষ্কর্মা লোকগুলো,

বোধ হয়—তদারককারী সর্দাররা তত তৎপর নয়—"

অন্যমনস্কভাবে দূরে তাকিয়ে হঠাৎ শা' বলে উঠলেন—"তোমার বুদ্ধি নেই। জেনে রাখা উচিত তোমার যে, এই কুলির দলের জন্যেই আমাদের দানাপানি—"

পড়ন্ত রোদের ছায়ায় তাঁর মুখ কী ম্লান দেখাচ্ছিল, যেন কুলিদের সারাদিনের ঘাম তাতে মাখা; সে মুখে মজুরদের হতাশ দীর্ঘশ্বাসের জ্বালা-পোড়া। মুটে মজুরদের অনাগত বিপ্লবের অগ্রদূতের মত গম্ভীর বাণী শোনালেন মিষ্টার শা'—"তোমরা মূর্খ! তোমরা পরের পেট পিঠের কথা বোঝ না, তোমরা চাও লাভ আর ফাউ; তাই তোমাদের সমস্ত মতামত শুধু স্বার্থপরের নির্দয় না-বোঝা কথা; কিন্তু কা'র জন্য তোমাদের চাকরী? কাদের শ্রমে এত বড় কোম্পানী জান কি? জানবার চেষ্টা করেছ? এই বুদ্ধিলেশহীন নেতৃত্বের জন্য যত অশান্তি বাড়ছে; দেখছ না—অশান্তির তুফান বাড়ছে? সেই তুফান আরো বাড়লে উলটে দেবে, ছত্রাকার করবে সব সংস্থা। তখন তোমরা থাকবে কোথায়? ভেবেছ কখনো? মেহনতী মানুষ নিদেন আশা করে দু'টো মিঠে কথা তার বিপদে, একটু দরদ; তোমরা তা' দেবে না, তবুও তোমরা অফিসার।"

বলিদত্ত চেষ্টায় বিরতি দিল; এক কথা বলে ত', শা' বলেন ঠিক্ উল্‌টে এক শ'। বোধ হয় অধীনস্থ কর্মচারীর মতের ঠিক বিপরীত কথা বলে তা'কে মুখের ওপর দাবিয়ে রাখা ওপরওলাদের একটা উপায়।

মনে মনে এ সব বলিদত্ত টুকে রাখে। কিন্তু সে দেখেছে, কাজের সময় কাউকে দু'চারটে গরম কথা মুখোমুখি বলা তা'র প্রকৃতিতে সম্ভব নয়; কথায় নয়, লেখালেখি করে যা সে পরের ব্যক্তিত্বের বিরোধ করে, চড়াও হয়।

গুম্ হয়ে শা'র সঙ্গে বাকী পথটুকু কাট্‌ল। সে ভাবতে চেষ্টা করল, আশ্চর্য এই শা'। একই পথে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন তা'র রূপ। অথচ একটাই মানুষ সে। কাজ করলেও গালমন্দ করতে পারে—কাজ হ'ল না বলে; কাজ না করলেও দরদে গলে যেতে পারে। হ'তে পারে রক্তমুখো বাঘ, আবার নর্সায়া দোরার কাছে সুশীতলা কামধেনু—এক জন মাত্র লোক অথচ!

বলিদত্তর চিন্তার খেই জড়িয়ে যায়; না, সে সমাধান-সূত্র পায়

না। সাফল্যের সব সূত্র, সব পুঁথিগত বিদ্যা এখানে অচল—এই রকম এক একটা শা'র মুখোমুখি হ'লে। এই সব মান্য গণ্য, প্রতাপান্বিত কোম্পানী-সায়েবদের কথা সে শুনেছিল—; লোকে বলে, এদের তালিম এই রকম, যেমন যেমন অবস্থা—তেমনি ভিন্ন ভিন্ন মুখোস পরে বর্ষার ছাঁটের দিকে ছাতা ধরে নতুন নতুন অভিনয় দেখিয়ে কাজ চালিয়ে নেবে এরা।

এরা মেরুদণ্ডের বড়াই করে না, খাতির করে না ন্যায়-নীতির—সেও ত' তা করে না; তথাপি, তা'র বুঝসমঝ্ বাকী থেকে যায়, সেই স্তরে সে উঠতে পারে না যেখানে শা' এগিয়ে যান্।

তবুও এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার তলে তলে সে তা'র সাত-পাঁচের পসরা মেলে দেয়, মেলে দেয় চক্রাকার খেলা। চিন্তা, পরিকল্পনা, —একটা ভাঙ্গে ত' একটা বাড়ে; ঠেলাঠেলি করে সে আগের দিকে বাড়াচ্ছে জোর কদম। যেন একটা অন্ধ কীট, মাটির নীচে খুঁড়ে খুঁড়ে চলাই তার কাজ—এদিক ওদিক। এদিক থেকে ফিরে আবার ওদিকে খুঁড়ে ফুঁড়ে চলছে। এই তা'র 'জীনে'র ক্রম।

□

হঠাৎ একদিন—মিষ্টার শা'র বদলী। কোম্পানীর চাকুরে মহলে সে এক ইতিহাস। বাইরের লোকে বুঝবে না তার গুরুত্ব, বুঝবে না শহুরে লোক, গাঁয়ের চাষী, দেশের জনসাধারণ। বাইরের লোকের চোখে পড়ে খালি যে, কল চলে। যে কোনও রকমের হোক—কল, চিমনির ধোঁয়া বন্ধ হয় না, তাঁতের শব্দ হয় না সঙ্গীত, হাত খালি হয় না। এমনই চলে কত জায়গায় কত রকমের ব্যাপার; একজন যায়, আর একজন আসে; প্রকৃতি শূন্যতার বিরোধী, সর্বদা পূর্ণ। 'বাসু পাণ্ডা' নেই—তা'ই বলে ভোগ রাঁধা হবে না—এহেন যুক্তি কোথাও খাটে না।

লোকে জন্মে, গড়ে ইতিহাস; ইতিহাসের বহতা জলে উলটে পালটে ফোটে তাদের ব্যক্তিত্ব। আর যারা নামযশ করে ক'টি বৎসর জমিয়ে বসেছেন, তাঁরাও বাসু পাণ্ডা নন; তাঁরা না

জন্মালেও রোজ ভোরে সূর্য উঠত, পৃথিবী থাকত শস্যশ্যামলা, বৈচিত্র্যময়ী; মানুষও থাকত, থাকত এমনই হাসি-কান্নার মনুষ্য জীবন, পশু দেবতা মেশামিশি মানুষের সমাজ—ছেলেরা ধুলো-খেলা খেলত, বড়লোকের সংসার চলত, বুড়োরা মালা জপত।

বনু হয়ত এইরকমই বকত—বলিদত্তর মনে পড়ে, আরাম-কেদারায় ঢিলে ভাবে বসে সন্টুদার আধ বোঁজা চোখ তার মুখের দিকে তাকিয়ে, বিড়িতে একটা দম নিয়ে অতি সংক্ষেপে সে হয় ত' বলত,

"বদলী না ফদলী—'কর্ণ ম'লেও পাঁচ, অর্জুন ম'লেও পাঁচ'—নাথিং ম্যাটারস্, আমাদের কি আসে যায়?"

কিন্তু বনু'র ভাববার ভঙ্গী সাধারণ লোকের মত নয়। সে সর্বদা করে ওভার-গোল নয় কর্নার, তাই সে উদ্ভট।

সাফল্য-আহরণের ঘনঘোর যুদ্ধের মধ্যেও বনুকে ভুলতে পারে না বলিদত্ত। তা'র ভারী আশা—একদিন সে চেলার মত বনুকে পড়াবে। সে দিনের বেশী দেরী নেই এবং এই—বড় সায়েবের ঐতিহাসিক স্থানান্তর সম্পর্কে যে বিদ্যুৎঝলকিত বাতাবরণ, এরই নীচে ডুব সাঁতার দিতে দিতে বারবার বনুকে মনে পড়ে, কখনও তা'র প্রতি অনুকম্পায়, কখনও তা'র মতের ভুল মনে পড়ায় নিজের মতের উৎকর্ষ অনুভব করে।

বড়সায়েবের বদলী—'রটি গেল সেই বার্তা', গম্ভীর সংবাদ! যেখানেই দুই চাকুরে বন্ধু একত্র, সেখানেই ওই চর্চা। বড়সায়েব চলে যাবেন; কার জন্য লিখে যাবেন দু'কলম প্রশংসা, কার জন্য নিন্দা, কার ভাগ্য কিরকম, কার পাতায় কি ভোজ্য পড়বে; বড়সায়েব চলে যাবেন, সেই অনুসারে কার ক্ষমতা বাড়বে, কার কমবে। একজনের বা একদলের। দানাপানির যোজনায় ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা-গোষ্ঠী হঠাৎ মাথা তুলে ওঠে; মৌচাকে ঢিল—ভন্ ভন্ করছে সকলে—

শুধু বড়সায়েব যাবেন বলে নয়, আর একজন আসবেন বলেও। যিনি আসছেন তার সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা, তাঁর চেহারা, তাঁর চরিত্র, অভ্যাস, রীতি-নীতি, প্রত্যেক বিষয়ে যথাসম্ভব গবেষণা। পুরনো যাবে, নতুন আসবে, ভাবতে মনে আনন্দই আসে, তা' হল দাস-মনের পরিবর্তনকামী আনন্দ। হ'তে পারে সে নির্বোধ বিশাল বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে; কিন্তু সকলের আনন্দের হেতু ত' সমান নয়।

যাদের জীবনের বৈশিষ্ট্য হোল চিরদিন চাপা পড়ে থাকা—হয়

অন্যের স্বেচ্ছাচারের নীচে, নয়ত নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রত্যয়ের প্রহরী পরের হাকিমীর নীচে, পরের জুলুমের নীচে, যারা স্বাধীনভাবে হাসতে চাইলে আগে এদিক ওদিক চেয়ে নেয়, দেখে কেউ কোথাও আছে নাকি, স্বাধীনভাবে ভাবতে বসে বারবার বুক কাঁপে দুরু দুরু করে, ভাবে দানাপানির শাস্ত্রীয় নিয়ম ভঙ্গ হ'ল কিনা; ভেবে ভেবে পাথর চাপা সেই হলদে ঘাস খতিয়ে দেখে না নতুন পাথর ভাল, না পুরনো পাথর? তা'র মনের ভিতর আটকে থাকা অব্যক্ত বিপ্লব নিঃশব্দে নিজেকে প্রকাশ করতে বসে একটা সামান্য আগ্রহে পরিস্থিতির পরিবর্তনে।

তাই নতুন সায়েব না আসতেই, তাঁর প্রতি একটা আশাবাদী সমর্থন, সবাই চঞ্চল।

অতি পুরনো সায়েবের প্রতি ব্যবহারে আরও বেশী আনুগত্য, মনের ভিতর ভয় যে, তাঁর হাতে এখনও কলম ধরা, কখন কি লিখবেন, শেষতক্ তাঁর শক্তি আছে শেষ কামড় দিয়ে যেতে, কাগজে দু'টি লাইন আর একটি জীবন খতম।

কাজ করে যান মিষ্টার শা' সমান দর্পে, বরং দ্বিগুণ দর্পে—দূর থেকে দেখলে ভয় হয়, কি নির্বিকার এই কর্তাব্যক্তিরা। নাম সই করে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাবার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত সব "আমার আমার", নেই শিথিলতা বা ঔদাসীন্য; সত্যি যেন লোহার ছাঁচে ঢালাই মানুষ, সাক্ষাৎ ইস্পাত। বলিদত্ত নিজের মতের সঙ্গে অন্যের মত মিলিয়ে দেখে; জোড়া জোড়া লোক বলে "ঠিক, এইজন্যই ত' পুরুষানুক্রমে কোম্পানীর কাজ চালু আছে, উন্নতি ঘটেছে বরং, বিগড়ায়নি। মানুষ এমনই হওয়া চাই। এখানে হলেই বা কি, সেখানে হলেই বা কি? সর্বত্র দায়িত্ব; চালক ও চালিতের তারতম্য এই দায়িত্ব বইবার মন নিয়ে। কাজের কমবেশী পরিমাণ দিয়ে তা' মাপা হয় না।"

কোমর বেঁধে লেগে গেছেন অনেকে—মিষ্টার শা'র কিসে সুবিধা, গোছগাছে তাঁর কি অসুবিধা, এসব বুঝতে। মালপত্রের জন্য ঠিক ঠিক প্যাকিং, গাড়ীর বন্দোবস্ত, দূরে যেতে হবে তাই পুরনো খাটটেবিল নীলাম করা, ঝড়তি পড়তি বেচে দেওয়া, কুলি বন্দোবস্ত করা, অনেক প্রকার ব্যবস্থা অর্থাৎ বদলীর সময় তাঁকে সাহায্য করায়। তা'ছাড়া অবসর পেলে একটু ঘুরিয়ে নজরে পড়া, তাই তাঁর কাছে কাছে ঘোরাফেরা, হয়ত শেষ মন্তব্য লেখার সময় তাঁর

মনে পড়বে, মনে মনে এই প্রার্থনা, মুখ খুলে কিছু বলতে গেলে কে যেন মুখ চেপে ধরে।

তলায় তলায় এইসব চলছে, ওপরে কিছু নেই, সেখানে সব দিনের মতই কাজকর্ম চলছে।

কিন্তু এল সেদিন—নতুন সায়েব পৌঁছলেন। তক্ তকে ফর্সা, ঢ্যাঙ্গা ছোকরা লোকটি—মিষ্টার শর্মা। কথায়, ধরনে বিদেশী ধাঁচ, বড় মোটর গাড়ী। সন্ধ্যার আগে আপিস বাড়ীর সামনে ছোট একটি অনুষ্ঠান, পুরনোর বিদায়, নতুনের অভ্যর্থনা। মান্যতা ও আসন বিধি অনুযায়ী এঁর পর ওঁর স্থান ঠিক করে, চেয়ারে বসে, মাটিতে বসে, পিছনে দাঁড়িয়ে ফটো তোলা, দুই সায়েবের গলায় দুটি মোটা মোটা মালা। "হ্যাঁ, বসুন একটু, এক—দুই—তিন", ফটোগ্রাফার ক্লিক করল—জড়ো হয়ে রইল স্মৃতি। এরপর ফটোসব আসবে, বিতরণ করা হ'বে, কোথাও কোথাও তা কাঁচে বাঁধিয়ে টাঙানো থাকবে। তাতে ঝুল ধরবে, উই ধরবে, পোকা বাসা বাঁধবে।

ভবিষ্যতে কখনও কখনও তা হবে অতীতের সম্পদ, লোকের ভীড় থেকে নিজেকে আবিষ্কার করার সময়।

কেবল ওইটুকু।

ফটোর পরে দুই সায়েবকে একত্র করে চা'-এর অনুষ্ঠান; সেখানে মর্যাদা অনুপাতে কারুর চেয়ার কাছে, কারুর কারুর দূরে।

ছোট ছোট বক্তৃতা ক'টি, সেই দাস্যভাব, গলার স্বরে সেই সঙ্কোচ।

একটি পরিচ্ছেদের সমাপ্তি, কিন্তু ব্যবচ্ছেদ নেই।

শিকল সমানে রয়েছে, তেমনই শক্ত, তেমনই ঠাণ্ডা।

□

নতুন যুগ, শা'র পর শর্মা।

প্রথম ক'দিন—নতুন যুগেরই বন্দনা; মানুষের স্বভাব আশায় বাঁচা, আশঙ্কায় নয়।

প্রথমে আরম্ভ করলেন বড়বাবু—বসন্তবাবু। মতামত তৈরী হয় তা'র টেবিলের কাছে, ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে সারা অপিসে।

"দেখলে ত" বসন্তবাবু ফিস্‌ফিস্ করে বলেন নরুবাবুকে—"কৃষ্ণ পক্ষ গেলে তবেই চন্দ্র পক্ষ—এটা সৃষ্টির নিয়ম। ওঃ, কংস গেল, সত্যি বল ত' পৃথিবীর ভার হাল্‌কা লাগছে না ?"

"ওঃ, কি মানুষ ছিল সেটা—মানুষ নয়, সাক্ষাৎ অসুর। যতবার ডাক্ পড়ত সায়েবের ঘরে, ততবারই আমার রক্ত হিম হত। কথা কইত—না এই মারে ত' সেই মারে, কথার মত শুনতে না কি ? যেন বাজের আওয়াজ, কখন যে কা'র ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, ঠিক ছিল না। যাক্, গেছে বেটা—"

"কম অপমান ?" বসন্তবাবু বললেন, "খালি চাকরী করছি বলে, কি আর করি, মাথা ত' বিকিয়েছি, সব সইতে হবে। তবে ভগবান আছেন—সব দিন সমান যায় না। যে ক'টা দিন ছিল, গেল। এখন আর নেই। এখনকার সায়েব—ভদ্রতায় মানুষকে কিনে নেয়। হুজ্জৎ আর গালমন্দের দিন গেছে, না, বাঁচা গেছে।"

"লোকটা ছিল খল, সাক্ষাৎ জন্তু। এ সায়েব কী ভাল—"

"এ আর সে ?" বসন্তবাবু বললেন,—"রানী আর মেথরানী ? মানুষের আসল চিজ্ থাকে শিকড়ে—ইনি হলেন খানদানী পরিবারের ছেলে, দেখছি না আড্ডা থেকে ? এর পক্ষে চাকরী শুধু শখ। আঃ, বড়লোক, মস্ত বড়লোক, ঘি দুধে আঁচানো লোক।"

"এঁর দাঁতের গোড়া খুঁজ্‌লে যা বেরোবে, সে তার সারা জন্মে তেমন খাবার দেখেছে কিনা—" নরুবাবু বললেন।

"চেহারাই বলে দিচ্ছে—বড়লোক; কি চেহারা, কি কথা ! এক-বার তাকালেই লোককে কিনে নেন্। যোগ্যতাও তেমনি, পড়াশুনাও আছে—নইলে এই ছোকরা বয়সে এত বড় কাজের ভার পায় ?"

না, এ সমাজে শা'র স্থান আর নেই, যেন পচা থস্‌থসে কোন জিনিষ ফেলে দেওয়া হয়েছে, শুধু রয়েছে তার দুর্গন্ধ। দিনকতক এই দুর্গন্ধের ওপর চলবে আলোচনা; তারপর তা'ও থেমে যাবে, আর তাঁর নাম শোনা যাবে না।

এখন শুধু শর্মা—হরিবাবু বলছেন শ্যামবাবুকে "নতুন সায়েব কী বুদ্ধিমান, জানেন ? সে ছিল গাধা, দিনরাত খেটে খেটে ফাইল শেষ করতে পারত না। এঁর—যেন ছুঁলেই হল—শেষ। আপিসসুদ্ধ লোক বলাবলি করছে—ফাইল গেছে কি না গেছে, অমনি মাটিতে পড়ল 'ঠো' শব্দে—সাক্ষাৎ বিদ্যুৎ; এর নামই—প্রাম্প্। এক একটা লোক থাকে, যতই বোঝাও মাথায় কিছু ঢোকে না। আর এক একজন তুমি

মুখ খুলে দু'কথা বলেছ কি, না বলেছ, অমনি সব বুঝে নেবে—"

"তা'ই ত' মনে হচ্ছে," শ্যামবাবু সায় দিলেন "কাল এঁর টেনিস্ খেলা দেখছিলাম। হাসতে হাসতে হারাচ্ছিলেন সকলকে—কি মাষ্টার্লি ষ্ট্রোকস্!"

বলিদত্তও সরোজিনীকে বলেছিল—"বুঝলে সরোজ, আমাদের যে নতুন সায়েব এসেছেন, তুমি যদি তাঁকে দেখতে, ছোকরা বয়েস, কাজে ঝানু আর কি ভদ্র! কি ভদ্র! এমন লোক চাকরীতে বেশী নেই। নিজে কাজ করতে জানে, পরের হৃদয় চেনে—"

"তাই নাকি?" সরোজিনী ঠাট্টার ভান করে ফাজলামি করল—"ডেকে আন না বাসায়, ক্ষতি কি?"

"এত সাদাসিধে তিনি; ডাকলে সত্যি সত্যি বাড়ীতে আসবেন। তুমি ভাবছ—আমি মিছে বলছি? উনি অমনি লোক, ভারী মিশুক। পথে লোককে আটকে পিঠ চাপড়ে দুঃখসুখের কথা জিজ্ঞেস করছেন। এই ক'টা দিনের মধ্যেই লোকেও তাঁকে ভাল-বাস্ছে। বাস্তবিক, এমনি হলে চাকরী করে সুখ।"

"বেশ বেশ, খুব কষ্ট পেয়েছ, দিনকতক এখন সুখ ভোগ কর। ওরে হর্ষা, বাবুকে টিপে দে—"

খাটে গড়াগড়ি দিয়ে বলিদত্ত চোখের সামনে দেখছিল—সুখ। সে সুখে আছে; ভবিষ্যৎ দেখাচ্ছে উজ্জ্বল।

অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন গত কাল; —তারপর বড় সায়েবের অমায়িক ব্যবহার—তাতে আশার খোরাক।

অলসভাবে ভেবে ভেবে নিজের চিন্তাকে সুষম রূপ দিচ্ছিল সে। —চাকুরে কি চায়? খালি অর্থ, উন্নতি? অর্থোন্নতি অবশ্যই আগে। নয়ত চাকরী করা কেন? কঠোর কর্তব্য পালন করে সত্য ব্রতের ধ্বজা ওড়াতে বলিদত্ত দাস নিজের পৌরুষ জোয়ালে বাঁধা দেয় নি, তার জন্য বেচেনি নিজের আয়ু;—দুর্লভ এ মানুষ জন্ম। সে মূর্খ নয়, সে নয় দিগভ্রষ্ট।

অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে যদি পদমর্যাদা টপ্‌টপ্ করে বেড়ে যেত অন্য সবাইকে টপ্‌কে ওপরে আরও ওপরে, হাঁ করে চেয়ে থাকত অন্যেরা, বার বার উন্নতি করে বার বার প্রমাণ দিতে পারত নিজের বিচক্ষণতার—

তার সঙ্গে তাল রেখে কর্তাদের মধুর ব্যবহার, বিশ্বাস, সম্মান,

একটা শঙ্কাহীন, নিরাপদ স্থিতি, বেপরোয়া— ; এই না চাই ?

বলিদত্ত ঘুমন্ত, হর্ষা তার গা টিপছে। দিন শেষে এই তার অলস আনন্দ।

বলিদত্তর চেতনায় গোলমাল বাধিয়ে দেখা দিচ্ছিল এক একটা অনুভূতি। নিজের সুখ খতিয়ে দেখতে দেখতে, চোখে পড়ছিল পরের দুঃখ। অনেক দেখেছে সে। নিজের বর্তমান ও অতীতের মধ্যে থাক্ থাক্ করে পিছিয়ে রয়েছে তারা, নিরাশ, হতাশ, দুঃখিত, দুঃস্থ। চোখ বুঁজলেই তাদের কলরব যেন কানে আসে। তারা খেটেছে, খাটছে কিন্তু পায়নি কিছুই। এমন অনেকে আছে যারা কুঁজো হয়ে কাজই করে যাচ্ছে আজীবন, আশা রেখেছে—কাজ থেকেই জন্মাবে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ; তার জন্য পরিকল্পনা করতে, ফন্দিফিকির খাটাতে ফুরসৎ নেই। বাড়ীতে ছাত থেকে ঝুলানো সেই বাঁশের আল্না, আসন, মাদুর, সেই মোটা লাল চালের খাদ্য, নিত্য সেই অভাব ও মাইনে ফি মাসের পাঁচ তারিখের বেশী পৌঁছয় না, খরচ হয়ে যায়; তারপর বাজারে ধার হাঁড়িচাঁছা। সেই খড়ি উঠছে চুলে, পরনে ছেঁড়া খোঁড়া, চোখ বুঁজলে—চিত্তির, চাকরী তালপাতার ছায়া! আর আছে তারা যারা চিরকাল ফন্দি-ফিকিরই করছে, পায় নি কিছু।

চোখের সামনে জ্বলন্ত উদাহরণ গণ্ডায় গণ্ডায়। কলেরায় পটল তুলল সোমায়া পট্টনায়েক। বাড়ী নয়ত তার—ক্লাবঘর। আজীবন খালি অতিথি সৎকার, আপ্যায়ন। কোম্পানীর বড় আপিস থেকে যে কেউ আসুক, অমনি তার গায়ে গায়ে লেব্‌ড়ে থাকত শিশুর মত, পান, চা, জলখাবার, ভোজ, খানা—আর নির্জনে পেলে করুণ কাকুতি—"আমার কথা উঠেছিল কি? আমার ব্যাপারটার খোঁজ করেছিলেন? কবে হবে প্রমোশন? কে কি বল্‌ছিল আমার সম্বন্ধে? নাম গেছে নাকি ওপরে?" চোখে ভাসে বুড়ো সোমায়া পট্টনায়েকের চেহারা, লিকলিকে হাড় জিরজিরে, বেঢপ ঢ্যাঙ্গা, যৌবনের প্যান্টকোট তাতে ঝুলে থাকে যেন বাঁশের বেড়ার ওপর ধোপার শুকোতে দেওয়া কাপড়ের মত। তার ওপর আছে দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার—তিনি কুমড়োর মত বপুতে সর্বদা সেজেগুজে তৈরী। সোমায়া পট্টনায়েকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, দরদ দেখাতে, তার আশায় ইন্ধন জোগাতে, তা'র বাসায় বৈঠক জমাতে আসেন অনেকে, মেশবার গোড়াপত্তন সহজ করার জন্য অনেকে 'ধর্ম'-সম্বন্ধও

পাতান, যথা : ধর্মভাই ইত্যাদি। বড়দিনের উৎসবে সোমায়া পট্ট-নায়েক বড় সায়েবদের কাছে ভেট পাঠায়, মালা দেয়, সবরকম হুকুমে অনুরোধে বাধ্য বিনীত সোমায়া ; কলেরা খতম করল তা'র জীর্ণশীর্ণ দেহ। আশায় আশায় হন্যে হয়ে তা'র দুর্দশার জীবন হয়ত শান্তি পেল ; তা হ'ল তার কেস্-এর ডিসপোজাল। কল্পিত আতঙ্কে শিউরে ওঠে বলিদত্ত।

সোমায়া পট্টনায়েক গেছে। আর তার স্ত্রী ? সেও ত' ছিল তা'র সাফল্য প্রয়াসের একটি আয়ুধ—কী অবস্থা হ'ল তা'র ? কোথায় আছে সে ? তার হাতে পরিবেশন করা জিনিষ যারা উপভোগ করছিল, তারা কতদিন তাকে মনে রাখবে ?

বলিদত্ত হাঁক দিল—"সরোজ, সরোজ।"

"কি বলছ ?"

"না, কিছু না—"

এ জীবন—আশা ভঙ্গে হাড় চামড়ার ঠাট। কুয়াশায় ঘোলাটে চোখ। সে আগুন জ্বলবে না, ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে নিভে যাবে। খড়ের মানুষ, ফাঁপা মানুষ। শূন্য ঘট পূর্ণ হ'বে না, ফুটো হাঁড়ি জল ধরে রাখতে পারে না, চেতনায় ভেসে আসে রাশি রাশি হাঁড়ি, কলসী, ঘট নদীর স্রোতে ডুবু ডুবু হ'য়ে, গাদাগাদা, অজস্র ; ভেসে যায়, আবার ফিরে আসে। ভেসে চলে কোন্ বদ্ধ জলার দিকে ; সেখানে তেলতেলে সবুজ জলে কচুরী পানার জঙ্গল, কুৎসিত, বীভৎস, মনে হ'লে রোম খাড়া হয়ে ওঠে, চামড়া কুঁকড়ে শিরশির করে ; খানা খন্দে রোগের শোভাযাত্রা ; ভাবলে, মনে চেপে বসে।

এংকট রাও, বন্নু, কি করছে ওরা ? টাকায় দেড়সের চাল কিনছে ? ওদের সাফল্য কতদূর ?

এখন সন্ধ্যা। অবস্থার প্রতি উদাসীন, পাগলা বন্নু বসে হয়ত বিড়ি টানছে, পড়ছে একটা বই। এই অন্ধকারে বন্নু'র ছোট ঘরে আলো জ্বলছে।

আলো জ্বলছে নিশ্চয়।

তার কিছু না থাকলেও সে সুখের ভান করে। গাছের তলায় ধুনি জ্বেলে বসে ছাইমাখা সাধু নেংটি পরে সুখের ছলনা করে, করে ভিখারী, মূর্খরাও।

"এই হর্ষা, জোরে, আরও জোরে—"

অভাব থাকলে কি মানুষের সুখ থাকে ? বারবার শুধু বাসনে

কলাই করানো ; কলাই ঘষে উঠে গেলে আবার কলাই। কাপড় ছিঁড়ে গেলে আবার তালি দেওয়া।

বর্ষার ধারের মত বলিদত্ত দাসের ওপর উপুড় হয়ে, উপছে পড়ছে জীবনের কথা। তার মধ্যে বাছাবাছি নেই, সাজ সজ্জা নেই, শুধু পড়ছে ত' পড়ছেই। আপন অভিজ্ঞতায় পরখ করে তৈরী হয়েছে তার সরু মাপকাঠি, সে মেপে চলেছে। মূর্খ বন্ধু ফাঁপা পেটে হেসে হেসে ঢেঁকুর তোলে কিন্তু যাদের অনেক আছে, খুব রোজগার, বিস্তর জোগাড় করেছেন যাঁরা, তাঁদের অনেকেও ত' নিজেকে অভাবী মনে করেন।

রায় সায়েব—মেজো সায়েব। রাতে ঘুম হয় না, অনিদ্রারোগ। সারা রাত বারান্দায় আরাম চৌকিতে পড়ে ছটফট ; প্রকাণ্ড বপু এখন কাহিল যেন কত্‌বেল। সেদিন সন্ধ্যায় বলিদত্তর হাত ধরে ফেললেন, বলতে লাগলেন নিজের দুঃখের কাহিনী সারা মাঠ মার্চ করতে করতে। কম দুঃখ তাঁর? মাইনে ইত্যাদি মোট, মোটে তেরশ' টাকা মাসে ; আয়কর কেটে নেয় জবরদস্তি ! জীবনবীমায় যায় গুচ্ছের টাকা। বড় মোটরগাড়ী রাখার খরচেই খেয়ে নেয় মাস গেলে দু'শ টাকা। একটা বাড়ী বানাচ্ছেন, তাতে যেন বাঁধের ফাঁকের মধ্য দিয়ে জলের মত খরচ। তা'ছাড়া, বাসার খরচ, খাই-খরচ জুটবে কোথা থেকে? সাম্‌লাবেন কি করে? দীর্ঘশ্বাস ফেলে বারবার বলেন—থালুইয়ের মুখ খোলা, মাছের জালে বড় ফুটো! শুধু নেই পঞ্চাক্ষর 'দারিদ্র্য' মন্ত্রজপ, অশেষ, অফুরান। তা'ছাড়া চাক্‌রীতে অপমান ! একসঙ্গে শুরু করে মীরমদন খাঁ হয়ে গেছেন খাঁ বাহাদুর, অথচ নিজের কপালে এখনও বাহাদুর খেতাব জুটল না। মীরমদন বড় সায়েবের পদে অফিসিয়েট করতে শুরু করেছে। নিজে যেখানে ছিলেন সেখানেই, রাতে ঘুম হয় এতে? নাক ডাকাতে পারে শুধু পশু। মানুষ কি ভুলতে পারে? মেজো সায়েব নিজেকে অত দুঃখী মনে করেন। তাঁর মুখে দুঃখের বর্ণনা শুনলে বলিদত্তের মনে হয় মাঠের মধ্যে মাথায় হাত রেখে ডুক্‌রে কাঁদে।

ওঃ, কী দারুণ দুঃখী উনি! অথচ বন্ধু হাসতে পারে, স্থির হয়ে বসে সণ্ট্‌দার বক্তৃতা শুনতে পারে ; সুখী হওয়া তাহলে মূর্খতার চিহ্ন?

অগত্যা মনে মনে জপতে লাগল বলিদত্ত যে, 'সে অসুখী, সে অসুখী', তা'র এখনও যেতে হবে অনেক পথ। সে পায়নি কিছুই। হয়ত এবার পেয়ে যাবে, পথ মিলবে ওপরে ওঠার, আরও ওপরে ওঠার।

যদি ভাগ্য প্রসন্ন হয়, যদি নতুন বড় সায়েবকে হাত করতে পারে—
হর্ষা আস্তে আস্তে চলে গেল। বাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। "ভাত বাড়া হবে?"— সরোজিনী এল জিজ্ঞেস করতে, দেখল বলিদত্ত গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। সমান ছন্দে তা'র বুক উঠছে নাম্‌ছে, জোর নাক ডাকছে। ঠোঁট বেঁকিয়ে সরোজিনী হাসল।
হাত টেনে জোরে ঝাঁকি দিয়ে হাঁকল—"ওঠ, ওঠ, ভাত বাড়া হচ্ছে।"

□

তরুণ মিষ্টার শর্মা এত পূজার অযোগ্য ছিলেন না; কারণ, তিনি মানুষ এবং খালি মানুষ নয়, মানুষের তারুণ্য!

মনের যৌবন, দেহের যৌবন যে অটুট রাখতে পারে, জীবন তার সম্পদ। চোখে ছানি পড়েনি; মনে নেই ঘায়ের মড়মড়ি কিংবা দাগ। ইন্দ্রিয় সতেজ—নিতে এবং দিতে। সে পাথরের ঢিবির মধ্যে সরস চারা গাছ, তাই তার গর্ব, গৌরব।

এবং এই ছিল গোড়া থেকেই তাঁর ধারণা নিজের সম্বন্ধে। নিজের ইচ্ছার ব্যতিরেকে, বিনা চেষ্টায় পশ্চিমাঞ্চলের কোন বড় পরিবারে আহ্লাদে খোকা হয়ে তিনি জন্মেছিলেন; একটা কুটো কি করে দু'খানা হয়, সে বিষয়ে তাঁর মাথা একেবারেই ঘামাতে হয় নি, কুটো নিজে নাড়ার কথা ত' দূরে থাক্।

তারপর জীবনও গড়ে এসেছে পাহাড়ে পাহাড়ে—বিনা ইচ্ছায়, বিনা চেষ্টায়। প্রশ্ন না করে, আপত্তি না তুলে, তিনি গ্রহণ করেছেন নিজের জন্য বিধিনির্দিষ্ট নির্বন্ধ—দেখে এসেছেন—সবই মঙ্গলময়। সব বিধানের উদ্দেশ্য এক—আনন্দ।

জন্ম থেকেই সায়েব হ'তে হয়েছিল। যে পরিবারে তাঁর জন্ম, সেখানে বাবাকে ডাকা হয়—ড্যাডি, মা'কে ম্যামি বলে। বসা, খাওয়া, হাঁটা, সবেতে সেখানে আছে সংস্কার কয়েকটি; বাইরের এ সংস্কার মেনে নিলে, ব্যাস্, কারুকে পরোয়া করার দরকার নেই বাড়ীতে, অথবা সায়েবী স্কুলে। তাই শিশুকাল থেকেই তাঁর শিক্ষা, চোখকান বুঁজে সংস্কার মানতে হবে, তার নামই শৃঙ্খলা; সেটুকু করা শেষ হ'লে তারপর যা খুশী কর। আচারে সংস্কার-প্রিয়তা, ব্যবহারে স্বেচ্ছাচার—এরই সংস্কৃত নাম 'ব্যক্তিবাদ'

বাইরে গত্ 'ডিসিপ্লিন', তার আড়ালে খুশী মনে আপন রুচি-মাফিক জীবন, অর্থাৎ, তাঁদের শ্রেণীতে মার্জিত ভাষায় "ব্যক্তিত্বের বিকাশ।"

এই হু'টি কাজই ঘটে এসেছে নিজে নিজে। তাঁর জীবনভঙ্গীর গোছানো খোলে আর্থিক অনটন ঠোক্কর দেয় নি; তাই তিনি বেড়ে উঠেছেন সোজাসুজি আপন বিধিনির্বন্ধে।

উচ্চ শিক্ষা, তা-ও অনায়াসে, তা-ও সংস্কার। কখনও তিনি ভেবে দেখার কষ্ট করেন নি, নিজের জ্ঞানপিপাসা ছিল, কি ছিল না। উচ্চ-শিক্ষা তাঁর সমাজের অঙ্গ, সবাইকে তা'ই তা শিখতে হয়। সুতরাং সে শিক্ষার কোনও আদর্শ বা উদ্দেশ্য ছিল না; সমাজের অঙ্গ না হ'লে, তা আবশ্যকও হত না। সে উচ্চ শিক্ষার অবয়ব, তোড়জোড়, নিজের পরিধেয় পোষাকের মত। বাপ মা এমনটি চান, সমাজ এমনই চায়, সুতরাং—।

চাকরী, তা'ও অনায়াসলব্ধ; নিজে সে বিষয়ে ভাবার আগেই চাকরী এসে পৌঁছে গিছল। বাবা চা'ন তাই। কোম্পানীর উঁচু-মহলে বাবার অখণ্ড ক্ষমতা। বাবা বললেন—'চাকরী কর।' তা'ছাড়া ও সমাজে এ বয়সে সকলকেই হতে হয় 'কেউকেটা'; সুতরাং চাকরী হ'ল। গোড়া থেকেই কর্তাদের, বাবার একটা কথাতে, ব্যস্।

অবশ্য কোম্পানীর নিয়মের খাতিরে, 'ডিসিপ্লিন' সূত্রের সার্থকতার জন্য নিজেকে বেশ পরিপাটি সাজাতে হয়েছিল, হাজির হতে হয়েছিল এক বাছাইয়ের বৈঠকে। সেখানে পঞ্চায়েত বসেছিল পাঁচ বিশারদের। তাঁরা তাকে নিরীক্ষণ করেছিলেন খুঁটিয়ে আপাদ-নখশিখ, প্রশ্নও জিজ্ঞেস করেছিলেন, নম্বর লিখেছিলেন কাগজে। যে সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন, হ'তে পারে সেগুলো তত কঠিন নয়, নিতান্ত শিশুশ্রেণীর। বাচ্চারাও তা'র কিছু কিছু উত্তর দিতে পারত:—ভূগোল থেকে—"ছ' ঋতু কি করে হয়?" ইতিহাস থেকে—"পৃথ্বীরাজ কেন হারলেন?" স্বাস্থ্যরক্ষা থেকে—"মাছি থেকে কি কি রোগ হয়?" বিজ্ঞান থেকে—"বিজলীবাতি কি করে জ্বলে? কলে জল আসে কেন?" সাহিত্য থেকে—"ইকবাল কেমন কবি?" খবর কাগজ থেকে—"পাটের দর চড়ল কেন?"

সহজ প্রশ্ন; কিন্তু বাবাকে তা' বলায়, তিনি গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়েছিলেন, বলেছিলেন—"ওরা তোমার মনটাকে পরীক্ষা করেছে, সাইকোলজিকাল টেষ্ট এত সহজ ভেবো না।" আত্মবিশ্বাস ফিরে

এসেছিল অনেকটা, এ কথা শুনে, যদিও মনের আড়ালে একটু আধটু সন্দেহ ছিল—'এ একটা ফার্স, প্রহসন, পরিহাস।'

কোম্পানীর বিধানে সেই লোক দেখানো বাছাই বৈঠকে আবির্ভূত হয়েছিল একটির পর একটি, অনেক পরীক্ষার্থী, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা—ফার্ষ্ট, ফার্ষ্ট ক্লাস্ ফার্ষ্ট, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ফার্ষ্ট তারা কল্কে পেল না। শর্মা আবৃত্তি করল তাদের পরাজয়ের কারণ—"সাইকোলজিকাল টেষ্ট—জোর মুখস্ত করা জবাব যথেষ্ট নয়। পরীক্ষক পঞ্চায়েৎ চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নের উত্তর শুনতে শুনতে নিংড়ে নেবেন উমেদ্‌দারের সমগ্র মনের রূপ, সেখানে নিস্তার নেই।"

এ বিশ্বাস দৃঢ় হ'ল, পাণ্ডের পরাজয়ে। পাণ্ডে আগাগোড়া শর্মার সহপাঠী, বিদ্যায় অপ্রতিহত, অধ্যাপকদের নয়নের মণি, বলিষ্ঠ লেখক, জোরালো বক্তা; কিন্তু পাণ্ডে গরীব, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংগ্রামশীল, পাণ্ডে শর্মার বিপরীত; তা'র যুক্তিও উলটো শোনায়। সে বলে—"সংগ্রামে মানবিকতার পরখ হয়, নির্যাতনে হয় তা'র বিকাশ, স্বস্তিতে হয় তার বিনাশ।"

শর্মা হাসে, বলে—"যে গাছ কাঁকুরে জমিতে জন্মে, সে বাঁচে হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে, গৌরব করার কিছু নেই তা'র এব্‌ড়োখেব্‌ড়ো গাঁট ভর্তি গড়নে, তা'র চিমসে চেহারায় নেই কোন মহত্ত্ব; সে শুধু প্রাকৃতিক নিয়মের উদাহরণ মাত্র। সে হচ্ছে নিয়মের সূত্র, জন্তু সব পরিস্থিতিই সইয়ে নেয়।"

পাণ্ডে বলে—"জীবনকে চাইতে হয় উগ্রভাবে, অনুভব করতে হয় তীক্ষ্ণভাবে, বোধশক্তি দিয়ে; সব ব্যাপারে দরকার কঠোর বিশ্লেষণ।"

শর্মা হাসে, বলে—"এ হ'ল অসুস্থ মনের লক্ষণ; অসুস্থ মন থেকে তৈরী হয় পাগল, একচোখো, অসহিষ্ণু। সুস্থ জীবের পক্ষে উপাদেয় হ'ল—সব খাওয়া, স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার মত সরল সহজভাবে জীবনের মুখোমুখি হওয়া; যা'-ই আসুক না কেন জীবন পথে, কাউকে বা কোন কিছুকে মূল্যবান মনে না করা।"

বাছাই পরীক্ষায় পাণ্ডে ফেল মারল। শর্মা নিজের মত যুক্তি দিয়ে সাইকোলজিকাল টেষ্টের যাথার্থ্য প্রমাণ করলেন—পাণ্ডের কমপ্লেক্স-গুলো ধরা পড়ে গেল পরীক্ষায়। যা'ক, সে বরং রাজনৈতিক আন্দোলন করুক, সে অসুস্থ জীব!

মনগহনে একটা ক্ষীণ আপত্তি উঠেছিল কিন্তু, পাণ্ডেরও যদি থাকত এমনই বাবা !

কিন্তু আত্মবিশ্বাসে এ আপত্তিও চাপা পড়ে গেল। সুস্থ বিশ্বাস সব দিনের মতই দেখা দিল যে, দুনিয়ায় প্রভুত্ব সকলের জন্য নয়। তা'র জন্য যোগ্য বলে বাছাই-করা থাকে কয়েকজন। একদল লোক পালকিতে চাপে, আর এক দল তা' কাঁধে তুলে হাঁক পাড়তে পাড়তে যায়।

বিধির বিধান! যে বিদ্রোহ করে, সে মূর্খই শুধু নয়, সে বৈনাশিক, নাশকতামূলক কাজ করে, সে বিপ্লবী, সে অসামাজিক, সমাজের পক্ষে সে বিপদ্‌স্বরূপ !

শর্মার ধারণা সব—খুব সাফ্‌; এ-ও তাঁর সমাজের বৈশিষ্ট্য, সে সমাজের গর্ব: সে সমাজ বলতে পারে জোরালো ভাবে যে, অভিজ্ঞতা থেকে অভিমত তৈরী হয়, তৈরী হয় ধারণা; আর, একবার তৈরী হ'লে, তা হয় স্থায়ী। এই তৈরী মতবাদ অক্ষত রাখাই হ'ল ঐ সমাজের ভিত্‌, তা'র বনেদ্‌, তার মেরুদণ্ড, সব। যখন সকল বিষয়ে এই তৈরী মতবাদ কোনও সমাজ বদ্‌লায়, তখন হোয়াং-হো নদী তা'র গতিপথ পরিবর্তন করার মত, ফল হয় শুধু ধ্বংস।

কলেজে শর্মা বল্‌ত পাণ্ডেকে, "কি তুমি বেশী স্বাধীনতা চাও, হে! আমাদের সামাজিক সংগঠনে অভাব আছে নাকি স্বাধীনতার? নিতান্ত চরমপন্থা আর পাগলামি ছেড়ে, সুস্থ, সাধারণ হয়ে তুমি চোখ বোলাও, দেখবে লোকেদের হাতে বেড়ি নেই, মুখ চাপা দেওয়া নেই, ইন্‌জেকশন্‌ দিয়ে চিন্তার ক্ষমতা হরণ করেনি কেউ। সুখে দুঃখে, ঘরকন্না করে জীবনের আনন্দ উপভোগের প্রচুর পরিসর আছে। তুমি পেটভরে খেতে পার, কেউ তা কেড়ে নেবে না, মনের খুশীতে প্রেম প্রণয় চালাতে পার; যদি না কারও দখল বা অধিকারে হস্তক্ষেপ কর, তবে কেউ তোমাকে পিটতে দৌড়বে না সেজন্য। নিরাপদে রুজিরোজগার করে যাও, সঞ্চয় করতে পার, টাকা খাটাতে পার। আইনশৃঙ্খলা মেনে দেশকে মজবুত করতে পার, করতে পার শক্তিশালী যা'তে শত্রুরা ভয় পেয়ে যাবে। রাষ্ট্র তোমাকে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে; কিন্তু অধিকার দাবী করার আগে কর্তব্য করা, কোমর বেঁধে দায়িত্ব পালন—বাধ্যতামূলক। দায়িত্ব এড়িয়ে শুধু ভোজের পংক্তিতে বসার সময় জোট বাঁধা আদৌ চল্‌বে না।

"তুমি প্রকৃতিস্থ হও, দেখবে সব ঠিক আছে। গড ইজ্ ইন হেভেন এণ্ড অল ইজ রাইট উইথ দি ওয়ার্লড ; কেবল আজ নয়, অল ওয়াজ রাইট উইথ দি ওয়ার্লড। শুধু দৃষ্টিকোণের দোষেই মানুষ দুঃখ পায়। ধর, তুমি পরনের কাপড় খুঁটিয়ে দেখতে চাও ; মাইক্রোসকোপটা যদি তা'র খুব কাছে লাগিয়ে দেখ, তবে দেখতে পাবে শুধু ছ্যাঁদাই। কার দোষ সে'টা ?

"তুমি বল্‌ছ ঢ্যাঙ্গা বেঁটে কেন থাক্‌বে ? কিন্তু তুমি তা কি করে দূর করবে ? জীব-জগৎ, বৃক্ষজগৎ, পাথর, আকাশ—যেদিকে চাও, দেখবে অসাম্য। তারপর উচ্চনীচ না থাকলে ফল হবে, স্ট্যাগনেশন। জল নিজের জন্য ঢালু জায়গা খোঁজে ; তাই উঁচুনীচু থাকলে হয় গতি, না হলে গতি যায় হারিয়ে।

"তুমি বল্‌ছ—এ দুনিয়ায় অনেক দুঃখকষ্ট আছে। আছেই ত'। যে পৃথিবী গড়েছে সে-ই জানে এ-র হেতু। দুঃখ না থাক্‌লে সুখ বোঝা যায় না ; অমাবস্যা না থাকলে পূর্ণিমার মূল্য কি ? এরই ওপর হিন্দুর দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি, বুঝলে ? বহু যুগের অভিজ্ঞতার ফল তা। আজকের পাগলামি নয়।"

পাণ্ডেও কি যেন উত্তর দিয়েছিল ; বলেছিল—এসব স্বস্তিবাদীর বাঁধা বুলি, বুদ্ধিজীবীর নয়। আর কি সব বকে গিয়েছিল—তা' মনে নেই। বুদ্ধিমান লোক অপ্রিয় কথা মনে রাখে না।

দুনিয়া সুখের জন্য, অপ্রিয় কথা হাতড়াবার জন্য নয়।

পাণ্ডে হেরেছে, আরও হারবে নিশ্চয়। পাগলে নিজের খেয়াল দুনিয়ার [illegible] মধ্যে ঢুকিয়ে যতই মত্ত থাক্, নিজের পথেই দুনিয়া চলবে চিৎকার করে, 'এ পাগল ! এ পাগল !' বারবার তা'কে হুঁশিয়ার করে দেবে। পাণ্ডেরও দশা হবে অমনি। তা'র আইডিয়াগুলোর ঝাণ্ডা উঁচিয়ে নেংটি পরে সে উপোসে থেকে জোগাড় করতে চায় আভিজাত্য। রাস্তায় চলন্ত মোটর ঘাড়ে পড়লে তাকে যাচাই করা যায় ; তখন কাপড় তুলে পাণ্ডে ফুটপাথে লাফ মারে, মোটরের চাকায় ছোঁড়া কাদা জলের উপদ্রব থেকে পালাতে। সেই "আভিজাত্য" বাঁচিয়ে রাখতে তা'কে করতে হবে অনেক কাজ, সে সব করবেও হয়ত। বুক পেতে, পিঠ পেতে সারা দুনিয়ার লাঠির ঘা সয়ে বীরত্ব দেখাবে ; পরে ভেঙ্গে পড়বে তা'র দেহের আঁটুনি, তার মনের জোর তার অবস্থার দর্প। জিরজিরে হাড়ের মধ্যে শুকিয়ে কাঠ হয়েও বেশী দিন থাকবে না,

তার প্রাণবায়ু, এ দুনিয়ায় স্থান নেই তা'র, যেমন নেই তা'র আইডিয়ার।

এই রকম হ'ল শর্মার মনের কথা। তা'র বিচারে এ সবের ভিত্তি খুব দৃঢ়, সে সুস্থ।

আপন বিশ্লেষণে সে ভাবে, মনের এ স্বস্তি বজায় রাখার জন্য দরকার দুটি জিনিষের, কমনসেন্স অর্থাৎ পরিস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ থেকে কাজ করা ও পরের প্রতি উদারতা, যথাসাধ্য পরকে সহ্য করে যাওয়ার গুণ, সহানুভূতি, অন্তত উপস্থিতবুদ্ধিতে, সাধারণ দয়া।

এবং এসব গুণ তাঁর আছে। তাই ভিখারীকে তিনি ভিক্ষা দেন, দাতব্য কাজে কখনও কিছু দানও করেন—অবশ্য কমনসেন্স-এর ভিতর এসব গা-সওয়া হয়ে গেলে; পরের দুঃখ দেখে 'আহা' বলেন—এত সব করে হৃদয়ঙ্গম করেন যে নিজের কর্তব্য করেছেন, তাই সর্বদা হাসিখুশী, চিন্তাহীন—

নিজের কর্তব্য? কি তা'র সংজ্ঞা?

পাণ্ডে বলে, পাণ্ডের দলের অন্যান্য অনেক হতভাগাও বলে—কর্তব্য নয় খালি মুখের সহানুভূতি, কর্তব্য নয় কেবল সমাজের ছোটখাট কয়েকটি অভাব দূর করা—ভিখারীকে একমুঠো ভিক্ষা দেওয়া, দুঃখীকে একটু 'আহা' বলা, এসব হচ্ছে রুগ্ন সমাজের অসংখ্য ঘা ও ফোঁড়ার মধ্যে একটা ঘা বা ফোঁড়ায় একটু ওষুধ লাগানোর মত। এ দিয়ে ফোঁড়া ওঠা কমবে না, ঘা বের হওয়া থামবে না; দরকার হ'ল সমাজের সমূহ রোগের নিদান ওষুধ, না হ'লে এ সাময়িক দয়া খালি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে অপমান করা; দুঃসময়কে না এড়িয়ে শুধু সময় কাটানো কোনমতে, নিজেকে ঠকিয়ে পরকে ঠকিয়ে।

বলবেই ত,' তা'রা যে চরমপন্থী, তা'রা একচোখো পাগল।

শর্মা হাসেন। ভাবেন, তেমন ক'জন আছে যা'রা সুখের মোহ এড়াতে পারে? নরম বিছানা, নিশ্চিন্ত মন মেজাজ, গরম চা, রসনার লালসা, গরম গরম, সিগারেট; যতদিন খুশী বাঁচা, বাইরে বেরোলেই "সেলাম, সেলাম" আপন খেয়ালপূর্তি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন নিভৃতে?

নারীও?

শর্মা হাসেন।

মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তি, সুখের সন্ধানী; নয়ত কাঁচাখেগো,

ন্যাংটো, গুহামানব কালক্রমে 'সভ্যতা' গড়ে, ষাটমহলা বাড়ী তুলে বাস করত না। আর পাণ্ডে নিজে ? নিজের আইডিয়াতে এতই যদি অটল, তবে কেন সে এসেছিল লোক দেখানো বাছাই পঞ্চায়েতের সামনে উঁচুপায়ার পদবীর প্রার্থী হ'য়ে ? শর্মা হাসেন, লোকে অনশন ধর্মঘট করে, কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে মাখন-পাঁউরুটি খায়। নিশ্চয় খায়, ধরে নিতে হবে খায় বলে ; কারণ, ধরে নিতেই হবে যে—মানুষ সুখ-সন্ধানী।

অতএব সমূহ কল্যাণ, সামগ্রিক যোজনা, সমূহ মোক্ষের কথা ভেবে মাথা গরম করে লাভ কি ? চেষ্টা করলেন ত' রামচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে গৌতমবুদ্ধ, মহাত্মা গান্ধী—অনেক লোক। তাঁরা অতিমানব, এক্‌সেপসন্স ব্যতিক্রম দিয়ে নিয়ম সিদ্ধ হয় ; তা'রাই জিতলেন ও তৎকালীন অবস্থাই প্রমাণ দিল যে মানুষ সুখ চায়। সে চায় যে, তা'র চোখের পরিসরের ভিতরে চরে বেড়াক—সে চায় জাগ্রত বর্তমান, চায় হাসি, কৌতুক, খেলা, আনন্দ। এই আনন্দে মত্ত থেকে তা'র গোষ্ঠী খোঁজে ভেড়ার পালের মত উপযুক্ত ডিসিপ্লিন, যোগ্য নিয়ন্তা। যে অন্যথা ভাবে, পাণ্ডের মত লোকে, তা'র মাথার স্ক্রু ঢিলে—বাস্, আর বেশী জানার প্রয়োজন নেই।

সুতরাং শর্মা কোম্পানীর বড় বড় কাজের উপযুক্ত।

ঝোপ বুঝে কোপ মারতে, যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হানতে জানেন তিনি।

বিবেকে 'কিন্তু-কিন্তু'নেই।

প্রয়োজন হলো ত'—চালাও লাঠি, মারো, কাটো, কঠোর কর্তব্যের ছাপ এতে। যতবার ভাববেন, অন্তর্দৃষ্টি পড়বে সেই দু'টি শব্দের ওপর —'কঠোর কর্তব্য'। তা নইলে—"আনো চা সিগারেট, বসুন আজ্ঞে, হা-ডু-য়্যু-ডু ?" এতে লেবেল মারা অন্য দু'টো কথা—'সামাজিক কর্তব্য'। কেতাবে আছে—'মানুষ হচ্ছে সামাজিক জন্তু'। ধরা যাক—কাজ করতে করতে কিছু একটা ভুল হ'য়ে গেল যাতে অন্যের কষ্ট হ'ল ; কথাটাকে যুক্তি দিয়েও ঘোরানো যাবে না, তবে একটা ছোট বিবৃতি অথবা—"পা লেগে গেছে ? আপনি আমায় ক্ষমা করুন"। এর জন্যও শাস্ত্রীয় সূত্র আছে—"মানুষ মাত্রেই ভুল করে।" সহজাত ভুল করার স্বভাবের জন্য অনুতাপ, অনুশোচনা করে ফল কি ? শাস্ত্র বলে 'গতস্য শোচনা নাস্তি।' বাস, পূর্ণচ্ছেদ। আপন ভুলের জন্য চাবুকে নিজেকে প্রহৃত করত মধ্যযুগের সাধু,

নানাপ্রকার পীড়া দিত তা'রা দেহকে, উপোস করত, করত কৃচ্ছ্রব্রত। সে ত' মূর্খতা! বরং—

"মাপ করুন আমায়।"

"প্লীজ এক্সকিউজ মী।"

"আই অ্যাম সরি"। শোধবোধ।

ফরওয়ার্ড আউটলুক—অগ্রগামী দৃষ্টিভঙ্গী; নিতান্ত পরিশীলিত, মার্জিত রুচি, সায়েবী মন।

গোড়া থেকেই ওই রকম। জন্মত সায়েব; আবার কর্মে, চিন্তায়ও--

শর্মা সতেজ, সুন্দর, প্রফুল্ল, তরুণ, স্বাস্থ্যবান, মনে নীরোগ।

অতএব জীবন তা'কে সুযোগ দিয়েছে, বেধড়ক, মনের আনন্দে, অথবা আনন্দের বদলে সুখ, আমোদ খুঁজতে পূর্ণ উৎসাহে লেগে পড়তে। শর্মা বেড়ে উঠেছেন যেন গোছানো বাগানে টবের ক্রোটন গাছের মত। সে গাছের শিকড় চারিদিকে খোলামকুচির দেওয়ালে ঘা খায়, কিন্তু সহজাত অভ্যাস—সীমার বেড়া তা'কে আকুল করে না। একটা লোক লাগানো আছে, পুরনো শিকড় কেটে ফেলে দিতে, পুরনো মাটি বদ্‌লে নতুন মাটি জোগাতে, প্রচুর জল দিতে, সাজাতে, খুঁড়ে মাটি আলগা করতে। কে কি সেবা দেয়, ভাবতে মনে আগ্রহ নেই, ভাবার দরকারও নেই; খালি সব, না চাইতে ঘটে; সুতরাং সে সব ঘটা উচিত বৈ কি!

সতেজ, সবল, সরস—টবের প্রিন্স অফ ওয়েলস্ ক্রোটন গাছ পাকানো, লম্বা লম্বা পাতা ঝুলিয়ে নিজের উৎকর্ষ ঘোষণা করে নীচের ঘাস, আগাছা, টম্যাটো ও বেগুন গাছের তুলনায়; নাই বা হল তা' খাদ্য তরকারী, সুগন্ধ ফুল; তবুও সে 'কেওকেটা'; সে-ই বড়, যে সম্মান পায়, যাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়। বাগান-ভরা সমাজে তা'রই আসন উঁচুতে। মাটির গাছ যদি তা'র কাছাকাছি আসে বা তা'কে চাপা দিতে চায়, তবে কেউ একজন থাকে যে, সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা করে—হয় টব্‌টা দূরে সরিয়ে নেয়, কিংবা আগাছা কেটে ফেলে দেয়, এমন কেউ থাকেই, হয় মালী, নয়ত যা' হোক তা'র নাম, সমাজে মাতব্বর, বাপ, শ্বশুর কিংবা বন্ধু! সে সমাজেরই সৃষ্টি; যতদিন পর্যন্ত সে থাকে, বাগান থাকে, সমাজ থাকে ততদিন পর্যন্ত, তা'র হিসাবে সৃষ্টি বেঁচে থাকে, ভগবান থাকেন, দুনিয়াও চলতে থাকে ভালভাবেই।

সুতরাং এই স্থিতিকে অক্ষত রাখা তা'র ধর্ম, এই ধর্ম সংস্থাপনার জন্য জেহাদ চালানো তা'র পক্ষে ঈশ্বর-বিহিত কর্ম।

সাদা চামড়ার গোরারা এই কাজ চালিয়ে গেলেন দেশে বিদেশে —পিঠে ছিল তাঁদের 'সাদা মানুষের বোঝা'। সেই ত্যাগের মহত্ত্ব বুঝলেন কবি কিপ্লিং। সভ্য দেশের লোকেরা তা' উপলব্ধি করে সম্মান জানাল। সাদা মানুষের বোঝা বয়ে তাঁরা অন্ধকার বনে বিজলীবাতি জ্বাললেন, জঙ্গল কেটে সাজালেন সংস্কৃতির ধোপ-দুরস্ত কোঠা; ঘুমন্ত, কুঁড়ে, রক্ষণশীল পৃথিবীকে বারংবার সজাগ করল এই সাদা সংস্কৃতি, তারপর সবাই উঠে পড়ে শুরু করল যুগনৃত্য, শিবতাণ্ডব।

এই ধর্মের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন প্রতি প্রদেশের ভদ্র, কুলীন দর্পী শ্রেণী, রাজ্যের সামন্তগোষ্ঠী। শর্মা তা'দেরই একজন, সে সম্মানার্হ।

□

বলিদত্ত বলে শ্যামবাবুকে—"ওঃ, সায়েব কি কালচার্ড, আশ্চর্য। ফাইল নিয়ে গিছলাম কুঠিতে; ভিতরে ডেকে নিয়ে বললে 'বসুন'। কি বিনীত বলার ধরন, মুখ হাসি-হাসি; কি একটা জরুরী কাজে ভিতরে গেলেন, বলে গেলেন 'দয়া করে একটু বসে থাকুন, এখুনি আসছি; আর ইতিমধ্যে সারা ঘর ঘুরে চোখ বোলাতে পারেন, এমন কিছু থাকতে পারে যা আপনাকে আনন্দ দেবে।' ওঃ কি মিষ্টি ব্যবহার, কি নরম মন, আমার ত' মাথা নীচু হ'য়ে গেল। সম্ভবত পায়খানায় গেলেন, তা'বলে মানুষ এমন বিনয়ে বলতে পারে! ভাবলাম—আদেশ পালন করা উচিত, সারা ঘর ঘুরে চোখ বোলালাম, সে এক স্বপ্ন রাজ্য! কি বলব? এই মোটা মোটা ঝকঝকে বই। মানুষ জন্মে দেখে নি, থাকে থাকে রাখা। দেয়াল-ভর্তি ছবি, সে সব উঁচুদরের শিল্পকলা, কচু বুঝি আমি! বোধ হয় সায়েব ছবিও আঁকে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য দেখলাম—অসংখ্য মাটির কারিগরী মূর্তি, সে এক এগজিবিশন। আর কি মূর্তি সব, জানেন? তা'র মধ্যে আছে সাধারণ মুটে মজুর, লাঠি ধরে আছে অন্ধ, থালা বাড়িয়ে ভিখারী, ওঃ কী হৃদয়। আজ্ঞে কি বলব,

হৃদয় বটে !"

শ্যামবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, বললেন "দানাপানির ঝঞ্ঝাট না থাকলে, মানুষ শখ করতে পারে। আমার আশা ছিল—ক্রিকেটে নাম করব, দেখব অষ্ট্রেলিয়া ; মিছে কথা ভাবছেন ? সেকালে নাম হয়েছিল, শুনে থাকবেন। সেকাল আর একাল ! হ'ল না, আজ্ঞে, হ'লই না কিছু। এখন কোম্পানীর কাজ।"

"হেঃ হেঃ—আপনি পয়েন্টটা মিস্ করলেন মানে কথাটা ঠিক ধরতে পারেন নি—"

"কোন্ কথাটা ?" শ্যামবাবু হাই তুললেন—"এসব জটিল কথা আমি বুঝি না, বলিদত্তবাবু ; বিশ্লেষণ কিংবা বয়ান শুনলে মাথা ব্যথা করে। আমি বলি কি ? যদি খোসামোদই কর ত', সর্বদা খোসামোদ ক্রুডম ; মানে, চেপে ধরে কষে লাগাও তেল, আর এসব গুজ গুজ ফিস ফাস থেকে কি মিলবে, বাবা ! আমি বিশ্বাস করি না ওসব নেপথ্যে মৃত সৈনিকের অর্ধোক্ত হাহাকারে ; করবে ত' কর প্রকাশ্যে কোলাহল 'হেইল শর্মা'।"

"আহা হা, আপনি উল্টো বুঝলেন ; এ খোসামোদ নয়, আজ্ঞে—নিরেট সত্য। সায়েব আর্টিষ্ট, সায়েব হৃদয়বান।"

গোপালবাবু ফাইল বগলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন কাছেই, অপেক্ষা করে ; তাঁর কান ঝন ঝন করছে। "সায়েব আর্টিস্ট, লঙ্কায় হরিকথা !"

নাঃ, এরা বুঝবে না—

অতীতের চাপে কষে বন্ধ করা কপাট খোলে অল্পই। কবজায় মরচে পড়ে গেছে, খুলবে না হাট হয়ে।

তন্ময় হয়ে বলিদত্তর মুখের পানে তাকিয়ে গোপালবাবু, তাঁর গোল মুখের এক ফালি ঝুলছে—ওগালে আঁবের মত উঁচু পান ; তিনি অচঞ্চল। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট টেনে নিয়ে প্যাকেটটা শ্যামবাবুর দিকে টেবিলের ওপাশে ঠেলে দিয়ে দেশলাই হাতে বলিদত্ত বলে যাচ্ছে—"সায়েব ছবি বোঝে, সে সমঝদার—ছবিতে ভর্তি ওঁর ঘর ; বোঝে কারুকার্য, শিল্প। ওরকম উঁচুমন না হ'লে কাজকর্মের মধ্যে মানুষ এ সবে মাতে না। বেয়ারা কি বলল জানেন—সায়েব সেতার বাজায়।"

সেতার ! ছ্যাঁৎ করে উঠল গোপালবাবুর বুক। তিনিও ত'—

"চুপ হোরী সীতার—মীরা কী হৃদয় কী—"

সেতারের কথা বলে বলিদত্ত বাজি জেতার মত গর্বোল্লাসে চেয়ে দেখল শ্যামবাবুর মুখভঙ্গী। তা'র চাউনি যেন কথা কইছে—"ইডিয়ট, কী বোঝ তুমি? এই দেখ।" ও দিক পানে ভস ভস করে ধোঁয়া ছাড়ছে, চেয়ে রয়েছে।

শ্যামবাবু নিবিষ্ট মনে ধ্যান করছেন সিগারেট প্যাকেটের ওপর ছাপা অক্ষরগুলোতে চোখ রেখে। উলটে পালটে পড়ে চলেছেন সেই প্যাকেটের লেখাগুলোকে।

গোপালবাবু ভাবছেন, অনেকদিন আগেকার কথা, তখন গোপাল-বাবু ছবি আঁকতেন, সেতার শিখতেন—

কেউ শেখায় নি, কেউ 'আর্ট' পড়ায় নি তাঁকে; তবু তিনি ছবি আঁক্‌তেন। ছেলেবেলায় ফুলটা, বেগুনটা থেকে শুরু করে ঘরের ছবি, গ্রাম, পুকুর-পাড়ে বটগাছের পিছনে সূর্যাস্ত, বাছুর দৌড়াচ্ছে মা'র কাছে, দুই মেড়ার লড়াই, নানা জাতের মানুষের ভঙ্গী—এই সব আঁক্‌তেন। ক্রমে মডেল খুঁজে খুঁজে ছবি আঁকা। এখনও ক'খানা কাঁচে বাঁধানো আছে, ছেলেমেয়েদের হাত থেকে বাঁচানো—নিজের স্ত্রীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ছবি ক'টি:—সাজগোজ করে হাসি মুখে, পান হাতে; খাটো কাপড়ে, এলোচুলে বঁটির সামনে তরকারী কোটা অবস্থায়, কলসী থেকে জলঢালার সময়কার। ছবিগুলোর নীচে এক কোণে ছোট ছোট করে লেখা নিজ নামের আদ্য অক্ষর তিনটি—'গো-কৃ-মি'।

আর নেই—আর্ট উজাড় হয়ে গেছে।

শেষের ছবি চেষ্টা করা হয়েছিল—বেচারী স্ত্রী রাগে, গালমন্দ করতে করতে খ্যাংরা হাতে, ইয়া বড় হাঁ করে বাচ্চাটাকে মারতে যাওয়ার সময়—

বহুদিন আগে, তখন মোটে চারটি ছেলেমেয়ে, তখনকার অবস্থার শুধু স্কেচ্ হয়ে আছে, স্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন "আবার এরকম হ'লে আমি কল্‌কে বীচির বিষ খেয়ে মরব।"

তেমনই সেতার—দু'বেলা ওস্তাদজীর বাসায় ছোটা, সেদিনও খতম। আজ হয়ত পাওয়া গেছে এক সায়েব যে সত্যি সত্যি আর্টের সমঝ্‌দার!

প্রকৃতই যখন কলাচর্চা করতেন, ছবি আঁকতেন, সেতারে টুং টাং আওয়াজ তুলতেন, তখন তিনি চাননি যে লোকে জানুক, তাঁর প্রশংসা করুক। তখন সাধনা ছিল আপনভোলা, খোলাখুলি শখ

আর নিজের আনন্দ; সাধনা ছিল নেশা, তা'র জন্য কত সময় গেছে, কামাবার সময় পান নি; বাজার করা থেকে কত জরুরী কাজ ভুলে গেছেন, বহু ত্যাগ করতে হয়েছে ঘরোয়া লোকসান সয়ে। সে ক্ষতির হিসাব ছিল না; আনন্দের উন্মাদনায় পুরে উঠেছিল বুক, ক্লান্ত অবশ দেহ; কিন্তু সাধনা ছিল চালু, মন খোঁজে নি পরের প্রশংসা।

কিন্তু যেদিন থেকে অভ্যাস ছাড়লেন, সৃজনী শক্তিতে ঘটল বন্ধ্যাত্ব, আপন অন্তরের শিল্পী সত্তা গেল মরে হেজে, সেদিন থেকে ইচ্ছা জেগেছে, আহা, কেউ যদি চিনত! তারিফ করত! মুষড়ে-পড়া নতুন অ-শিল্পী ব্যক্তিত্ব অতীতের শিল্পী সত্তাকে বেচে, বাঁধা দিয়ে লাভ করতে চায়।

অথচ দুনিয়া মূল্য দেয় না। প্রতীক্ষায় কেটেছে দিনের পর দিন—কেউ খোঁজ করতে আসেনি শিল্পী 'গো-কৃ-মি' কে। ভাল আঁকতে পারতেন—তারপর সে প্রতীক্ষাও উবে গিছল। হঠাৎ আজ—

ঘাম্‌তে ঘাম্‌তে তড়িঘড়ি এসব ভাবতে ভাবতে দাঁড়িয়ে রইলেন ফাইল বগলে গোপালবাবু। দু' এক কথা বল্‌তে ইচ্ছা তাঁর। কিন্তু তখনই এসে জুটলেন রণজিৎবাবু—লেগে গেল কথার ঝড়, 'বসুন, বসুন' 'আচ্ছা, একটু পরে আসবেন, গোপালবাবু।'

"আরে, আপনি বসলেন না যে, আমাদের কথা হচ্ছিল—শর্মা সায়েব সম্বন্ধে।" রণজিৎবাবু পাইপ কাম্‌ড়ে, বুকের ওপর আড়া-আড়ি হাত রেখে দাঁড়িয়ে শুনছেন; শর্মার নামেই তাঁর চোখ চক্‌চক্‌ করে উঠল, মুখে হাসি—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললেন—"বড় বড় লোকের বিষয়ে আলোচনা কি এমনি দু' এক কথায় হয়?"

"না, না, শোনা যাক আপনার মত—" শ্যামবাবু চেপে ধরলেন।

"মোষ্ট স্পোর্টিং সর্ট" রণজিৎ বাবু বল্‌লেন। তারপর তিনি দীর্ঘ দম নিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন—। কিছুক্ষণ রণজিৎবাবুর দিকে তাকিয়ে সকলে করল শর্মা সায়েবের মৌন স্মরণ, তারপর শুরু হল কীর্তন। রণজিৎ বাবু বললেন—"অতি আশ্চর্য লোক উনি; এই ত' তাঁর সঙ্গে শিকারে গিছলাম্; আজ সকালে ফিরলাম।"

বলিদত্ত চিৎকার করে উঠল—"সত্যি"? তা'র চোখে, আগে রণজিৎ বাবুই আশ্চর্য লোক; নতুন সায়েব পা না ফেলতেই যে

তাঁকে কবলিত করে তাঁর সঙ্গে শিকারে যান।

"শিকার—" শ্যামবাবু চ্যাঁচালেন "আমায় একটু জানালেন না? মানে আমার এলাকায়, যেখানে আমাদের মাইনিংয়ের বন্দোবস্ত হচ্ছে, সুন্দর জঙ্গল, অঢেল জানোয়ার, লোকও আছে অজস্র আমাদের হাতে; সবরকম সুবিধা করে দিতে পারতাম, কিছু জঙ্গলী নাচেরও। আঃ, বলতেন যদি একটু—"

"আপনার এলাকায় নয়, সায়েব গিছলেন পাখী মারতে। লালমাথা হাঁস আর নাগালে পেলে কিছু স্নাইপ; এই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু আসল কাজ হ'ল, খোলা জায়গায়, নির্জনে খুব খানিকটা ঘোরা—"

"সে কি? সে কি?—" সকলে কান পেতে। রণজিৎ বাবু হাসতে হাসতে বললেন—"অবশ্য অতি কাছাকাছি তাঁকে খানিকটা চেনবার সুযোগ হয়েছে আমার। তবে—"

বলিদত্ত তাঁর খুব কাছে চেয়ার টেনে ধনুকের মত গলা বাড়িয়ে মুখিয়ে আছে; শ্যামবাবুর প্রকাণ্ড মুখ, তাঁর দুই হাতের ওপর ভর দিলেন, অন্যেরা ঘুরে বসেছেন রণজিৎবাবুর দিকে মুখ করে।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রণজিৎবাবু বললেন—"ভারী আলাপী আর মিশুক, অত্যন্ত সাদাসিধে, মন খুলে কথা কন। অথচ সেই কথার ভিতর আছে একটা মন, একটা হৃদয়—যা নাকি অমূল্য। খুব আধুনিক রুচি; উনি চান সবাই খেলাধুলো করুক, ক্লাবে আসুক, ফুর্তি করুক, আমোদ-আহ্লাদ করুক। এতদিন পরে লাল ফিতার শিকল ও সমাজের সাবেকী বোঝা আলগা করতে আমরা একজন মানুষের মত মানুষ পেয়েছি। জানেন তাঁর প্রোগ্রাম কি? বড় থেকে ছোট—সবাইয়ের বাসায় যাবেন, এক এক রাত এক এক বাড়ীর অতিথি, সকলের সঙ্গে চেনাশোনা চাই।"

সকলে পালা করে রণজিৎবাবুর হাসির ধুয়া ধরল।

সভা ভাঙ্গল।

কাগজের ওপর চড় চড় করে কলম চলল তাড়াতাড়ি—মনে 'সায়েব ভাল, খুব ভাল।'

□

"একটা সিগারেট ধরাও না রোজ—" মিলি বাড়িয়ে দিল একটা

"তুমি বদলেছ সত্যি, কিন্তু কতকগুলো বিষয়ে তুমি রয়ে গেলে নিতান্ত সেকেলে, বলব কি কি—?"

গাড়ী চলছে, সরোজিনী মুচকি হেসে বলল "বল না, বলতে তোমার মুখে কি বেড়া না আগল দেওয়া যে,—"

"হ্যাঁ, তাই ত' বলবে; তুমি বোঝ না—ওয়ান থিং লিডস টু এনাদার—একটা কাজ শুরু করেছ, কি, মন ধেয়ে যায় পরের কথাটায়—; সিগারেট ত' খাও, তবেই দেখবে তারপর আর কি হয়—"

"আর কি হবে? বোধ হয় দু'টো ডানা গজাবে আর ফুর্‌র্‌ করে উড়ে যাওয়া—না কি?"

সরোজিনী হেসে উঠল। ষ্টিয়ারিং এ হেসে ফেলল ড্রাইভারও; তক্ষুনি তা লুকোবার জন্য আরম্ভ করল নকল কাশি।

এই তা'র দুঃখ। সে গাড়ীর চালকমাত্র, গাড়ীর সঙ্গে মেশা একটা যন্ত্র যেন; এর বেশী নয়; অথচ ত'ার চোখ আছে দেখতে, কান রয়েছে শুনতে, কিন্তু তার বেশী নয়; গাড়ীর ভিতরের দিকে তা'র পিঠ, সামনে রাস্তা—।

"এই দেখ, কেমন ঠাণ্ডা পড়েছে, ড্রাইভার কাশছে, দিদি ত' একদম ঘুমে ঢুলছে, মনে মনে গরম পাচ্ছে। আর তুমি আমি? দুনিয়া ঘুমিয়ে পড়লেও আমরা জেগে—গরম না হলে কাজ চলে? নাও, সিগারেট ধরাও—"

একই গতিতে চালিয়ে যাচ্ছে ড্রাইভার—হর্ন, ক্লাচ, ষ্টিয়ারিং, গিয়ার আর সামনে রাস্তা। মাথা বিকিয়ে পড়ে আছে পাঁচ পাঁচটা বছর—শুধু কি দানাপানির চিন্তা? বাকি যা, তা কচিৎ "দেখা দিয়ে হরে নিল কে কনক-গৌরী" গানের কলির মত, তার পৌরুষকে রাখে জাগরূক। তা নিভৃতের জিনিষ। তবুও সেটুকুতেই সে পায় গুন্ গুন্‌করা কবিতা, তাঁ'র ছোট কুঠরীতে উঁচু গলায় ধরে গান, ইয়ার বন্ধুর কাছে বলে হরেকরকমের উপন্যাস, কিন্তু দিব্যি গালিয়ে নেয় যেন কাউকে সে কথা না বলে। কথা তবু রটে।

মিলি খল্ খল করে হাসছে, হাস্‌লে সে আলুথালু হয়, তা'র হুঁস্ থাকে না। ড্রাইভার রাস্তার দিকে রেখেছে চোখ, আর মন—?

জলের মত ধারাস্রোতে মিলি বয়ে যায়, মনের খুশীতে বানের জলের মত ওপরে চেপে ওঠে, সেই কয়েকটি ক্ষণ—কত আপনার হয় সে!

তারপর বন্যা বন্ধ, চোখ আর পিছনে ফেরে না।—

দীর্ঘশ্বাস চেপে ড্রাইভার সামনের দিকে মুখ করে গাড়ী চালাচ্ছে— মনে হচ্ছে জীবনটা এমন ধূসর, এমনি রসকষহীন, চলেছে ত' চলেছে—

"শোন রোজ"— মিলি বলল সরোজিনীকে "তোমার নাম ছিল—সরোজ, ইংরেজীতে তা'র মানে দুঃখ ; 'স' টা মুছে দিয়ে তা'র ভিতর থেকে বের হ'ল 'রোজ'—মানে, গোলাপ, কি ক্ষতি এতে ? তেমনি কেটে ছেঁটে উড়িয়ে দিতে হ'বে যত সংস্কার, যত সেকেলে ঢং, সং ; তবেই গোলাপ ফুটবে। এখনও তোমার লজ্জাসরম, এখনও তোমার ভয় ভয়। অথচ তুমি একটি রত্ন, সাজাতে পারলে কি না হ'তে পার ? এখনও তুমি সিগারেট খেতে নারাজ, নাচতে গররাজী। যা ফিগার, যা কাট্ তোমার—চমৎকার নাচতে পার।"

"লাভ ?"

"সুন্দর হওয়াতে লাভ কি ? লাভ—সৌন্দর্য, সৌন্দর্যের জন্যই সৌন্দর্য, লাভের জন্য নয়। তোমার ভিতরে যা আছে, তা যদি বিকশিত হয়, তবে তুমি বুঝবে পরিপূর্ণ জীবন কি ? তুমি এক সুন্দর উপন্যাসের মত আসছ অর্ধেক রাস্তা—তারপর পিছিয়ে যাচ্ছ। আমরা আধুনিকা, তাই আমরা স্বস্তিবাদের সংস্কার মানতে রাজী নই ; কারণ, জীবন অনিশ্চিত, জীবন দুঃখের। এই নিমেষ-টুকুই আমাদের, এতে যতটুকু সুখ পেতে পারি। এই যে এক মিনিট—একবার গেলে আর হয় ত' ফিরবে না।"

মিলির দর্শনশাস্ত্রের অর্থ সরোজিনী বুঝতে পারল না, কিন্তু ছুঁয়ে গেল তা' তা'র মন। সে ছোঁয়া কেমন যেন স্যাঁতসেঁতে, কান্নাভরা, পরের ব্যথা যেন নিজের মনে বাসা বাঁধে। এ ছোঁয়া লেগে সরোজিনীর মনের ভিতর থেকে বের হ'ল একটা অবান্তর প্রশ্ন—

"আচ্ছা, তুমি বিয়ে করনি কেন ?"

হাসতে হাসতে কথাটাকে উল্টে মিলি জিজ্ঞেস করল—"তুমি কেন বিয়ে করেছ, তা'ই বল ?" "না, সত্যি সত্যি", সরোজিনী বলল "তোমরা দু'জনে যেন দু'টি ফুল—ধ্যেত, আমি গুছিয়ে বলতে জানি না, তোমরা, মানে সব জিনিষই এত ভালবাস, সবেতে তোমাদের এত মন লাগে, তোমরা বিয়ে কর না কেন ? তোমাদের যোগ্য বর

নেই ? বর, ঘরবাড়ী, ছেলেমেয়ে, তোমাদের ত' সব ভাল লাগে!"

মিলির হাসি বন্ধ হ'ল। সকলে থাকলে, হয় ত' সে এ প্রশ্নের ওপর ঠাণ্ডা কাটারি হানত; কিন্তু হেসে হেসে সে সরোজিনীর ওপর ঢলে পড়ল। চটপট ব্যাপারটার ফয়সালা চায় না সে। হাসি-হাসি মুখ করে কথা মেপে মেপে মিলি বলল— "তোমাকে একটা কাহিনী বলি, শোনো। কি কাহিনীই বা বলি ? যে যত দৌড়য়, সে তত হোঁচট খায়, জান; যে যত হাত পাতে, সে তত শোনে—'দূর, দূর'; 'যার যত বেগ, তা'র তোড় তত বেশী'; এ'কথা আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রমাণ করে গেছে। ফের কেন আমরাও সে পুরনো পথে ? তুমি ফুল ছিঁড়তে হাত বাড়াও, পাবে কাঁটা, পাবে আঁচড়। এ দুনিয়ায় সকলে কি আঁচড় কামড় খেতে ভালবাসে, ভেবেছ ? কেউ যদি ভাল না বাসে ?"

"তবে, ফুল কি ভাল নয় ?"

"নয় কে বলল ? যে না জানে, সে আগে একদফা আঁচড় খাবে, তারপর ফুল পাবে। ততক্ষণে আঁচড়ের চোটে প্রাণ যায় যায়। যে জানে, সে আস্তে নাক কাছে নিয়ে ফুল শুঁকে আসবে, এই যেমন আমি শুঁকছি তোমাকে—বাঃ, বাঃ, কী খাসা খসবু তোমার গায়ে, রোজ। মিষ্টার দাস থাকলে আমাকে হিংসে করতেন—"

"ধ্যেত," কথা ঘুরিয়ে সরোজিনী বলল "বাড়ীঘর কা'র তেতো লাগে ?"

"লাগে না তা'র যার বিশ্বাস থাকে। বিশ্বাস আজকাল এযুগে কে রাখতে পারে ? যে জানে না, সে মূর্খ, সে গেঁয়ো। ভুলে যাও কেন ? এ হল কলিযুগ। এ যুগে সত্য নেই, বিশ্বাস নেই। কিছু নেই।"

সরোজিনী দুই হাতে মিলির গলা জড়িয়ে ধরে বলল—"থাক থাক, আমি আর জিজ্ঞেস করব না—" মিলির ভাষা তা'র পক্ষে বোঝা মুশকিল, কিন্তু তা'র বলার ধরন, তা'র গলার আওয়াজ, কথা বলার সময় তা'র চোখের চাউনি, তা'র মুখের ভঙ্গী, সব মিশে গড়ে তোলে যেন এক করুণ ভাব—মুহূর্তে যেন মানুষের রূপান্তর; এ মিলি অন্য সময়ের মিলি নয়—এক অতীতের আর্তনাদ যেন এ।

"থাক থাক, মিলি, আমি আর শুনছি না। তুমি পণ্ডিত, কি বলছ তা আমি কি বুঝছি ?" কিন্তু চোখের পলকে মিলি যেন কেমন হ'য়ে গেল—আগ্নেয়গিরির পেটের ভিতরের টগবগে তরল

প্রবাহ যেন ছুটে চলেছে তা'র মুখের কথায়। মানে বোঝা যায় না। কিন্তু কী রগরগে ফুটন্ত ঝাঁঝ সে কথায়—। মিলি বকে চলেছে—

"সমাজে আমাদের সম্বন্ধ ত' লেন-দেনের মধ্যে? তা'র জন্য একটা সমাজের খেলাঘর চাই কেন? রাস্তায় তুমি কোন লোককে এক খিলি পান দিলে, সে কি তোমার সঙ্গে দু'টো কথা বলবে না? আজ স্থায়িত্ব আছে কিসের যে, ভিত্তি নড়ে গেল বলে কাঁদতে হবে? সমাজ হয়ত সুপ্ত ছিল; বিশ্বাস ছিল—এই কাজের এই ফল হয়। তারপর যুগ বদলালো ঠিক যেমন ঋতু বদলায়; লোকে ঘরের মধ্যে ঘুমোত—তখন ঘড়িতে আওয়াজ হয় ত' দরকার ছিল না; কিন্তু একদিন দেখা গেল প্রচণ্ড রোদ, অসম্ভব তাত। একটার পর একটা মহাযুদ্ধ। কাল যা ছিল বিলাসের শহর, আজ তা ছাইয়ের গাদা। তেমনি এদিকে, ধসে পড়ল পুরনো সমাজ, পুরনো দেউল। এধার ওধার ভোঁ ভোঁ করে ঘোরে, দলে দলে মানুষ—যেন ফুটন্ত টগবগে। এ দুর্ভিক্ষ নয়, দুর্ভিক্ষের চেয়ে বড়। দুর্ভিক্ষ দু'দিনের, সবাই জানে, আবহাওয়া বদলাবে, দুর্ভিক্ষ শেষ হ'বে। কিন্তু এ? এ কি শেষ হবার? এ যে যুগান্তর, কি করবে তুমি। ভূমিকম্প হলে তুমি কি কর? যে মাটিতে পা রেখেছ, তা যদি দুলে ওঠে?"

"এ সব বড় বড় কথা, মিলি, আমি কি পড়াশুনো করেছি যে বুঝব?"

"বুঝবে না? চোখের সামনে যা দেখছ তা না বুঝে কি চোখ ফেরাবে? হাজার হাজার বছর ধরে লোকে কোথাও বসবাস করত, বাড়ীঘর করত, ছেলেমেয়ে-নাতির জন্য জিনিষপত্র জোগাড় করে যেত, আজ দেখল যে মাটি থেকে তা'র শিকড় সুদ্ধ ওপড়ানো, সে রাস্তার জঞ্জাল! যেদিকে হাওয়া সেদিকে ভিড়ছে। এই হল এ যুগের চেহারা, চাল নেই দেয়ালও নেই, কা'রও ওপর বিশ্বাস নেই। পথে একজন সঙ্গী পেলে, সে হয়ত তোমায় দিল চা'য়ের মধ্যে ধুতরো বিষ। আজ তুমি আছ, কাল তুমি নেই।"

"তুমি এত ভাবতেও পার মিলি, অথচ শখ মেটাও, হাস, খেল। আমি যদি তোমার মত এত কথা পেটে রাখতে পারতাম তবে ভাত খেতে পারতাম না। সত্যি, এত ভাবলে মানুষ জাঁতা হয়ে যাবে। দু'নিয়াতে দুঃখী আছে, গরীব আছে, তাঁদের কথা যদি সব সময় চিন্তা করি, তবে তাদের দলে মিশে যাওয়া ভাল। নাহ'লে জঙ্গলে গিয়ে বাবাজী হও—মিলি দেবী হবেন দেখি মাতাজী; একজন

বাবাজী পেলে ত' হয়। যেতে দাও ওসব, ভাল কথা কিছু বল—"

"ওই ত' তোমার ভুল। বাবাজী হ'ব কেন? যে একবার দুঃখ পায়, সে ভাবে সংসার ত্যাগ করবে। যে সর্বদা দুঃখ পায় সেভাবে এ দুঃখকে সুখ ভেবে কি উপায়ে বাঁচা যায়। আমরা কি ডাঁটা চিবিয়ে সন্ন্যাসী হ'তে সংসারে এসেছি? না, এসেছি ফুর্তিমৌজ করতে? আমাদের যতটুকু হোক, ততটুকুই সই। তারই ভেতরে সুখ করে যাব।"

"বেশ ত', সেই কথাই বলছি, বিয়ে করে ফেল; আমি রণজিৎ বাবুকে বলব।" নামটা মুখে শুনতেও রাঙা হয়ে উঠল সরোজিনী; মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল—"আঃ, নিলি আমাদের কি ঘুম ঘুমুচ্ছে, আরামে আছে।"

মিলি বলল "এ যুগ চায় এমনই আরাম, যা, যতটুকু, যখন, যেখানে পাওয়া গেল। সুবিধা লুটে নাও, ওপরে অ্যাটম বম, নীচে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, আর এ সুবিধা পাবো কি না, জানা নেই। সুবিধা লুটে নাও; বাড়ী করব, তা'তে বাস করব, ভাবতে গেলে সব ধসে পড়বে। এ যুগের সহযাত্রী আমরাও ক্ষণিকের দল, যুগসন্তান আমরা শুধু মুহূর্তের উপাসিকা, ডানা মেলে উড়ে যাও মর্জিমাফিক; এ যুগে স্থিতি নেই, স্থিরতা নেই; সে সব আমলের মাপকাঠিতে আমাদের মাপতে বোস না।"

সরোজিনী গুম মেরে শুনছে। বলল "তারপর? শেষ কর, আর কেন?"

"করছি ত'—তা'ই ত' বলছি, এগিয়ে এস, একা বাঁচার অধিকার কি তোমার? সকলে যদি পোড়ে একা তুমি রক্ষা পাওয়ার সন্ধানে কেন? আধুনিকা হও, নোঙ্গর ওঠাও।"

"তারপর?"

"শ্রোতাদের ধন্যবাদ দি তা'দের ধৈর্যের জন্য; তবে বলে রাখি, আপনাদের ধৈর্যও এযুগে অশোভন, যুগ ধৈর্য চায় না, সে আশা করে আপনাদের অধীরতা। বই পড়েন, ত' পাতা উলটে যান, গালাগালি যদি দেন—সে ত' খুব স্বাভাবিক; বক্তৃতা শুনতে শুনতে হো হো, ঘো ঘো করে উঠবেন, পচা ডিম, পচা পাকা কলা ছুঁড়ে মারবেন, না হলে কি করে প্রমাণ করবেন আপনার স্বাধীন মত। সভাস্থল অপবিত্র করা ত' আরও বেশী স্বাভাবিক। তবে, বলে

রাখি, লিপষ্টিক, রুজ পাউডার, ভ্যানিটি ব্যাগ ও হাই হীল জুতো আমাদের মনের চামড়া নয়। এসব হ'ল যুগের পোষাক; আগে যেমন মেয়েরা পরত গাছের বল্কল; সে পোষাকের সঙ্গে ভিতরের মনের কিছু সম্বন্ধ ছিল কি? আর প্রাণ? সে ত' নিত্য সনাতন—"

"ক্যাপিট্যাল, ক্যাপিট্যাল!" নিলি হাততালি দিয়ে নড়ে উঠল।

"সে ত' ঠিক!" মিলি বলল "ক্যাপিট্যাল মানে পুঁজি; আগে ক্যাপিট্যাল, পিছে ক্যাপিট্যাল, উদ্দেশ্য ক্যাপিট্যাল– সেই জন্যই আমাদের অভিযান। যদি আমাদের ক্লাবের জন্য চাঁদা কিছু না উঠল, তবে দোরে দোরে ঘুরে ফল কি?"

"না, বেশ মজা লাগল তোর বক্তৃতায়"—নিলি বলল।

সরোজিনী অবাক, বলল "তবে এতক্ষণ ধরে তুমি কি লেকচার দিচ্ছিলে, মিলি?—"

"সিওর, না হলে রাস্তায় সময় কাটত কি করে? সেই ত' মজা! তুমি কাউকে তা'র বাড়ীর কথা জিজ্ঞেস কর, সে তোমায় শুনিয়ে দেবে লেকচার। তুমি চাও বারংবার—তা'র মনের কথা? তা'র মন ত' কাঠ হয়ে গেছে। হৃদয় কৈ? তবে বাজাতে জানলে কাঠে কাঠ ঠুকে ভাল কাঠতরঙ্গ হবে, শোনাবেও বেশ।"

"মা গো! আর তুমি নিলি? তুমি ঘুমোও নি?"

"যা দেখা যায় তা সব সময় সত্যি নয়—এ কথা মানুষের পক্ষেও খাটে; এই তুমি দেখাচ্ছ 'ক্যাডি', অথচ তুমি 'বডি'।"

"ক্যাডি ফের বডি—কি বডি; মাগো! কি সব কথা!"

দুই বোন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, হাসল। মিলি বোঝাল—বলল, "ক্যাডি মানে ভারী ঝানু, বডি মানে কাঁচা। মানে, তুমি ঝানু দেখতে; কিন্তু তুমি নিতান্ত সরল; মানে, সাংসারিক অভিজ্ঞতা কিছু নেই, তাই নেহাৎ ভাল মানুষ।"

"এই যেমন গিনিপিগ আর কি! কী পোষমানা"—নিলি বলল। সরোজিনী খুশী—বলল "তোমরা লেখাপড়া জানা মেয়ে, এ হাটে কিনে সে হাটে বেচতে পার।"

সবাই হাসল, মিলি বলল—"ব্যবসার যুগই ত' এই—"

গাড়ী থামল। বিষ্ণুবাবুর বাড়ী। তিনি একজন কর্মচারী। একটা লুংগি পরে বিড়ি টানতে টানতে টহল দিচ্ছিলেন। তিনজনে চামড়ার থলি হাতে ঝুলিয়ে খটখট করে ঢুকে গেল ভিতরে;

এখান থেকে চাঁদা আদায় শুরু। কিছুক্ষণ পরে বিষ্ণুবাবুর ডাক পড়ল ভিতরে। তিনি গেলেন।

□

সংগঠন দরকার—সংগঠন।

সেজন্য সহযোগ প্রয়োজন; সকলে এক হয়, তবে ত'!

এত্তা জঞ্জাল! কত কাজ। ওঃ—

পথিক হাঁটছে পথে, পিচ করে পিক, ফচ করে পানের ছিবড়ে ফেলছে, গেরস্থবাড়ীর দোর খুলেই গিন্নি রাস্তার ওপরে ফেলছে জঞ্জাল, ঢ... নোংরা ফেন, পান্তার জল, সারা রাস্তা কি নোংরা, মাছি ভন্ ভন্ করে—ছিঃ।

কুলিধাওড়াগুলোও কী নোংরা, কদর্য! ভাঙ্গা দেওয়াল, অর্ধেক্ চাল উড়ে গেছে, তাপ্পীমারা চট্ ঝোলানো, বাঁশের চাঁচ, তালপাতা গুঁজে ফাঁক বোঁজানো। কোনরকমে কাজ চালানো আর কি! চারদিকে হরেক রকমের জঞ্জাল গাদা করা—কি নোংরা, কি দুর্গন্ধ! হাঁড়ির কাছেই হাগে, ছিঃ ছিঃ।

মানুষ এরা? বাচ্চাদের নাকের সিক্নি মুছতে কি গায়ে ঘাম বয়?— নিজের মাথাটা আঁচড়াতেও কষ্ট? মাথা ত' নয়, পোকামাকড়ের বাসা—দু ফোঁটা তেলও কি জোটে না? মাগীরা আরও নোংরা; ছেঁড়া কাপড়, মাথার চুলে খড়ি পড়ছে, গায়ে কয়েকপ্রস্থ ধুলোমাটি, নখগুলোও কালো কটকটে, আর রূপের যা ছিরি! ফেনভাত ক'রেও দুবেলা গিলতে সময় নেই না কি? তা নয়, অবেলায় খাওয়া, অস্বাস্থ্যকর খাদ্য, স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মের প্রতি উদাসীনতা। কাজেই, রোগ একজনের হ'লে, অন্যের ছোঁয়াচ লাগে। উঃ কী অবহেলা, এরা মানুষ না জানোয়ার?

আর দেশ, রাজ্য? এ সবের কথাও ধর না—এও ত' বদ্‌লাতে পারে, সুন্দর বাড়ীঘর, খোলামেলা জায়গা, আর নোংরা ঝোপ, বনের বদলে, ঝলমল করা বাগান, ফুলফল, হৃষ্টপুষ্ট মানুষ ও পশু—যেন লক্ষ্মীর সংসার।

কৈ তা? লোকে যেন ঘুমুতে ঘুমুতে চলছে, আগে না পিছনের দিকে সে খেয়ালও নেই। খুব বেশী ভাবনা চিন্তার কথা বল,

তা' শুধু অন্নচিন্তা ; চোখের ঠুলি খোলে না, যুগকল্পান্তপার হ'লেও কিছুই বদ্‌লায় না।

তা'ই সংগঠন চাই, অপরিহার্য—সহযোগ।

সরোজিনী ভাবে—খাঁচা থেকে বের হয়েই গাছের ডালে বসে চার-দিকে চোখের মণি ঘুরিয়ে ভাবছে যেন পাখীটি। সংগঠন-রাজ্যে এর আগে কখনও ঢোকে নি, নতুন প্রবেশ। ক্লাব ঘর চাই একটা—তা'র সঙ্গে নারীমঙ্গল সমিতি। একদিকে সংগঠনের কথা ভাবতে ভাবতে চোখে পড়ছে চারদিক ; সবদিকেই এত্তো জঞ্জাল—কত কী'র অভাব! সে সবে শুরু করেছে—তাই তার উৎসাহ বেশী—ভাবনায় প্রখরতা, চাঁদা চাইতে গেলে কিংবা প্রচারপত্র বিলোবার সময় কিংবা যে কোন কাজে এসব বিষয়ে দু'চারজনের সঙ্গে আধ ঘণ্টা সদালাপে নিজেকে মনে হয় বীরের মত, যেন সে কত বড় কাণ্ডই না করছে, উঁচু গলায় বিবৃতি ছাড়তে ইচ্ছে হয়, কি না করল সে ?

এই সংগঠনের কথা অনেকেই ভাবে, ভাবনার নানা দিক থেকে—

পিঠের ওপর খদ্দরের এক প্রকাণ্ড বোঁচকা নিয়ে কুঁজো হয়ে খালি পায়ে হেঁটে গ্রামগঞ্জে কে একজন রোদেবৃষ্টিতে ঘুরছে ; হাঁটু ঢাকে না এমন খাটো কাপড় পরনে, ঝরঝর করা ঘাম গায়েই শুকোচ্ছে, খাওয়া দাওয়া, শোওয়া বসার প্রতি নজর নেই ; খদ্দর বেচছে, চরকায় সুতা কাটার প্রচার চালাচ্ছে, গ্রামোদ্যোগের ভিত্ তৈরী করছে, প্রচার করছে অহিংসার বাণী ; ঘর সংসার ত্যাগ করেছে, রোগব্যাধি, কলেরা, বন্যার পরোয়া করে না ; সে এক ভাবের ভাবুক। নাম চায় না, ক্ষমতার লোভ নেই, খোঁজে না সুখ, শুধু চায় রামরাজ্য !

রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখতে দেখতে কোথায় কোন্ ধূ ধূ মাঠে সে তা'র ক'খানা হাড় ফেলে রেখে যাবে, ক'খানা মাত্র হাড় আর একটু দূরে একটা মাথার খুলি, চারদিকে ঘাস, গরু চরবে সেখানে।

সে তখন থাকবে না ; বেঁচে থাকবে তা'র মহা ভাব ; সেই মহা ভাব রক্তে মিশিয়ে তবুও লেগে থাকবে কত নীরব কর্মী, কাদায়—ধুলায়, কলেরা, বন্যার মধ্যেও ; মার, গালমন্দ, লাঠির ঘা, সব সয়ে। তাদের নাম নেই লেখা কোথাও ; তারা ত্যাগে ব্রাহ্মণ।

সরোজিনীও ভাবে, মিলিও ভাবে, প্রত্যেকে ভাবে নিজের নিজের মত।

ঢিলেঢালা পোষাকের নীচে হাতবোমা লুকিয়ে, পা টিপে টিপে, সন্তর্পণে চারিদিকে চেয়ে কেউ বা ঘোরে গোপনচারী; বোমা ছোঁড়ে, মানুষ মারে, গাড়ী ওল্টায়, লোকেদের কাঁদায়, সংসার চূর্ণ করে; সামনে তা'র হিংসা, ধোঁয়া, আগুন, রক্তের কোটালে নদী; বন্ধুর পথ তা'র, অশান্ত জীবন, অনিশ্চিত; চোরের মত লুকোতে হয়, কখনো কেষ্ট কখনো কষ্ট; পুরস্কার; গুলি কিংবা ফাঁসি কাঠ, কখন যে কি, তার নেই কোন ঠিকানা।

সেও ভাবে, দেখে স্বপ্ন।

দুনিয়ার চেহারা বদলাবার স্বপ্ন দেখে দরিদ্র চাষা। গাঁয়ের মন্দিরে, চাতালে লোকের সারিতে বসে পুরাণ, ভাগবতের পাঠ, আলোচনার মধ্যে সে স্বপ্ন দেখে। কল্কি অবতার—সে আর কতদিন? তারপর বারো হাত থাঁড়া, সিঁদুর মাখা স্বপ্নাদ্য কুমীর—যেমনটি লেখা আছে পুরাণে। কণ্ট্রোলের যুগে চা'ল হ'ল টাকায় দেড় সের, মন্বন্তরের সময় ত' আরো সস্তা ছিল! সত্য; ত্রেতা, দ্বাপর, কলি; কল্কি আর কত দূর?

বদ্‌লানো দুনিয়ার স্বপ্ন দেখে ব্যবসাদারও। নদীর স্রোতে লাগাম্ দিয়ে উৎপন্ন হবে বিদ্যুৎ, তা'র সঙ্গে আবার জলসেচও হবে। জঙ্গল উপ্‌ড়ে, মাটি খুঁড়ে ঢুঁড়ে ধাতুদ্রব্যের খনি বের হ'বে; যন্ত্র কাজ করবে, যন্ত্র চাষ করবে, যন্ত্রের উৎপাদন ছাড়া অভাব মিটবে না; অতএব—

উপায় বাতলায় দেবতার সেবাইত, মঙ্গলারতির সময় মঙ্গলকামনা করে— "সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া—।" পরিকল্পনা বিস্তৃত হয়, গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে যদি শান্তিযজ্ঞ হয়, তবে এ পাপ দূর হয়; পৃথিবীতে স্বর্গ প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় নামসংকীর্তন, যাগযজ্ঞ।

চোখ বুঁজে, হেলে দুলে ধ্যানের মধ্যে উপায় বের করে ভাবুক—এত দুঃখ! কেন? দুনিয়ায় কি খাবারের অভাব? বসুর আকর এই বসুধা। বণ্টনের ভুল, তাই এত অসাম্য, যত দুঃখ। ধনের দৌরাত্ম্য দূর করতে পারলে, বণ্টনের প্রণালী শুধরাতে পারলে, একদিনেই পৃথিবী বদ্‌লে যেত, কুৎসিত দারিদ্র্য আর ভীরু মন রইত না।

সংগঠন আর সহযোগ—একই আয়ুধ সকলের মনে। উপায় ভিন্ন, ভিন্ন।

সরোজিনীর উপায় ছিল—চাঁদার খাতা, যুক্তি ছিল বড় সহজ। সবাই যদি চাঁদা দিত, একবার নয়, নিয়মিতভাবে, তাহ'লে ফাণ্ড গড়া যেত—সেই ফাণ্ডের জোরে নারীমঙ্গলের কাজ এগিয়ে চলত ; আর কাজই বা কি ? তা কি পাথর ভাঙ্গা, না জাঁতা ঘোরানো ? দড়ি পাকানো ? তা-ও নয়। কেবল সবাই ক্লাব ঘরে একজোট হওয়া। একত্র হ'লেই দেখাদেখিতে শেখাশিখি, আর শেখাশিখিতেই সভ্যতা ! কেমন করে কাপড় পরবে, কি করে রুচিবতী হ'বে, পরিচ্ছন্ন থাকতে হয় কিভাবে, ছুঁচের কাজ, ক্রোচের কাজ, সেলাই বোনা ইত্যাদি। ঘর সাজানো থেকে নিজে সাজা অবধি ! সঙ্গীত ও নৃত্যকলা—বাড়ী বাড়ী সে সবের চর্চা উঠে গিয়ে বাড়ী-ঘর হয়ে গেছে রসকষহীন, বিরস। ওসবে মনে ফূর্তি আসে, বাড়ীতে আনন্দ থাকে, মন প্রফুল্ল থাকলে দেহেও স্বাস্থ্য থাকে ; কারণ, দেহে মনে সম্বন্ধ নিরবচ্ছিন্ন। মন ও দেহ তাজা রাখ, বাড়ী ঘর তাজা থাকবে। স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয় আলোচনা হবে। কি খেলে গায়ে জোর বাড়ে, কি করলে রোগ চড়াও হয় না। বস্তির সকলে যদি মশারি ব্যবহার করে, গরম জল ব্যবহার করে, তবে কি তাদের এত ম্যালেরিয়া হয় ? নিয়মিত ভাবে প্রত্যেকে যদি ডাক্তার দিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করায়, তবে কি ব্যারাম বাড়তে পারে ? সাধারণ জ্ঞানের চর্চা, দেশবিদেশ সম্বন্ধে আলোচনা ইত্যাদি—মোদ্দা কথা—নারীমঙ্গল ; নারী জাতির মঙ্গল হলে দেশের মঙ্গল নিজে নিজেই হয় ; কারণ, তা'রা ঘরণী, তারা ভবিষ্যতের মা, তা'দেরই কোলে আছে আগামী যুগ। ছোট ক্লাব থেকে শুরু করে এ যোজনা ছড়িয়ে পড়ত সারা দেশে। তার জন্য চাই চাঁদা। জন পিছু এক টাকা দিলেও উপকার হয় কোটি লোকের।

তাই শুধু চাঁদা দিয়ে যান।

তা'র নতুন উদ্যমে সে 'অসম্ভব' বলে কোনও কথা কানে তুলতে রাজী নয়।

তাই, সব শোনার পর বলিদত্ত যখন বলল শুধু "হুঁ", সরোজিনী রেগে লাল হয়ে, চুপ মেরে, একমুখো সোজা অন্দরে ঢুকে গেল দুম্‌দাম্‌ শব্দে। যত সে ভাবছে যে নিজের দিকেই ন্যায় আর অন্যদিকে অন্যায় ততই তা'র উত্তেজনা ধোঁয়াচ্ছে ; বলিদত্তর-অপদার্থতা ছাড়া আর কিছু তা'র নজরে পড়ছে না ; জুতো দু'টো খুলে আছড়ে ফেলার সময়, রিষ্টওয়াচটা হাত থেকে খুলতে গিয়ে

প্রায় টেনে, মাটিতে গড়িয়ে ফেলার সময়, কাপড় বদ্‌লানোর সময়, সেই এক চিন্তা, লোকটা তা'র করুণার পাত্র হওয়ারও অধম।

চুপচাপ বসে থাকে সে। বলিদত্ত কাছে আসে, বলে—

"ভারী গম্ভীরভাবে বসে যে, সরোজ?"

"বুঝলে, যে ভাবে, সে গম্ভীর; যে না ভাবে, সে বুঝতে পারবে না—"

"ওঃ, তুমি ভাবছ তা'হলে; ভাব।"

সরোজিনী চুপ।

"কি এত ভাবছ, বল ত'?"

"বললেও তুমি বুঝতে পারবে না।"

বলিদত্ত তা'র মুখের পানে তাকাল, হঠাৎ মুখ নীচু করে বলল—"কি, ছেলেপুলে? ও হল ভগবানের হাত। গরীবের বাড়ী, যেখানে খুদকুঁড়ো নেই, সেখানে জোড়া জোড়া ছেলেমেয়ে। যেখানে খাওয়ার আছে, সেখানে নেই। না—অনেক দিন থেকে লক্ষ্য করছি তুমি ভেবে ভেবে কাহিল। ভাবনা কিসের? ভাগ্যে যা আছে, হবে।"

কিন্তু উলটো বুঝলি রাম; ঝড় ঝঞ্ঝায় দুলতে দুলতে যেন, কেঁপে কেঁপে, শিউরে, সরোজিনী বেসামালভাবে উঠে চলে গেল। বলিদত্ত হারবার পাত্রই নয়, বেহেডের মত সে চেঁচিয়ে বলল "ওগো, শোন, লজ্জা পেলে নাকি? পেটে খিদে, মুখে লাজ? কিন্তু কাচ্চাবাচ্চা হ'লে আর চেহারা বজায় থাকবে না, এমন ছেলেমানুষী মন থাকবে না, জেনে রাখ। যখন হবার, তখন হবে; সে অবধি ছটফট করো।"

সরোজিনী ঘুরে দাঁড়াল, বলল "তুমি কি বুঝলে, বল ত' আমায় একটু?"

"সবই বুঝলাম।"

"না, যা আমি বললাম? তোমার দরদের ছিটেফোঁটাও নেই। তুমি মানুষ ত'?"

"তা' তুমি জানো। যেতে দাও, কি করতে হ'বে বল ত' একটু? খোঁটা পোঁতা, না চাঁদোয়া টাঙানো, না আলো জ্বালানো, সব আমি ঠিক করে দেব। চাঁদার খাতাটা আমায় দিয়ে ফেল, চাঁদারও উপকার হ'বে। তারপর 'পিদিম উজ্জ্বল ত' সবই উজ্জ্বল'; সব বিষয়ে আমার সহানুভূতি আছে। কোন্‌টাতে নেই?"

"রাখ তোমার সহানুভূতি, যা'র মত আমাদের মতের সঙ্গে মেলে

না।" কথাটার জের টেনে বলিদত্ত বলল—"তা'র সঙ্গ আমরা ছাড়ি—এই বলবে ত'? ওঃ, সরোজ! মতের জন্য তুমি লড়াই করতে পেরে গেছ—তুমি ত' একদম আধুনিকা। এই দেখ, কাল সকালে তোমার অ আ ক খ শুরু করিয়েছিলাম, আজ তুমি উঠে গেছ এত উঁচুতে; লোকে সত্যিই বলে 'মানবী বেড়ে হয় দানবী' —আশ্চর্য!"

এত চটেও সরোজিনী হেসে ফেলল, বলল—"তুমি অদ্ভুত খোসামুদে"।

"শুরুতেই বুঝিয়েছিলাম—বশীকরণ করতে হয় মুখ দিয়ে।"

"এত বশীকরণে হবে কি? তুমি ত' আমাদের পথে বিশ্বাস কর না।"

"চাঁদা তুলে জগৎ উদ্ধার করার পথ ত'? খুব বিশ্বাস করি। তুমি চাঁদা তোল, সভা-সমিতি কর, নাম হ'বে আমার। 'অমুকের স্বামী কে? ওই যে ওখানে ওই যে উনি চলেছেন'। মারে সেপাই, জেতে সর্দার। খালি একটা চাঁদার খাতা আমায় দাও। দেখ, আমি কি করতে পারি।"

"তুমি একটি সাক্ষাৎ—"

"অজ—ঠিক্ বলেছ। বুদ্ধিমান লোকমাত্রেই বাইরে দেখায় নিজেকে, যেন অজ সেরা; কিন্তু মনে রেখ—সকলে আগে ভাগে হেসে নেতিয়ে পড়ে, সে হাসে শেষে—ভুলো না কথাটা।"

সরোজিনী পাশের ঘরে চলে গেল। বলিদত্ত তা'র পিছনে চেয়ে —তা'র আনন্দ ধরে না—মনে হয়, কি অবাক্ কাণ্ড! কথায় কথায় তাজ্জব বানায় সরোজিনী, পদে পদে প্রমাণ দেয় মার্জিত মনের। যে না জানে, সে ভাববে—বি.এ. এম.এ. পাশ বোধ হয়, আর কী তাড়াতাড়ি সে বদলেছে! যার গুণ যেমন, আর কি! অতি ছোট বটের বীচির মধ্যে থাকে প্রকাণ্ড মহীরুহ। দুনিয়াটা আশ্চর্য; সবই আশ্চর্য। সব চেয়ে বড় আশ্চর্য তা'র স্ত্রী।

ও' ঘরে সরোজিনী।

সে ভাবছিল একটিই কথা, বলিদত্ত কি ভেবে এসব বলছে? শেষে সে হাসেও আজকাল। কেন? তবে কি সে কিছু শুনেছে? জানে নাকি কিছু?

ফাঁকা দৃষ্টি, বাইরের দিকে মুখ, নিজের মনের গভীরে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি নারী; তা'র কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম,

ঠোঁটের বাঁক অস্বাভাবিক।

□

সন্দেহ আসে, সন্দেহ যায়; আকাশে লেগে থাকে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ আর হু হু হাওয়ার চিরকালের খেলা।

হাওয়া, তা' যেন কামনার উগ্রতা; নিজের খেয়ালে নিজেই ওড়ে, সোঁ সোঁ গর্জায়, আপনিই আপন সত্তা হারায়, প্রতিবন্ধক তা'র পক্ষে খেলনা।

সরোজিনী তা'র হাওয়াই দুনিয়ায় হাওয়ার রূপ ধরেছিল।

বলিদত্তর বাসা তা'র কাছে অন্ধকার গুহা, সেখানে নেই তা'র বেগ, শুধু অলস হয়ে ঝুলতে হয়, বহিপ্র্কাশ বা আউটিংএর জন্য প্রতীক্ষা করা; একবার বেরোলে সে দেখায় তা'র বেগ, তারপর সে হাওয়া।

□

অবশেষে শুভদিন। নারীসমিতির উদ্‌ঘাটন রজনী।

নিমন্ত্রিত ও নিমন্ত্রিতা অনেকে, প্রধান অতিথি কোম্পানীর বড়-সায়েব—মিষ্টার শর্মা।

ওঁরা সবাই আসবেন; উদ্যোগীদের উৎসাহ উপ্‌ছে পড়ছে, আশা উত্তাল। আজকের রাত নিশ্চয় স্মরণীয়, ঐতিহাসিক বলা চলে।

দলে দলে লোক—'নারী' নামটাই যথেষ্ট তাদের টান্‌তে। কিছু বিশেষ ঘটবে না কি? এ হেন প্রতীক্ষা পুরুষের প্রকৃতি।

পান, বিড়ি, সিগারেট মুঠো মুঠো; লাঠি, খালি হাত, টর্চ; ধুতি, স্যুট্; পায়ে হেঁটে, মোটরে; সস্ত্রীক, আইবুড়ো; হেদানো, চুপসে-যাওয়া; টিকিটসহ, বিনাটিকিটে; নিমন্ত্রিত, রবাহুত, অনাহুত। দলে দলে।

উদ্‌ঘাটন রজনী, মনে নারী, আদিম আকর্ষণ, আদিম অভাব। হাজার চাখ্‌লেও মন ভরে না। কেষ্ট ঠাকুরও নাকি তাই কেলে কুকুর বনেছিলেন।

তেম্‌নি ফেরে ঠাকুরের সন্তান, মানুষ!

উদ্বোধন রজনী, দরজা খুলবে, পর্দা উঠবে, প্রতীক্ষার পর—

বিস্ময়, শুধু বিস্ময়।

মনে মনে নারী, মুখে বাজে কথা। বৃদ্ধ খোবা খাঁ মিট মিট করে পর্দার পানে তাকিয়ে, চশমা তুলছেন কপালে, আবার নামাচ্ছেন, গম্ভীরভাবে কাছে দাঁড়ানো একজন অধস্তনকে ধমকালেন, "কি হে, দীনবন্ধু! কত কি বলেছিলে না? কি করলে? কিস্সু হবে না তোমাকে দিয়ে; দাঁড়াও, দিচ্ছি ঠাণ্ডা করে।" পায়ের ওপর পা তুলে বসলেন; বুড়ো হাড়ে আরাম লাগে এতে, গায়ে জোর পান। পর্দার দিকে চোখ আর মনোযোগ, গালমন্দের কথাগুলো গুলিয়ে যাচ্ছে—"হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম?"

মাগ্না-পাওয়া পান গোটা তিনচার গালে ঠেসে ছোকরা দীনবন্ধু গালমন্দ হজম করল মনের রাগ মনেই চেপে; এ হ'ল কুখ্যাত খোবা খাঁ; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গালমন্দের সঙ্গে চোখ দিয়ে তাই গিলছে পর্দাটাকে দীনবন্ধু; আর কিই বা করতে পারে সে বেচারা? এক পায়ে ভর রেখে অন্য পা'টা নাচাচ্ছে সে আর ভাবছে—"খোবা খাঁ ত' চিরকাল বাঁচবে না, এ গালাগালিরও তাই শেষ আছে।"

পাতলা চেহারার অগনি রাউত মুখ গোঁজ করে প্রচুর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছেন, বাজারদর সম্বন্ধে ছোটখাট অর্থনৈতিক একটা বক্তৃতা ফেঁদেছেন—চোখমুখ কিন্তু পর্দার দিকে ফেরানো।

বিশালবপু শ্যামবাবুর ভারী গরম লাগছে—তিনি পায়চারী করছেন এধারে ওধারে—বলে বেড়াচ্ছেন যে, তাঁর খিদে চেগেছে।

কোথাও কোথাও চাকরীর আলোচনা চলছে, সেই রোজকার ধান্দা, সুখ দুঃখের কথা। এক জায়গায়, তুমুল কুৎসা-কাহিনী; পাঁচজনে শুনছে মাথা নীচু করে, কখনও কখনও ঘুরে ফিরে চাইছে এদিক ওদিক।

আলোয় ঝলমল, কাগজের ফুল, কাগজের মালা ফড়্ ফড়্ করে উড়ছে; পর্দা কাঁপছে, উঠছে না কিন্তু, চেয়ার সব ভর্তি।

কিছুক্ষণ পরে চাঞ্চল্য "সায়েব আসছেন, সায়েব", হঠাৎ সকলকে ঝাঁকি দিল দানাপানির চেতনা—সায়েব, সে যে কোম্পানীর অফিসার—হর্তাকর্তা, সকল আশার আধার, সমস্ত ভয়েরও।

ফূর্তির ভূত ফুরিয়ে গেল; সকলে এখন কাজের লোক, দলে দলে কাজে যাওয়া, ভয়ে ভয়ে ঘাড় কাৎ করে কাজে সেঁটে থাকা, ফের —গরুরা গোঠ থেকে ফেরাব সময়—দলে দলে বাড়ী ফেরা। হঠাৎ

যেন কে হন্তদন্ত হয়ে—হুঁশিয়ার করল, সবাই খুট খাট উঠে দাঁড়াল। সায়েবের কাছাকাছি দাঁড়াবার মত যাদের অধিকার আছে, সেই সব কর্তাব্যক্তিরা হাঁসফাঁস করে প্রবেশ পথের দিকে ছুটলেন। 'সায়েব', 'সায়েব' মুখে বিড়বিড় করতে করতে দৌড়লেন খোবা খাঁ; বোতাম খুলে যাচ্ছে, ঢ্যাপসা শরীরে ঝাড়মুছ করলেন হাত বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে হু'বার, প্রবেশ পথের কাছাকাছি। প্যারেড-এ যাচ্ছে যেন হাবিলদার, বীরের মত এগোলেন শ্যামবাবু; সরু সরু ঠ্যাং চটপট নাড়তে নাড়তে হরিণের মত ছুটলেন—অগনি রাউত; তাঁর গতিতে লালিত্য। বলিদত্ত দাস আগেই যথাস্থানে—দরজার মাথা আগলে, বুদ্ধি খরচ করে আগেই সে সাধারণ লোকেদের ঠেলা-ঠেলি এড়িয়েছে। জাপ্টাজাপ্টি, ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেল, সামনে কর্তাদের, পিছনে দল বেঁধে ঠেলে আসা অধস্তনদের, তাদের চাপ অব্যাহত, কিন্তু তাড়া নেই। কনুয়ে কনুয়ে ঠোকাঠুকি, পায়ের ওপর পা থেঁতলানো, পরের কাঁধের ওপর হুমড়ি খেয়ে, বুড়ো আঙুলে ভর রেখে দাঁড়িয়ে নিজের ঘাড় উঁচুতে তোলার প্রয়াস; ভীড় বাড়ছে 'সায়েব, সায়েব'।

প্রাঙ্গণের প্রবেশপথে সারি দিয়ে দাঁড়ানো সংগঠিকারা—সর্বাগ্রে সরোজিনী। সায়েবের মোটর প্রচণ্ড আওয়াজ করে, উজ্জ্বল আলোয় এগিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। তা'র পিছনে রণজিৎ বাবুর মোটর, তারপরে অন্যান্যদের—যেন রোশনাই। মোটরের চোখ ঝলসানো আলোয় উদ্ভাসিত সরোজিনী—সত্যি যেন সমুদ্রের নীল জল থেকে উঠে আসছে তা'র দেহ, পাশে মিলি, নিলি, বিন্দু, আরও অনেকে—সুঠাম সৌন্দর্যের প্রদর্শনী। সরোজিনীর হাতে মোটা ফুলের মালা; তা' অস্থির, দুলছে এধার ওধার, যেন শর্মার গলায় সাপের মত বেড়ে ধরতে অতি ব্যগ্র সে মালা। মালার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সরোজিনী হাসছে মৃদু মৃদু।

মোটর থামল। প্রবেশপথে ছোট একটা ভীড়; কর্তারা সেলাম করবেন। সায়েব নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ আর উলুধ্বনি। সেই শব্দের মধ্যে বুক ফুলিয়ে শর্মা এগোলেন পা পা করে; রণজিৎ বাবু পাশ থেকে হাসিমুখে বুঝিয়ে দিলেন—"এ আমাদের ভারতীয় প্রথায় অভ্যর্থনা, এ অঞ্চলে প্রচলিত।"

"অতি সুন্দর" শর্মা বললেন—চোখের সামনে রূপের লহর—সামনে

সরোজিনী। নমস্কার বিনিময়ের পর মাল্যদান করবে সে, তারপরে মিলি, নিলি, বিন্দু। সায়েবের পিছনে থেকে রণজিৎবাবু মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের ইশারা করলেন—সায়েব ঘাড় নীচু করলেন। সরোজিনী মন্ত্রমুগ্ধের মত ঝুলিয়ে দিল ফুলহার—সায়েবের দুই হাত সামনে লম্বা হ'ল, আবার তিনি সহজ হ'লেন, চেয়ে দেখলেন সরোজিনীকে—সরোজিনীর বুকে তখন দুরমুস্ পড়ছে ; কত কী কেঁদে রেখেছিল, কিছুই বলতে পারল না। অন্যমনস্কভাবে অবচেতনায় শর্মার মনে হ'ল পাশে থেকে কে বলছে কিছু যেন ; মুখ তুলে দেখলেন খুদে বলিদত্ত দাস আস্তেব্যস্তে সরোজিনীর দিকে হাত দেখিয়ে বলছে—"মাই ওয়াইফ, মাই ওয়াইফ!"

অবস্থা শুধরাবার জন্য রণজিৎবাবু তাড়াতাড়ি আউড়ে গেলেন—সকলের পরিচয়। গলা থেকে ঝোলানো মালাটিকে আস্তে আস্তে হাত বোলাতে বোলাতে সায়েবী ঢঙে শর্মা সায়েব বললেন—

"আপনাদের অজস্র ধন্যবাদ, ভারী আপ্যায়িত হলাম।"

সায়েবকে নিয়ে যাওয়া হ'ল সভামণ্ডপে। কার্যসূচী শুরু হ'ল।

□

বন্ধুরা অভিনন্দন জানিয়ে গেল—পথে ঘাটে দেখা হলে "মিষ্টার দাস, আপনি ভাগ্যবান"।

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন রণজিৎবাবু—"আমার হয়ে আমার অভিনন্দনটা বাড়ীতে জানিয়ে দেবেন দয়া করে। নিশ্চয়ই জানতে চান—আমি নিজে গিয়ে জানাচ্ছি না কেন? তার কারণ, আমি কাউকে তার মুখোমুখি প্রশংসা করতে পারি না, এটা আমার দুর্বলতা।"

অধস্তনেরা, ছোট কর্মচারী, কেরানীবাবু—দেখা হলেই তারা সবাই হেসে হেসে যেন কিছু বলতে চায় বলিদত্তকে ; দূর থেকে তার দিকে তাকিয়ে, ইসারা করে কথাবার্তা করে নিজেদের মধ্যে, হাসাহাসিও করে। বলিদত্ত ভাবে, কি তারা বলাবলি করে? নির্ঘাত সরোজিনীর উদ্যমের প্রশংসা বিষয়ে। সরোজিনীর গড়া 'সমাজ', সে রাতের উদ্যোগ আয়োজন—একটা বড় ধরনের কথা

হয়ে পড়েছে ; তাই ছোটখাটোরাও বোধ হয় ব্যগ্র তার সঙ্গে কথাবার্তায়, ঐ প্রসঙ্গ পেড়ে দু'চারটে তারিফের কথা শোনাতে। এ বিষয়ে সে রাশ টানে, কঠিন হয়, প্রশ্রয় দেয় না ; ভাবে, ছোটদের যদি আস্কারা দেওয়া হয় তার সামনে মুখোমুখি প্রশংসা জানাতে তবে কোম্পানীর কাজে শৃঙ্খলা ভাঙ্গবে।

তার পরের দিন সায়েবের ষ্টেনো এসেছিলেন ; তিনি একজন দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোক, কথা গোপন রাখতে ওস্তাদ্, যদিও শুধু হাসতে থাকেন কেউ কিছু জানতে চাইলে। তাঁর পেট থেকে কথা বের করা দুঃসাধ্য। তবুও ভদ্রলোক গায়ে পড়ে জানালেন, অবশ্য ফিসফিস করে—"সায়েব খুব ইম্প্রেসড।"

মানুষ আর বেশী কি চায় ?

এই ত' চাকুরের স্বর্গ !

কিন্তু এ স্বর্গের আনন্দ সরোজিনীর সঙ্গে মন খুলে আলোচনা করার সুবিধা মেলে নি। সে রাতের পর সে দেখছে—সরোজিনীর মুখ গম্ভীর, চিন্তাশীল। কিছু একটা ভাবছে সে। বুঝুক সে—দায়িত্ব কেবল গৌরবটীকা নয়, দায়িত্ব আনে চিন্তার কালো বোঝা। আগে কী তর্কই না করত—ঘরকন্নার দায়িত্বের ভারী বোঝা, কুটনো কোটার দায়িত্ব, উনুন ধরানোর দায়িত্ব, হেঁসেলের দায়িত্ব। সদর্পে বলত "আমাদের কাজ একদণ্ডও সামলাতে পারবে ? চাল কি করে ভাত হয় জানো ? পুরুষ মানুষ, কি বুঝবে আমাদের কথা ? উনুন নিয়ে ঠাট্টা কর ; ভেবেচ কখনও উনুন ধরলে ঘরটা কেমন হেসে ওঠে ? উনুন না জ্বললে দুনিয়া ঠাণ্ডা ; এ হচ্ছে অগ্নিদেবতা। এর মাহাত্ম্য কি বুঝবে তোমরা পুরুষ জাত ? এ আগুন নেই পুরুষ জাতের কাছে, আছে স্ত্রী জাতির হাতে।" "ঠিক কথা, তোমাদের আগুনটা গা' থেকেই জানা যায়, হেঃ, হেঃ, হেঃ। স্ত্রীজাতি অগ্নি, না ? শাস্ত্র কি বলে, জানো ? ওঁদের কাছে আগুন আছে, কিন্তু সে আগুনে বীচি থেকে চারা গজায়নি। তা' কতদিনই বা হ'ল ? ভাগ্যে থাকলে সময়ে হবে।" যা হোক হেঁসেলের অহমিকা কাটিয়ে সে বুঝছে এখন, প্রকৃত দায়িত্ব কি ! তাই তার ভাবনা বেড়েছে। হয়ত নতুন কোন পরিকল্পনা ফাঁদছে। তার গম্ভীরভাবও বলিদত্তর পক্ষে অভিনন্দন।

দুনিয়া হেসে উঠছে, বলছে "বলিদত্ত, তুমি ভাগ্যবান।"

মনের ভিতর এই প্রবল আনন্দের মধ্যে চেতনায় একটা নতুন

আলো জ্বলে। সে আলোয় সাধারণ কথা ঝল্‌সে ওঠে, বলিদত্ত সযত্নে নজর করে—যা আগে কখনও দেখেনি। বাগানের ফুল—কী সুন্দর; বাসায় দাঁড়িয়ে দিগন্তে চোখ মেলে জমির ঢেউ কী সুন্দর দেখায়, কী শোভা; কুয়োর কাছে ঘাস বেড়েছে, ভিজে ঘাসে তেজী রোদ্দুর কি ছল্‌ছলে সবুজ দেখাচ্ছে, তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। বেড়ার ওপাশে ও কার বলদ? কি উঁচু, কি মোটা, গা' কি মসৃণ, কথায় যে বলে, 'মাছি পিছলে পড়বে' ঠিক তা-ই। আনন্দে মন উদারতা থেকে দয়া করতেও রাজী—"ভিখারীটা কতক্ষণ হল চেঁচাচ্ছে, এক মুঠো এনে দে না, হর্ষা!"

দু'দিন বাদে; সকালে চা খাওয়ার সময় যখন খবরের কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে তাজা খবরও গিলছিল চা'র সঙ্গে, হঠাৎ নজর পড়ল একটা খবর, চিৎকার করল বলিদত্ত "সরোজ, সরোজ—দেখ এসে কি বেরিয়েছে।"

আরাম চেয়ারের হাতের ওপর গা এলিয়ে বসে সরোজিনীও তা পড়ল; মুখে চা কাপ উঁচিয়ে ধরে হেলান দিয়ে তাকিয়ে থেকে বলিদত্ত উত্তেজিত হয়ে বলে যাচ্ছিল "এই দেখ, এই দেখ—'জ' এর হ্রস্ব ই-কারটা ছাপায় ওঠেনি, 'সরোজিনী' বানান ছাড়া—বাকী সব ঠিক আছে। তোমার জন্যই আমার নামটাও খবর কাগজে বের হল, সরোজ! চমৎকার লিখেছে—ঠিক ঠিক সব।"

"এমন কত খবরই ত' বেরোয়, কত আকুলি-বিকুলি, ষাঁড়বুড়ীদের নাম সুদ্ধ। তবে তুমি এমন করছ কেন? খবরের কাগজে নাম বেরোনয় আছে কি? বেরিয়েছে, ত' বেরিয়েছে—"

"আর, বড়সায়েবের নামও; আসলে উদ্যোগ ত' তাঁরই। তিনি না থাকলে কিছু হত নাকি? কে-ই বা জিজ্ঞেস করত? সব দেশেই ধর্ম রাজাশ্রিত যে; রাজার আদর বা উৎসাহ না থাকলে কিছুই হয় না। "বিনাশ্রয়ে ন বর্তন্তে কবিতা বনিতা লতা।"

সরোজিনী রাগের অভিনয় করে বললে—"যা খুশী কি যে যা তা বকে যাচ্ছ। কে রাজা? সে রাজার সামিল কোন্ বনিতা লতা? হায় রে, কপাল; কি হয়েছে যে তুমি এমন করছ?"

বলিদত্ত বিজ্ঞ, গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে বলল—"শোন সরোজ, তুমি জান না। এ একদম ঐতিহাসিক ঘটনা। খবর কাগজের প্রশংসা—সামান্য ভাবছ? এ একজনের মুখের কথা নয়, এ হল দেশের রায়। এ সম্মান এটুকু পাবার জন্য লোকে কত না

খরচ করে, কত না ত্যাগ করে! আমাদের এসেছে এ সম্মান আপনা আপনি। ভেবে দেখ ত'; আজ কত লোকে এটা না পড়ছে! 'বলিদত্ত দাস—সরোজিনী দাস'—কেমন তারা? লোকে ভাবতে থাকবে; এক জায়গায় নয়, সর্বত্র। ওড়িয়া থেকে তর্জমা করে বিদেশী ভাষায়, বিলেতেও এখবর বের হয়ে থাকতে পারে—তামাম দুনিয়ার চারদিকে, আমেরিকার লোক, আফ্রিকার লোক ভাবছে—কেমন এরা দু'জন? কিরকম মানুষ? বুঝেছ সরোজ, এত সস্তা বলে খবরের কাগজকে মনে কোর না।"

"না, সস্তা নয়, মাগ্‌গী; তোমার যা কথা! চার পয়সার খবরের কাগজ—তা' আবার সস্তা নয়। একবার পড়ে ফেললেই, তা বাঁধাছাঁদা, মোছামুছির কাজে লাগে, নয়ত উনুন ধরাতে। এতেই বলছ, লোকে মনে রাখবে। তোমার এক পাগলের কথা—।"

"তুমি দেখো—"

□

কিন্তু দেখল সে নিজে; স্বপ্নের স্মৃতি জাগরণে মণ্ডিত হয়ে, আধ-ঘুম আধ-জাগরণের মধ্যে মেশামিশি, একটা ঝাঁঝালো চেতনার ভিতর দেখল—সেই প্রকাণ্ড মোটর গাড়ীটা। একবার দেখলেই তা' চির চেনা হয়ে যায়। সেটা ছুটেছে তারই ফটকের দিকে সরাসরি; খালি ছোটেই নি, গাড়ী থামল এবং নেমে দাঁড়িয়ে পড়লেন বড় সায়েব মিষ্টার শর্মা। ওই ত', রাস্তায় যারা যাচ্ছিল তারা দূরে যে যেখানে সে সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে—তাদের মুখ গম্ভীর। পড়্‌শীরা ছুটে আসছে, সেলাম লাগাতে। শর্মা এই দিকেই হাত দেখাচ্ছেন, তারা মাথা হেলাচ্ছে। উনি ত' এখুনি এসে পড়বেন, সে কি করে?

"সরোজ, সরোজ—" ভিতরে ঢুকেই পাগলের মত এ ঘর থেকে ওঘর সে চষে বেড়ায়; এখান থেকে কামিজটা টেনে নিয়ে তাকিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দেয়—এটা ময়লা। ওখান থেকে মোজাজোড়া তুলে শুঁকে, ফেলে দেয়। উঠোনে দড়িতে কাপড় শুকোচ্ছিল; তা' তুলে জমা করে এক কোণে লুকোয়; অন্দরের রোয়াকে নোংরা জমেছে মনে হতেই ঝাঁটা দিয়ে ঝাড়তে লাগে, আবার লাফিয়ে এসে

চেঁচায় "সরোজ, আমার প্যাণ্ট্, আমার কামিজ্—" ফের "হর্ষা, হর্ষা—নিতা"—; চেয়ারটা এখান থেকে তুলে ওখানে রাখে। মনে পড়ে, চুল আঁচড়ায় নি; আরসির কাছে লাফিয়ে যেতেই 'যাঃ, কামানো হয় নি।' করে কি? মুখ ঘামে সট্‌সটে। প্যাণ্ট্‌টা পায়ের দিক থেকে খানিকটা তুলে মনে পড়ে—ভিতরে কিছু পরে নি।

স্নানঘর থেকে বেরিয়ে সরোজিনী বলল "ব্যাপার কি?"

"সায়েব, সায়েব; আমার জামাকাপড় কৈ?" আলমারি খুলে সরোজিনী পোষাক এনে রাখল। চট্‌পট্ সাজ গোজ করতেই নিতা এসে বলল—"সায়েব এসেছেন, বড়সায়েব নিজে; হুজুরকে খুঁজছেন, বাইরে পায়চারী করছেন।" "আরে, বসতে চেয়ার দিস্ নি, ইডিয়ট্!" নিতা বলল "বসতে নারাজ, হুজুর, বাগান দেখছেন।" অনেকবার উঃ আঃ করে বলিদত্ত তৈরী হল। প্যাণ্টের কোমর কষা হয় নি, কামিজের খানিকটা পিঠের দিকে ফোলা ফোলা, দোমড়ানো 'কলার'-এর নীচে এক পেশে 'টাই'-এর ফাঁসটা শুয়ে রয়েছে যেন বার্ধক্যে, তার ওপর কোট্; তবুও সে প্রাণপণে প্রস্তুত হচ্ছে। সরোজিনী এসে বলল "গেলে না যে, পাগ্‌ড়ী বাঁধতে বাঁধতে কাছারী খতম্।" সপাং করে কে যেন একটা চাবুকের ঘা মারল। সেই মুহূর্তে সে ছুটল বাইরের দিকে—যেতে যেতে মনে পড়ল যে, জুতোর ফিতেয় গিঁট্ নেই, কোটের বোতাম উল্‌টো পাল্‌টা লাগানো, হাতে নেই ঘড়ি। বোতাম লাগাতে লাগাতে, পায়ের পাঞ্জা বড় করতে করতে, ফোলা ফোলা জুতোকে আয়ত্ত করার চেষ্টা চালিয়ে সে বাইরে পা দিল। মন ভর্তি—উঃ, আঃ, অশান্তি; কাজের মাঝখান থেকে উঠে এসেছে; যেন শুচি হতে পারে নি শুভ সময়ে, লগ্ন পার হল বুঝি, সময় নেই। শর্মা ততক্ষণে জুতোর আগায় একটা বেগুন গাছের গোড়া খুঁচিয়ে কি যেন দেখছেন। আগ্রহের আতিশয্যে পিছন থেকে বলিদত্ত চেঁচাল—"গুড্ মর্নিং স্যার; ব্রিঞ্জাল্‌স্ স্যার—"

অবাক হয়ে ঘুরে পড়ে শর্মা সায়েব তাকে দেখলেন। নিজের অজান্তে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল "গুড্ মর্নিং", তবুও চেয়ে আছেন তার পানে। বলিদত্ত সোৎসাহে বলে যাচ্ছে, যেন গড়্‌গড়্ করে রিপোর্ট পড়ছে— "ঐ হল মুক্তকেশী বেগুন, দেদার ফলে; গোড়া খুঁড়ে এতে সরষের খোল—সে খোল যত পচা হবে তত ভাল—

গোবর সার—"

হাসতে হাসতে তার কাছে এসে, তার কাঁধ চাপ্‌ড়ে শর্মা বললেন—"এক্‌সেলেণ্ট, আপনি বিচক্ষণ। তারপর, আপনার স্ত্রী কোথায়?"

□

ভেলকি লাগার মত বলিদত্ত দূরে তাকায়—বাসার ফটক খোলা পড়ে রয়েছে; মোটর নেই কেউ নেই। যত তার মনে পড়ে, ততবারই চোখের সামনে ভাসে—ওই যেন মোটরটা চলে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে ছোট হতে হতে দূরে মিলিয়ে গেল। ফের দেখে আগের দৃশ্য, সরোজিনী জামাকাপড় পরে চামড়ার থলি হাতে গাড়ীতে উঠছে। তার পর নিশ্চয় আলোচনা চলছে, সরোজিনী তার পরিকল্পনার কথা পেড়েছে, সে বিষয়ে কথাবার্তা নিশ্চয়, সেই 'সমাজ' সম্বন্ধে সর্বদা তৈরী, সব ব্যাপারে অভ্যস্ত; শঙ্কা নেই, নেই সংকোচ, কোন কিছুতেই পিছ্ পা নয়। যখন শর্মা বললেন "চলুন মিসেস দাস, আপনার 'সমাজে'র হালচাল একটু দেখে আসি", কি চটপট্ সে তৈরী হয়ে এসে গাড়ীতে উঠল!

সে উন্নত হয়েছে, সম্মানিতাও। এর পর সিঁড়ি চড়া হবে সহজ, নিজে নিজেই তা' হবে নিশ্চয়।

তবুও, পুরনো সংস্কার যেন পিছু টানছে; মন উদাস, চিন্তায় খটকা, সব ভাবনা এগোতে এগোতে ধাক্কা খাচ্ছে কোন্ দেওয়ালের গায়ে। সন্দেহ হয়—এ সুখ, না দুঃখ? কখনো কখনো বাঁ দিকের ঘাড় বেয়ে মাথার পিছন দিকে ওপরে ওঠে যেন আগুনের স্রোতের ধারা, উঠছে সাতপাঁচ, বিচার, ভবিষ্যৎ আশার স্বপ্ন, দানাপানি, ইমারতের স্বপ্ন। মুখ সামান্য হাঁ করে সে খোলা ফটক দিয়ে দেখছে দূরের পানে। সম্বিৎ ফিরে পেল, যখন কানে গেল ফটকের কঁ্যা কঁ্যা শব্দ; দেখল নিতা ফটক বন্ধ করছে।

নিতা'র ওপর গরম হয়ে বড় কর্তার ঢঙ্গে বলিদত্ত গালি দিল—"রাস্কেল, সব ব্যাপারে ঢিলেঢালা, ফটকটা হাঁ হাঁ খোলা রেখেছিলি, গরু ঢুকলে বাগান উজাড় করত না। যে দিকে নজর না দেব, সেদিকেই দেখি ফাঁক, গণ্ডগোল; তোমরা কেন আছ রে হতভাগা?"

"হুজুর" হাত ধোওয়ার মত করে হাত কচলাতে কচলাতে নিতা বলল—"হুজুর, আমার কি দোষ?"

"চুপ রও, ফের চোপা? জানিস্ না আমি কে?" দুমদাম পা ঠুকে বাড়ীর ভিতর গেল বলিদত্ত।

□

জ্ঞানত বা অজান্তে নিজেকে খতিয়ে দেখতে গেলে, আপনা আপনি মনে ভীড় করে অন্যদের কথা, যেন ওরা ওজনের বাটখারা, কুনকে, মাপকাঠি। জীবনের ছন্নছাড়া পথ চলতে চলতে প্রত্যেকে, নিজেকে চিনতে, নিজের ভালমন্দ বাছতে, জোগাড় করে এমনি মাপার উপকরণ, কুনকে, মাপকাঠি। তারা হল জানাশোনা লোক। ছোট মাপে মেপে, দেখে নিজের উৎকর্ষ—চাপরাশী নিতা, চাকর হর্ষাকে দেখে পেটভরে আনন্দ পায়। বড় মাপে মাপার জন্য সে নজর ফেরায় বলিদত্তর দিকে—কত বড়, সেখানে সে নিজের পাত্তা পায় না। ছুঁচকে তালগাছের সঙ্গে মেপে দেখার সাহস করতে পারে, অতিমানব; সাধারণ লোকে কুড়িয়ে নেয় নিজের সমান স্তরের মাপকাঠি যাতে মাপলে মাঝে মাঝে আপনাকে বড় মনে হবে, মাঝে মাঝে ছোট, অনিশ্চয়তায়, সন্দেহে নিজের বড়ত্ব বা ছোটত্বের বিষয়ে প্রশ্ন যাতে সর্বদা বজায় থাকে, যাতে সদুত্তর পাওয়া না যায়। বলিদত্তর মনে পড়ে বনুকে, শর্মার মনে পড়ে পাণ্ডেকে।

ভাবতে গেলেই পাণ্ডের কথা মনের ওপর চেপে বসে--

মনে পড়ে—'সিরেট দর্শন, হালকা নয় এমন চিন্তা যা ওজনে ভারী। মানুষের মাথা, বিধাতার সার সৃষ্টি, জীবনের উদ্দেশ্য আছে, বাঁচার মধ্যে, বর্তমানের প্রতি ত' নিশ্চয়ই, ভবিষ্যতের প্রতিও দায়িত্ব অসীম, জীবন অলস বিলাস নয়, জীবন একটা সাধনা।'

মানুষের জীবন নয় পশুর মত দৈবীনিয়ম পালনে আবদ্ধ।

আরাম চেয়ার থেকে তড়াক্ করে উঠে শর্মা ছট্‌ফট্ করে বারান্দায় এক চক্কর ঘুরে আসে। কখন মনে পড়েছিল পাণ্ডের নাম? খেয়াল নেই তা; অথচ খারাপ লাগছে; সারা জীবন পরের হাতের চামচেয় খেয়ে এখন নিজের হাত নিশপিশ করছে। কী অনুশোচনা; অনর্থক ফাঁপা দীর্ঘশ্বাস; পলকে পলকে হাই, মরণের ক্রিয়া কাজ করে

চলেছে। মনে হয়, এই পৃথিবীর জীবন, সে যেন স্তরে স্তরে সাজানো। পাখী উড়ছে, তারও স্তর আছে, পক্ষী জগৎ। কেঁচো ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে চলে, তারও স্তর আছে, কেঁচোর দুনিয়া। ঘাসে ছাওয়া জমি এক চিল্‌তে ; রূপ ও বিন্যাসের তারতম্যে তাতে নানা স্তরের সৃষ্টি ; সেইভাবে দেখা যেতে পারে—ডালপাতা ঝোলানো বটগাছ। হোক না তা' চারা বট, দূর্বা, যেন আঙুলের সমান উঁচু। একটা স্তরের সৃষ্টি হয়ত অন্যস্তরের সৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন নয় ; তবুও সংঘর্ষের ফল ভোগে। একখানা থান ইঁট খসে পড়লে কেঁচোর দুনিয়া থেঁত্‌লে চূর্ণ হয় ; ছ'নম্বরের ছর্‌রার ঘায়ে পক্ষী জগতে ঘটে প্রলয়। পাগুের ভাবের দুনিয়া শর্মার রাজপ্রাসাদের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে হঠাৎ যেন ম'ছির ফেলায় ওপর ডি.ডি.টির ধোঁয়াধুলো ছিটিয়ে দিয়ে যায়। চমকে ওঠেন শর্মা, চেতনার খোলসের ওপর প্রবাহ। পাণ্ডে, পুঁথি, জীবনের লক্ষ্য—কত দূরে এসব, কত দূরে ?

ভাসা মেঘ ভেসে চলে যায় ; রাজপ্রাসাদের মত সায়েব কুঠি, বিরাট বাগান, সাজসজ্জার পরিপাটি ; এখানে নেই ধুলো, কলরব, দৃষ্টিকটু দারিদ্র্য—ঘাম নেই। সব ঘাম শুকিয়ে গেছে কুঠির তলায়, হয়ত গাঁথুনিতে ঘামের জল পড়ায় তা' আরও শক্ত হয়েছে। হাড়ের সার থেকে ভাল ফুল জন্মায়, গোলাপের পাপড়ি ভরে যায় রক্তে। ঘামে তৈরী সার আছে দুনিয়ার সব কারিগরীতে, সব শিল্পে—এ ত' অলঙ্ঘনীয় সংস্কার।

পূজায় বলি—তা'ও ত' সংস্কার।

সব ট্র্যাডিশন। স্মৃতি, সত্তা, ভবিষ্যৎ—এতে আবার প্রশ্ন কি ?

ধান্দা, দৈন্যের এই বিকৃত দুনিয়ার ভিতরে এ হল অলকাপুরী, কী সুন্দর এই কুঠি !

এ হল সুষ্ঠু শিল্প ; এই আর্ট ছাড়া সংস্কার কি ?

পাণ্ডে—সে কি আর্ট বোঝে ?

জীবনের বিষয়ে লোকে বক্তৃতা করে, কিন্তু আগে বাঁচে জীবন। পাণ্ডে কখনো বাঁচার সুযোগ পেয়েছে কি ? শুধু যারা পায়নি কিছুই, তাদেরই হিংসার গরল—একেই লোকে বলে জীবনের অভিনব দর্শন।

সতেজ মুখ, ঠোঁটে হাসি, আস্তে আস্তে শিস্ দিতে দিতে ঘুরে আসেন শর্মা কুঠির চারদিক। এখানে সব জিনিষেরই উদ্দেশ্য আছে, লক্ষ্য আছে। বাগান বলে 'চাও, দেখ' ; গোলাপ খোঁজে

দেয়া-নেয়া, যুঁই এর কুঞ্জে প্রতীক্ষার ছায়া ঘনায়, দিনশেষের আধ অন্ধকারে পা টিপে টিপে একটা সুগন্ধ ছেয়ে আসে—মনে করিয়ে দেয় যে কোনও রূপ, সৌন্দর্য। লাল, নীল, হলদে নানা রংয়ের যত রকমের বিলিতী ফুল—রংয়ের রাজত্ব, অহংকার—সব মিলে যেন বেহায়া, উদ্দাম, ভোগের পটভূমি তৈরী, চক্ষুলজ্জাহীন।

সব কিছুরই উদ্দেশ্য আছে—ঠিকই ত'! নরম সোফা, বসলেই নেমে যায়; নির্জন বাড়ী, এই পর্দা, এই চওড়া চওড়া বাগানের পথ, এই খোলামেলা চৌহদ্দি—এ সব কেবল জীবনের আনন্দের জন্য, ভোগের জন্য— পাণ্ডে বা তার মত অন্যেরা মূর্খ, জানে না।

জানলে, গেরুয়া ভেক আগেই খসে পড়ে।

না জানলে জাগে বিরক্তি, ভুনিয়ার যত বোঝাপড়াহীন দ্বন্দ্ব, যত অস্বস্তি, এ সবের সর্বকালের কারণ ওই না জানার দোষে।

অতএব, আগে চাই বোঝাপড়া, ক্ষুৎকাতর কুকুরের কাছে বোঝা-পড়া—অন্তত একবার পেট পুরে ভাত।

দেওয়ার গরজ ?

লোকে বকতে থাক্, সমালোচনা করুক—সুখী ভোগ করে যাবেই, রাজা রাজত্ব চালিয়ে যাবে, হাজার লোকে ঘেউ ঘেউ করুক। প্রকৃতিরাজ্যে সুখী প্রাণী চক্ষুলজ্জা করে না। মূর্খেরা চেঁচাবেই, হতভাগারা করে থাকে কোলাহল—কে কান দেয় তাতে ?

ভাবতেই মাথায় খুন চড়ে যায়, গলার চারধারে মাংসপেশীতে টান ধরে, ফুলে ওঠে। চোখে শানিত, স্থির চাউনি। ঠোঁটের বাঁকে পাথরের ধার। ইচ্ছা করে টুঁটি চেপে মুঠোয় ধরতে, থেঁত্লাতে, কষে ধরে উঁচুতে তুলে আছাড় দিতে। অতীতের পুরুষানুক্রমে যুগযুগান্তরের কত গুণ—মানবজাতির বিকাশ, বিবর্ধনের পথে যুগানুগ আবশ্যক অনুসারে যা কিছু আপনাআপনি সৃষ্ট হয়েছিল—তারই সত্তা ফের ছেয়ে যায় মনের ভিতর, আদিমানুষের অবতার মূর্তি ধরে। সে চায় ভোগ করতে, একাদশীর নির্জলা উপোস সে চায় না। উদ্দেশ্যমুখী সাফল্য চায় সে, চায় না উপায়ের ভালমন্দের বিচার করে আটকা পড়তে। বাধায় সে অসহিষ্ণু, ভূতে পাওয়া সেবায়েতের মত। এ-হেন অবতারের খুব স্বাভাবিক আচরণ—চাবুক হাতে কষে মেরে অশ্বদের খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া, মেরেধরে বাধা সাফ করা, দুই জঙ্ঘার মধ্যে চেপে ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়া—হোক না সে ঘোড়া হয়রান, পড়ুক না তার গা থেকে ঘাম দরদর

করে, মুখ থেকে বেরোক না কেনা, রক্তরাঙা জোড়া চোখ। উন্মত্ত হতে পারে সে ঘোড়সওয়ার—রক্তমুখো মঙ্গলগ্রহের মানুষ; নেপোলিয়ন বা হিটলার থেকে তার প্রভেদ অবস্থাগত সুযোগের অভাবহেতু, প্রবণতার দরুন নয়। তার পিছনে—তার সঞ্চিত ধন, তার দলবল, তার গোষ্ঠী। সেই ত' তার আভিজাত্যের নিশানা। 'সম্ভবামি যুগে যুগে'—শর্মা বাগানে বেড়াচ্ছেন।

ডানাকাটা আগ্নেয়গিরি যেন জ্বলছে।

সুপুষ্ট পুরুষালী দেহ, সুন্দর, সুবেশ।

জীবন তাঁকে দিয়েছে প্রচুর, আরও দেবে; জীবন সুন্দর।

দেহের মধ্যে কামনার দাহ ধক্ ধক্ জ্বলে—চিরদিন তার অফুরান খিদে—

সেই ত' তার সতেজ পৌরুষ, তার যৌবন।

তা-ও ত' স্রষ্টারই আশীর্বাদ।

যন্ত্র চলে, জীব ভোগ করে যায়, কোনও ক্ষোভ নেই।

"চোখ নেই, কান নেই, কারুর যদি লাগে—আমার দোষ নেই।"

তবুও, জুলুম জবরদস্তি দরকার পড়ে না, সবই ঘটে আপনা-আপনি।

লোকেরা যেচে যেচে দিচ্ছে, হাতের অর্ঘ্য পায়ে ঠেলা—নিষ্ঠুরতা নয়?

হৃদয় বিরাট—খেদ নেই, দুঃখ নেই, নেই পশ্চাত্তাপ।

যা মিলছে—সব তার প্রাপ্য, তার যোগ্যতার উপযুক্ত ভেট—পতঙ্গ আসে, তা কি দীপের দোষ?

মনে পড়ে, সেই প্রথম—তখন তার বয়স পনেরো, চাকরানী ছিল বিলাসিয়া; ঠিক চাকরানী নয়; ধোপদুরস্ত পরনে, চিক্কণ করে চুলবাঁধা, তার ওপর একটা সাদা কোঁচানো উড়নি। সুন্দর ইংরেজী বলত, চলনে ছিল বিশ্বাস ও আশার দম্ভ। সে হাসতও।

বিলাসিয়া ছিল বড়ঘরের "আয়া", অলঙ্কার বিশেষ।

শর্মাকে ছিমছাম সাজিয়ে রাখা ছিল বিলাসিয়ার কাজ।

বিলাসিয়া মুখ মুছিয়ে দেয়, পোষাক পরায়, চান করিয়ে দেয়; ঠিক যখন পনেরো বছর বয়স, তখন শরীরের স্নায়ুকেন্দ্রগুলো গুমরে উঠল যেন রেডিয়োতে সুইচ দেওয়া, অতি দূরের সংবাদ আসতে লাগল, মন-গহনের বাণীও। আরণ্য জন্তুর প্রবৃত্তির বাণী ছিল তা পশুর সমাজগ্রাহ্য ভেকপরা দেহে। একদিন—কবে তা মনে নেই

পশুর সন্তানের চেতনা হল—বিলাসিয়ার অত পরিচর্যা কি শুধু

ছিল চাকরানীর ঝি-গিরি ?

বিলাসিয়া হেসেছিল—মনে পড়ে তার ছেনালিপনা, ছোট ছোট দাঁত দু'সারি, খুদে গোল মুখটি, কপালের ওপর ফুরফুরে চুল, মাথায় সেই কোঁচানো উড়নি। তার চেহারায় ছিল না বিশিষ্টতা, গড়নে ছিল না চটক। যতদূর মনে পড়ে, সেটুকুই ছিল তার মুখ, যেন মুখোস ঠেলে ঠেলে উঠছে একটা ঢেউ ; তা চিনিয়ে দিচ্ছিল বিলাসিয়াকে, সে নয় শুধু চাকরানী ; সে মানুষ, সে নারী।

পনেরো বছর বয়সে বিলাসিয়া দিয়েছিল চিনিয়ে, হাতেখড়ি।

মানুষের দেহ—আশ্চর্য ত' ! বাঃ, তোফা !

বিলাসিয়া হল তার খেলনা, চেতনার দিনপঞ্জীতে লেখা রইল নতুন কথা, মানুষ-খেলনা—সে খেলনা সব খেলনার সেরা।

নিজের সমাজে নিভৃতে সময় বুঝে কিশোর শর্মা সেই অদ্ভুত তথ্যের অনুশীলন চালালো। কৈশোরের গোপন প্রিয়তা আর কৌতূহলের সঙ্গে যৌবনের উদয়বেলার রঞ্জনরশ্মি, দু'হুঁ মিলি গেল বর্ণালীতে। কিন্তু সে দেখল যে, সে কোন নতুন আবিষ্কারক নয় ; লুকানো গোপন কিছুই নেই, সকলে তা জানে। আলসে সমাজে গয়ংগচ্ছ একসপেরিমেণ্ট করতে সবাই সে সুযোগ ও সময় পেয়েছে। মুখ ফুটে বলে না বটে লোকে, কিন্তু সবাই জানে, বোঝে।

সদর-অন্দর খোলা বড়বাড়ীর ছোট কথা চেপে যাওয়ার নামই—বড়লোকী ; সেই ত' ডিসিপ্লিন, আর কি !

তারপর সময় কেটেছে, সব দিনের কথা জড়ো করলে মনে হয় অথৈ জল, ভাবতে গেলে ভেসে ওঠে কত মুখ, ডুবে যায় আবার ভাসে। খেলেছে সে অনেক, খেলনা যেমন ধরেছে তেমনি ছুঁড়েও ফেলে দিয়েছে, হারিয়েছে, কুড়িয়েছে—বুঝেছে, একটাই কথা··· দুনিয়াতে মানুষ আর মানুষের মধ্যে সম্পর্ক শুধু খেলার, ফোঁপানো মিছে, সোহানো মিছে ; সাময়িক খেলাটাই জীবন, দি প্লে ইজ্ দি থিং। সায়েব-বাচ্চা শর্মা বেড়ে উঠেছে, হটে নি।

কে আসে ?

"ওঃ, মিসেস দাস ; কি চমৎকার, আসুন, আসুন। আপনি বিশ্বাসই করবেন না যদি বলি আমি খালি আপনার কথাই ভাবছিলাম। ভাবনাটা ত' মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত অধিকার ; না, কি বলেন ? না ভাবলে মানুষ বাঁচত কি ? আমার ত' অবাক লাগে।"

□

বেলা পড়ে এলে টেনিস খেলা—একদিকে শর্মা সায়েব ও সরোজিনী; অন্যদিকে রণজিৎবাবু ও শ্যামবাবু। দর্শক—মিলি, নিলি ও ঠিকাদার সাকলাতওয়ালা।

রণজিৎবাবু হারছিলেন।

রণজিৎবাবু চটছিলেন।

অবশ্য এই উভয় ব্যাপারের মোটা কোন কারণ ছিল না। শ্যাম বাবু কলেজে পড়ার সময় থেকেই বিখ্যাত খেলোয়াড়, নাম-ডাক আছে; প্রকাণ্ড চেহারা ও ক্ষিপ্র, খেলায় আধিপত্য বিস্তার করতে পারেন সিমেণ্টের চত্বরে। রণজিৎবাবু খেলার কৌশলে পটু।

অথচ শুনতে হচ্ছে মিলি, নিলির ঠাট্টা, তাদের উড়ন্ত হাসি ঝংকার-গুঁড়োর মত বারবার গায়ে বিঁধছে, অস্থির করছে; এবং সাকলাতওয়ালা—এ বছরের বড় বড় কণ্ট্র্যাক্ট পাওয়ার দিন ঘনিয়ে এল—সে যেন রণজিৎবাবুর সুপারিশে চট করে নমস্কার জানিয়ে দায়সারা গোছের কর্তব্যের পরে, সরাসরি শর্মা সায়েবের খেলা, কেরামতির জয়-জয়কার গাইছে প্রচুর উৎসাহে।

শর্মাও আজ প্রাণ ভরে খেলছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব কায়া-বিস্তার করেছে, মারের জোর, খেলার কৌশল, শুধু গোল টেনিস বলে মন্ত্র পড়ার মত ইচ্ছামত ঘা দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রতিপক্ষকে বিব্রত করাই নয়, পদে পদে 'পোজ্' দেওয়া, ষ্টাইল্ করে দাঁড়ানো, কখনো টেনিস্ ব্যাট হাতে ত্রিভঙ্গ, কখনো একপায়ে ভর দিয়ে। অন্য পা'টা হাওয়ায় লেজের মত ঝুলিয়ে, দুই বাহু ডানার মত ছড়িয়ে দমাদম্ মার, ষ্ট্রোক্‌গুলো যেন বিনা আয়াসে হচ্ছে; বল্, ব্যাট, দেহ ও হাওয়া সব একই ছন্দে সমন্বিত—প্রাণ দিয়ে খেলা। পাশে খেলছে সরোজিনী—পটলচেরা চোখে, নাকের ফুটো ফুলিয়ে, ঠোঁট কামড়ে, তুফানের মত সে বিপক্ষের পানে চেয়ে ছোটার সময়; রণজিৎবাবুর মাথার ভিতর বেসামালভাবে একটা কথা পুরনো সর্দির মত পাক্ খাচ্ছে—"নাথিং সাকসিডস লাইক সাকসেস।"

শর্মা প্রকৃতই জিতছেন। মিলি চেঁচাচ্ছে "আরও চেষ্টা কর, দাদা—আরও, আরও—"

রণজিৎবাবু তাকাচ্ছেন সরোজিনীর দিকে। সে কী সুন্দর নির্ভর করতে শিখেছে শর্মার ওপর! তাঁর দক্ষতার ওপর তার বিপুল বিশ্বাস। বিখ্যাত খেলোয়াড় শ্যামবাবুকেও সে হয়রান করতে পারছে। শ্যামবাবুর আজ হল কি?

শ্যামবাবু সংকুচিত, খেলায় ব্যক্তিত্বের ওপর পড়েছে চাকরীর বাঁধনবেড়ি; ওদিকে যে খেলছে—সে ত' শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সে ওপরওলা। অবশ্য খেলোয়াড়ী নীতিতে এসব ধরার কথা নয়।

তা হোক্। তবু, অবস্থা দেখে ব্যবস্থা—বর্ষা দেখে ছাতা। দানাপানি। টেনিস খেলা দরকার ত' সেজন্যই। এতে বড়লোকের সান্নিধ্য পাওয়া যায়, সান্নিধ্য থেকে সুবিধা, উঠোতে পারলেই হল। টেনিস খেলে অনেকে নীচতলা থেকে ওপরে উঠে গেছে, ওপরওলাকে খেলায় হারিয়ে, লজ্জা দিয়ে নাকি? না। খেলিয়ে খেলিয়ে। শ্যামবাবুর নীতি অতি স্পষ্ট। রণজিৎবাবুকে দেখলেই মনের ভিতর চাগছে খেলোয়াড়ী ব্যক্তিত্ব—তাতে রাশ লাগাতে হচ্ছে। আঃ, খেলুন না মিষ্টার শর্মা! তাঁর খেলায় বাদ সাধা কেন?

তা' ছাড়া, সরোজিনী। সে যখন ফুর্ ফুর্ করে টান টান হয়ে বাহু তুলে ষ্ট্রোক্ মারে, শ্যামবাবু চেয়ে থাকেন ত' চেয়েই থাকেন; নিজে এধার ওধার করেন মনের মধ্যের একটা বুনো বেগের প্রভাবে —খেলার কায়দায় নয়; তিনি যত নাচ্‌তে থাকেন, সরোজিনী তত হাসে। শ্যামবাবুরও ইচ্ছে হয় নাচ্‌তে—জালের ওপাশে টেনিস ব্যাট উঁচিয়ে হেসে হেসে দুলে দুলে এপাশ ওপাশ লাফায় এক তরুণী, দেখলে এপাশে অমন নাচতে ইচ্ছে কার না হয়।

ফলে নিজের ষ্ট্রোক্ মনে পড়ে না। লোকে বলে—তাঁর মার ঠিক গুলির মত, ব্যাটের জাল ছিঁড়ে যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে সরোজিনী যে। এই ভাল বরং।

কাজেই রণজিৎবাবুর দেখা ছাড়া উপায় নেই—একদিকে শ্যাম-বাবুর ভালুক নাচ, সামনে ষাঁড়ের মত গুঁতিয়ে আসা শর্মা সায়েব, আর ওদিকে সরোজিনী—যেন হাওয়ায় নাচে প্রজাপতি, হাতের কাছে কিন্তু নাগালের বাইরে, ধরবার ইচ্ছা ও না ধরতে পারায় রাগ—দুইই বেড়ে চলে এক সঙ্গে।

কতক্ষণ যাবে এ রকম? এখন ত' খেলা আর আনন্দের নয়, দুঃখের, রাগের, রোগের। বিকৃত মনে রণজিৎবাবু চটপট ভাবতে থাকেন। সামাজিক ভদ্রতার বন্ধন ও উপদ্রব—এই রকমই; মনের

ভিতরটা জ্বলে পুড়ে খাক্; তবু বাইরে তার চিহ্নবর্ণ না দেখিয়ে হেসে হেসে খেলে যেতে হবে, খেলে যেতেই হবে। সুতরাং তিনি খেলতে বাধ্য। তুচ্ছ ভদ্রতার কথা বাদ দিলেও, শর্মা তাঁর ওপর-ওলা, বড় সায়েব; অগত্যা—

তবুও, এ খেলারও শেষ আছে। শর্মা উঠে পড়লেন—ভদ্রতার খাতিরে সরোজিনীকে তাঁর কোট পরায় সাহায্য করার কথা। রণজিৎবাবু ইতস্তত করতে করতে, শর্মা ছেলেমানুষের মত সরোজিনীর কোট খুলে ধরে বললেন—"আমায় অনুমতি দিন।" সরোজিনী কোট্ পরে ফেলল। শর্মা বললেন, "আসুন, আপনাকে আপনার বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাই।"

দু'জনে মোটরে চড়লেন। রণজিৎ বাবু কর্তাকে লম্বা নমস্কার করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মোটর চলে গেল।

সাক্লাতওয়ালা হাঁকলেন—"আসতে আজ্ঞা হোক, আপনি যদি নিতান্ত ক্লান্ত না হয়ে থাকেন, আসুন, আর একটু খেলা যাক্—"

□

খেলা শেষ—সকলেই চলে গেছে; একলা শুধু রণজিৎবাবু। নিজের বাসায় বাগানের মধ্যে আরামচেয়ারে গা এলিয়ে দূরের পানে তাকিয়ে আছেন। কিছুই যেন নেই, কেউই নেই, ফাঁকায় শূন্যে তাঁর মন। চারিদিকের মত্ততা কেটে গেছে, শুধু আধার অবলম্বনহীন শূন্যতা। এতে স্থূল-আশ্রয়ী সাধারণ সতেজ ব্যক্তিত্ব দুমড়ে মুচ্ড়ে মুষ্ড়ে পড়ে; তার আড়াল থেকে যা বেরোয় তা যেন এই পৃথিবীর নয়, আকাশের, খালি ব্যোম্।

রণজিৎবাবু বসে আছেন; আজই নয় শুধু, অনেক দিনই এ রকম যখন মানুষ বোঝে—সব শূন্য, ফাঁকা, দু'দিনের নয়, দু'মুহূর্তের। সংসার তখন তেতো লাগে, বাঁচা মরার প্রতি মানুষ হয় উদাসীন, নির্বিকার; শুধু পর্দার পর পর্দা চোখে পড়ে, রূপান্তর। ভোরের ছায়া-আলো, তারপর বেলা বাড়ে, অন্ধকার আসে। আলোর ধারে ধারে ছোট ছোট আঁধার-কণাগুলো মিশে আছে দেখা যায়, আঁধারেও দেখা যায় আলো, আলো আর অন্ধকার না মিশলে রূপের সৃষ্টি সম্ভব নয়; অন্ধকার বাদে মমতার জোর নেই; আবার মাথা

'তুলে মুখ বাঁকায় মহাশূন্যের দিকে—তার কিছু নেই, সব ফাঁকা। সে যেন আঁধার আলোর গর্জনময় রূপের সমুদ্রে খালি বিস্তৃতি, সেখানে সুখ নেই।

মহাশূন্যের ধ্যানে অনাদিকাল থেকে বসেছে কত প্রাণী, বসেছেন যোগী—আজীবন; বসেছে ভোগীও কেবল আহত মনে কয়েক মুহূর্তের জন্য—; সেই সময় সকলেই যেন এক। দুনিয়ার চোখে তারা করুণার পাত্র, কিছু না-থাকা, নিঃস্ব দুঃখীর দল তারা, তাদের চোখে সবই নিরর্থক।

সময় কাটাচ্ছেন রণজিৎবাবু বসে বসে; দিন শেষ, অন্ধকার নেমে আসছে। আকাশে ঝক্ঝকে তারা, অগণিত রোজকার মত। কিন্তু মনের সব অবস্থায় সম্ভব নয় তাদের ও চারপাশের অন্ধকার দেখা। প্রকৃতির বিভিন্ন সম্পদ নজর করে মানুষের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব। রণজিৎবাবু এখন চেয়ে আছেন অন্ধকারের পানে।

এমনি একাগ্র ধ্যানে বসে থাকতে পারলে হয় ত' আত্মা কখনও পায় সচ্চিদানন্দ চিরন্তনের পরিচয়, দেহ হয় উইঢিবি, আধুনিক সমাজ সম্রাট রত্নাকর হতে পারে প্রাচীন বাল্মীকি। কিন্তু মাটি জলের স্থূল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে জন্তু এড়াতে পারে না। যদি কখনো এড়িয়ে গিয়ে একপাশে ধ্যান লাগায়, তবে আরও জোরে আরও উগ্র আলোড়নে সেই পৃথিবীতে ফিরে আসতে চায়, জলের মাছ তীরভূমির শূন্যধ্যান ছেড়ে টুপ্ করে ডুব দেয় অতল জলে।

ওঃ, উগ্রভাবে ভাবনা ঘুরে ফিরে মনে করায়—সরোজিনী?

অন্ধকারের মধ্যে রণজিৎবাবুর এই অভিনব ব্যক্তিত্ব যেন কোন বন্য তুফান, সোঁ সোঁ গর্জন, সঙ্গে আছে বাজের কড়কড়ানি, সংহারের নিনাদ, প্রহারে ধ্বংস। একটা প্রলয়ঙ্কর বেগ হল তার পরিচয়, ফালাফালা অন্ধকার ও চোখ ঝলসানো বাজের আওয়াজে যুগান্তের তাণ্ডব নৃত্য। বুড়ী পৃথিবীর জন্মদিনের আদিম ঝড়ের রেশ যেন কখনও নিংড়ে নিয়েছিল মানুষের মন, রক্তে তা' মিশে গিয়েছিল তেজোগুণ হয়ে, পুরুষানুক্রমে তা বহমান; সংস্কার তার অপসারণে অক্ষম। সভ্যতার ভেকের নীচে তা ঘাপ্টি মেরে থাকে, নতুন গহ্বর দিয়ে বেরোয়, মূর্তি ধরে সেই আদিম ঝঞ্ঝা, চায় ধ্বংস। মানুষের মনের মধ্যে তখন সেই ভয়ঙ্কর রূপের ঘূর্ণি চলে—মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি। আদিম আরণ্যক মানুষ গাঁথে নরমুণ্ডের মালা, পাশবিক যৌন ক্ষুধার জন্য করে প্রণয়, সেই প্রণয়ের দরুন

গড়ে শত্রু, প্রেয়সীকে উপহার দেয় শত্রুর কাটা মাথা। পাথরের খাঁড়া হাতে বিকট চিৎকার করে বায়ুবেগে ঘুরছে যেন সেই নগ্ন আরণ্যক মানুষ, তার নখ লম্বা লম্বা, গায়ে পশুলোমের মত লোম, সে খুঁজছে শত্রুর কাটামুণ্ড, চাপ চাপ রক্ত।

ওঃ, সরোজিনী!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসে রণজিৎবাবু সিগারেট ধরালেন। ঘরের ভিতর কে রেডিও খুলছে, শোনা গেল।

□

"এবার একখানা মোটর না রাখলেই নয়, বুঝেছ সরোজ" বলিদত্ত বলছিল আর উৎসাহে দেখছিল সরোজিনীর মুখ। সেখানে একটু হাসি—তা-ই তার আত্মপ্রত্যয়।

"ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, হেসেছেন, আর এক ধাপ এগোলেই, —যদি কপালে থাকে—আমরাও কোম্পানীর কোন ঘাঁটিতে বড় সায়েব হব—।"

"ঠিক, ভগবান হেসেছেন", সরোজিনী মুখ তুলে চাইল "এবার মোটর।"

"তা নয়ত কি! এখন মোটর রাখলে সম্বন্ধীরা আর হাসবে না। যার যেমন সাজে। সেজন্য ভগবান ধাপে ধাপে সাজিয়ে রেখেছেন ছাপ্পান্ন কোটি মানুষ, যার যেমন হাত পা, মাপ তেমনি।"

"আর যার হাত পা নেই?" সরোজিনী বলল "তার কোন্ মাপ?"

"ছি সরোজ, আমাদের ছেলেমেয়ে নেই বলে যখন তখন তোমার খোঁটা দিয়ে কথা বলা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। অমন করে বললে ভগবানের বিরোধ করা হয়। সব ভগবানের দয়া, সবই সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা; তুমি আমি সমালোচনা করলে পাপ হবে।"

"তুমি এত বড় ঈশ্বর বিশ্বাসী। কখন যে বৈরাগী হয়ে যাও—ভয় হচ্ছে; মা গো! কথায় কথায় ভগবান।"

"সত্যি সরোজ, আজকাল স্নানের পর যখন এক অধ্যায় ভাগবত পড়ি, মনে খুব শান্তি আসে। এ কার কাজ? ভাব ত' একটু, কথায় বলে 'আমিই করি, করিয়ে থাকি; আমা ছাড়া গতি আছে নাকি?' গুরুর দিকে নজর কর, সেই কোথায়! কত তলায়! কত জনা একসঙ্গে চাকরী শুরু করি—কেউ বিশ্বাস করেছিল যে, আমি

এতদূর উঠব ? যেন কালকের মত মনে হচ্ছে, অথচ আজ ? ডিঙি চলেছে—এত দূর এলাম, এখন শেষের কথা ভাবি ; মোটর হবে, একটা বাড়ীও চাই—জমি জেরাত ত' বটেই—কিছু সঞ্চয় ; তোমার অভাব থাকবে না। দুনিয়া দুষতে পারবে না আমাকে। আমার কর্তব্য আমি করেছি। কি করে অকৃতজ্ঞ হই, বল ? পদে পদে দেখছি ভগবানের দয়া। এত পথ পার হলাম ; এখনও আয়ু আছে, দেহে বল আছে, ভগবানকে স্মরণ করি আর শেষের কথা ভাবি।"

বলিদত্ত যেন এক নতুন ভাবনায় তদ্‌গত, সরোজিনী তার অবলম্বনের মত ; নয়ত' তার কথাগুলো স্বগতোক্তি। সরোজিনী চেয়ে রইল তার স্বপ্নাবিষ্ট মুখের পানে। লোকটা নিজের স্বপ্নেই নিজে বিভোর, কি নিশ্চিন্ত ! নিজের চারদিকের গণ্ডী পেরিয়ে তার নজর বাইরে যেতে মোটেই চেষ্টিত নয়। সরোজিনীর মনের ভিতর জ্বলে উঠল হিংসা, তার সামনে আলাদা একটা লোক যার স্বপ্ন তার স্বপ্ন নয়।

হেসে ফেলে সে বলল "তুমি সামনের কথা না ভেবে, ভাবছ শেষের কথা ; শুনেছি শেষের কথা ভেবে ভেবে লোক সন্ন্যাসী হয়। শাস্ত্রে বলে—'মানুষের শেষ শুধু শ্মশানে' ; যখন এ দেহ পুড়ে যায়, তখন থাকে না কিছুই। আত্মা উড়ে যায় ; সঙ্গে কিছু নিয়ে যায় না।"

"তা হলে, মালা জপো।"

"তুমি ত' জানো, একবার তপস্যা ভাঙলে আর তপস্যা চলে না। সে রাস্তা ত' শেষ, আর সে কথায় কাজ কি ? মোটর কিনবে, কেনো। বাড়ী তুলবে তোল ! সন্ন্যাসী হোয়ো না।"

"না, না, বাজে কথা ছাড় ; এই দেখ কি তাড়া ? এখান থেকে ডিপোয় টো টো রোদ্দুর মাথায় করে যাওয়া—যেমন কষ্ট, তেমনি বিশ্রী। কোথাও যেতে হলে নিজের মোটর না থাকলে, কি যে অসুবিধা, কি বলব। তুমি ত' সব বুঝছ—ভাবো ত' মোটর দরকার কি না !"

"নিশ্চয় দরকার, এ আবার জিজ্ঞেস করতে হয় নাকি ? কিন্তু যদি কেনোই ত' মিষ্টার শর্মার মত বড় গাড়ী কিনবে, তবেই ত' ! জানো, তাতে কী আরাম, গদির ওপর বসে হেলান দিলে মানুষ যেন শূন্যে ঝুলতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে এলিয়ে পড়ে চোখ বুঁজতে ইচ্ছা হয়। পারবে অমন মোটর কিনতে ?"

বলিদত্ত চমকে তাকাল, মনে হল তার কানের গোড়ায় যেন ফুটন্ত তাপ, বুক দমে যাচ্ছে, যেন সত্যিই সে শূন্যে ঝুলছে আর তার সঙ্গে সরোজিনীর অন্তরাত্মা শূন্যে পিছলে হারিয়ে যাচ্ছে।

এই তার স্ত্রী, এ শর্মার গাড়ীতে আরামের ব্যাখ্যা করে! বলিদত্ত চুপ।

সরোজিনী তাকিয়ে দেখল, বুঝল যে ঘা-য়ে চোট লেগেছে—মুচকি হেসে বলল—"চুপ করে রয়েছ যে! টাকার কথা ভাবছ বোধ হয়। সত্যি ত', সব কেনাকাটার জন্য চাই নিজের ট্যাঁকের জোর। মিষ্টার শর্মার গাড়ী দেখেছ ত'! পারবে অমন গাড়ী কিনতে?"

"বুঝলে—" বলিদত্ত বলল, কিন্তু 'সরোজ' সম্বোধন যোগ করতে বাধল, 'সরোজ' তার আদরের ডাক—"বুঝলে তুমি—পয়সার অভাব নেই; ভগবান সে বিষয়ে হাত টান করেন নি; টাকাকড়ি হাতের ময়লা; খাটার দরকার নেই, লোকে যেচে বাড়ী এনে পৌঁছে দিয়ে গেছে। কিন্তু পয়সা রোজগার এক কথা, লোক হাসানো অন্য কথা।"

"লোক হাসানো!" সরোজিনী বলল; ধনুকের মত উঁচু হল তার জোড়া ভ্রূলতা, অপূর্ব কৌতূহল মুখে ফুটিয়ে জগৎজয়ের মত মুখ করে সে বলল—"বড় গাড়ী কিনলে লোকহাসানো হয়? তবে ত' সমস্ত বড়লোকই লোক হাসায়। লোক হাসানোর ভয়ে পিছোবে, তুমি?" 'তুমি'র ওপর জোর দিয়ে বলল।

কী সরল, কী সুন্দর।

তবুও বলিদত্ত চেয়ে চেয়ে যেন অনুভব করল—বিশ্লেষণে মনে হয়—সরলতার উপাদান বহুগ্রস্থ জটিলতায় ঢাকা। তার ভিতরটা যেন জ্বলে গেল। সাফল্যবাদী কর্মচারীর ভেক খসে পড়ল—সে হল এক সাধারণ মানুষ। আবার সেই মুখটির দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে মিইয়ে এল বলিদত্ত। সরোজিনী ততক্ষণে হাসতে শুরু করেছে। সে মুখের পানে চেয়ে সে সব ভুলতে পারে।

সরোজিনী হাত-তালি দিয়ে বলল "যাই হোক, এতদিনে সাড় হল তোমার! কবে থেকে বলে আসছি—একটা মোটর কেনো। সব সময় ত' ফাইল আর কাজ। মোটর হলে তোমাকে হিঁচড়ে নিয়ে কতদূরে বেড়িয়ে আসব। খালি খাটতেই জানো, একটুও জানলে না সুখ কি! কাজকর্মের জঞ্জাল ফেলে কোন দূরে দু'দণ্ড বেড়ানো যায়—পাওয়া যায় খালি চুপচাপ শান্তি আর আনন্দ।"

বলিদত্ত খুশী হল। সবদিনের মত তার কেরামতি ব্যাখ্যা করে নিজেকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে বলল "জানো না সবকথা। এই মোটর—এ কি হাত থেকে কিনব? বললাম 'শেঠজী, মোটর না থাকায় বড় অসুবিধা হচ্ছে।' আন্দাজ করতে পার নিশ্চয়, কার কথা বলছি। সে বলল 'বাবুজী, বহুৎ খুব, জো ফর্মাইয়ে।' বাস, হয়ে গেল।"

□

সে রাতে সাকলাতওয়ালার বাড়ীতে দামী ভোজ, আসলে একটা নাম-করা "সমাজ-ভোজ", সেই রকমের এলাহি কাণ্ড আর কি! যা, কারণে বা অকারণে বছরে কয়েকবার ঘটে এখানে সেখানে, কখনও এঁর বাড়ী, কখনও ওঁর!

এ ভোজের বিশিষ্টতা যেন সাধারণের চোখে আঙুল গুজে বুঝিয়ে দেয় যে, সাধারণের পর্যায় থেকে ওপরের মহল আলাদা। বাইরে তার আওয়াজ শোনা যায়, "হটো, হটো, তফাত যাও।" বড় সড়কের ধারে বড় চৌহদ্দি, ভিতরে প্রকাণ্ড, চওড়া, ফাঁকা আঙ্গিনা, বড় বাগান। উঁচু ভিতের ওপর বিরাট বাড়ী—রাস্তার ধারে বড় ফটক, ফটকের পাশে ভোজালী হাতে গুর্খা দরোয়ান, ভিতরে দেখা যায় লক লকে জিভ কুকুর। "হটো, হটো, এখানে কিছু কাজ নেই।"

দূরে দূরে ধুলোটে, কালো সারি সারি পাড়ার বস্তি—ঠেলাঠেলি।

বেশ কিছু যাদের ছিল, এখনও আছে, চিরকাল রয়ে এসেছে—তাদের বৈশিষ্ট্য, থাকবে বৈকি—খোঁচাখুঁচি, গাদাগাদি-ভরা দুনিয়ায় সে ত' খানদানী দুর্গ।

ভিতরে দেখা যায় নানা রঙের আলো, বাইরে সারি সারি লম্বা মোটরগাড়ীর লাইন, আলোতে চক চক করছে তাদের পিঠগুলো। পথের হাটুরের কল্পনায়, ইন্দ্রভুবন। কিছু না হলেও, শুধু দূর থেকে চেয়ে সে চোখের সুখ মিটিয়ে যায়, যাথার্থ্য খুঁজে অর্থ করে যায় এইভাবে—পাঁচ আঙুল ত' সমান নয়; তাছাড়া—পূর্বজন্ম, ভাগ্য, যুগধর্ম।

এই ভাগ্য আর পূর্বজন্মের প্রভাবেই বোধ হয়—কোথাও কোথাও হয় ভূমিকম্প, লোকে থেঁতলে, চেপ্টে মরে, ঘটে দুর্ভিক্ষ, মানুষ-

সত্তার নেংটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাটিতে মেশে ; পথের পথিক আপনার পাঁচ আঙুলের দিকে চেয়ে বিধির অলংঘ্য বিধান মাথা পেতে নেয়। তার সামনে লম্বা পড়ে আছে রাস্তা—সুখেদুঃখে ; পাশে এই ইন্দ্র-ভুবনের শোভা, এখানে সেখানে।

ভিতরে বড় হল্ ঘরে লম্বা টেবিল পাতা ; তার এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো পর্যন্ত ঝক ঝকে সাদা চাদর ফর ফর করে ফেনিয়ে উঠছে ; খোদাই কারুকার্য-করা স্ফটিকের টব এক এক জায়গায়, তাতে শোভা পাচ্ছে গোছা গোছা ফুলপাতার ঝুমকো—যেন টেবিলের ওপর সাজানো বাগান। বর্ষার ছাঁটের দিকে ছাতা দেখানোর মত আবশ্যক বুঝে, দুনিয়ার চালচলন নিজেকে খাটো করে দিয়েছে বিশিষ্ট অতিথিদের সেবার জন্য। এসবের মাঝখানে কারুকার্য করা বিবিধ আকারের থালায় রংবেরং-এর খাবার। দামী গদি আর দামী মোড়কে সাজানো চেয়ারের সারি। দেওয়াল ও ছাতও সাজ-সজ্জায় ভর্তি—সবই পরিপাটি—যেন এক মায়ালোক। রং, সুগন্ধ ও স্বাদু জিনিষের সমাবেশ ; বিশিষ্ট অতিথিরাও যেন মায়াবীর দল। স্বর্ণ-লঙ্কার ঐশ্বর্যভরা ভোজনকক্ষের মত—এসেছেন মায়াপুরীর বৈভবশালী দানবেরা, এককালে তাঁরা ছিলেন, এখনও আছেন ভিন্নরূপে।

ভোজ চালু, গল্প চলছে।

সামান্য একটা আঙুর দানা মুখে তুলছেন যেন একটা ভারী বোঝা তুলছেন—এমনিভাবে ধীরে সুস্থে, ধনকুবের সাকলাতওয়ালা বললেন—

"ব্ল্যাক, কালোবাজার—সেটা কি? হিংসুটে লোকে এসব নাম দেয়, বুদ্ধিহীনেরা তা শোনে, ব্যবসার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক নেই তারা এর ধুয়া ধরে। চারদিকে শুনি ব্ল্যাক, কালোবাজার, ঘুষখোরী, বৃথা একটা জুজুর ভয় ; লোকে তা মুখে মুখে ছড়াচ্ছে, কাগজে ছাপছে, চাঞ্চল্য জাগিয়ে জনতার মনে আতঙ্ক! লোকে বোঝে না—দোকানদারী চিরদিনই দোকানদারী! ক্যা ভেইয়া?"

বিখ্যাত ব্যবসায়ী পান্নালাল, মোটাসোটা বেঁটে মানুষ গম্ভীরভাবে এক দলা খাবার খুব চটকে চিবোচ্ছিলেন টেবিলের ওধারে ; বললেন—"ঠিক বাত্! দোকানদারী লাভ লোকসান—দুইই থাকে। মন্দার সময় যে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে, তেজীর সময় তার কিছু মুনাফা কুড়াবার হক্ আছে। ব্যবসাদার চায় না পরের ক্ষতি। সকলের

মঙ্গলই খুঁজি আমরা, লোকের ভালো হোক, গোজাতির কল্যাণ হোক, সব্‌লোককো মিলে শুভ ঔর লাভ্‌, সব্‌কো মুনাফা মিলে, হে ভগবান্‌। লেকিন গালি দিতে লোক খুব মজবুত, ছুনিয়ার আদত্‌ ভি এ্যায়সা !"

সাকলাত্‌ওয়ালা হাসলেন, বললেন—"হ্যাঁ, গালিটা আপনাকে বেশী শুনতে হচ্ছে। সত্যি।"

"সে আমার কপাল" পান্নালাল বললেন "যে চাইল, চাঁদা দিলাম তাকে; গোসেবা হো, চাহে নরসেবা হো। চাঁদা দিতে যা বেরিয়ে যাচ্ছে, তা আমার মন জানে। তারপর গরীবগুর্বোকে কিছু কখনও মিষ্টি খাওয়ানো।"

সাকলাত্‌ওয়ালা বললেন "তাই নিয়ে আবার কথা উঠছে। আরে বাপু, যে তোমার কাজ করে দিলে তাকে কিছু দেবে না? কেন সে তোমার জন্য রাতের পর রাত খাটবে? সকলের কাজ পিছিয়ে রেখে কেন সে তোমার কাজ আগে করে দেবে? তাকে দেওয়া ত' পুণ্যেরই কাজ। দিলে বলছে বিগ্‌ড়োচ্ছে; না দিলে বলবে ঘুষ! এ ছুনিয়ায় পুণ্য নেই, সত্য নেই; সত্যের নাম ডুবলো—"

"রাম রাম ভেইয়া," পান্নালাল বললেন "এমন ছুনিয়া থাকবে না। চাঁদা দিয়ে, গরীবকে মিষ্টি খাইয়ে যা বাঁচলো, তার সিংহ-ভাগ কেটে নিল ইনকাম ট্যাক্স। আমরা কি মুনাফাখোর? লোকে আসুক, ভিতরটা দেখুক। গতরে না খাটলে ত' কেউ দেবে না। তবে কুলি মেহনত করে যা রোজগার করে তা তার নিজের জন্য; আমরা মেহনত করি পরের জন্য। যা-ও বা হাতে থাকে তা সবই এ দেশের ত'! এখানেই ব্যবসায় খাটে, দশজনে মজুরী পায়, কাজ পায়। না, কে সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলে যাচ্ছে?"

"সে ঠিক কথা।"

বলিদত্ত কনুই দিয়ে খোঁচা দিল শ্যামবাবুকে "ওই শুনুন ব্যবসার বড় বড় নীতি, শ্যামবাবু! মন দিয়ে শুনুন, কোম্পানীর সঙ্গে এদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। আচ্ছা, শর্মা সায়েব এলেন না, রণজিৎবাবু নেই; ছ'জনে শিকারে গিছলেন; কি হল তাঁদের?"

"ওসব বড় বড় কথা" শ্যামবাবু বললেন। তিনি খেতে ব্যস্ত খুব।

"সন্ধ্যেয় ফিরে আসার কথা, অন্তত মিষ্টার শর্মা; দেখছেন না—জমছে না কিছুতে—"

"হুঁ", শ্যামবাবু দেখছেন খাবার।

পাশাপাশি দু'জন ভদ্রমহিলা—কুমারী নাগ ও শ্রীমতী পাল। আলোচনা করছেন—রাবীন্দ্রিক ছন্দ, খাওয়ার ফাঁকে আলোচনার পথে যেন তাঁরা নতুন করে সে ছন্দের আস্বাদ পাচ্ছেন।

"রাবীন্দ্রিক ছন্দটা" কুমারী নাগ বললেন; তারপর বাক্যটা শেষ না করে তাকিয়ে রইলেন নিজের নখের দিকে। রং করা লম্বা লম্বা নখ—তাতে উত্তর লেখা নেই।

"সে ছন্দে আছে অফুরান আলো, অবাধ হাওয়া আর অস্ফুট শ্যামলিমা। রাবীন্দ্রিক ছন্দ অনবদ্য।" শ্রীমতী পাল বললেন।

"যতবার আমি রাবীন্দ্রিক ছন্দে মন দি, আমার ভিতরটা কি যেন হয়ে যায়।" কুমারী নাগ বললেন "মানে, ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। সে যে ভাষার অতীত।" অনেক কিছু বলে ফেলেছেন মনে করে তিনি চাঁদমুখটি তুললেন শ্রীমতী পালের দিকে। কিন্তু শ্রীমতী পাল স্বপ্নে ভাসার মত বললেন—"কি হয়ে যায়? তা আমি বলতে পারি। কি যেন কোমল কঠিন, সরুমোটা একত্র গুলিয়ে যায়। হৃদয় অনুভব করে, সব যেন তরল, উথালপাথাল, স্থূল আর সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম আর স্থূল—সব একাকার হয়ে অসীমের পথে নির্বাক ছুটছে। সেই হল রাবীন্দ্রিক ছন্দ, অসীমের স্পন্দন।"

শ্রীমতী নাগ কুমারী পালের দিকে মুখের একফালি বুলিয়ে নিয়ে স্থির দৃষ্টিতে সামনে চেয়ে রইলেন। এ তাঁর এক স্বাভাবিক চাল; কারুর সঙ্গে কথা বলার সময় মুখের এক ফালি অপর পক্ষের দিকে ঘুরিয়েই উলটো দিকে চেয়ে থাকেন। অপর পক্ষ তাঁর মুখের দশ আনা বারো আনা অংশ দেখতে পায়। আরসিতে তিনি আগেই দেখে রেখেছেন যে, সেই দশ বারো আনা অংশই দেখতে সুন্দর।

শ্রীমতী পাল যেন প্রাস্তভাষণ দিচ্ছেন, এমনি ভঙ্গীতে বললেন—"এই হচ্ছে রাবীন্দ্রিক ছন্দ, অসীমের স্পন্দন; বোঝা যায়, প্রকাশ করা যায় না ত'; না, আপনি আর কিছু বলবেন?"

কুমারী নাগ বিগলিত হয়ে বললেন—"সুন্দর, সুন্দর।"

দূর থেকে সেই দিকে মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে রয়েছেন নবকিশোর, চোখের পলক পড়ছে দেরীতে। শ্যামল মুখের ওপর পাউডার ও ক্রীম মিশে একটা নতুন রংএর মুখোস। মাথার তেলতেলে লম্বা চুল মাঝখান থেকে দু'ভাঁজ করে ফাঁক করা। ঢিলে সাদা পাঞ্জাবী, গলা থেকে ফুলকাটা চাদর লতাচ্ছে। মুখোমুখি পিছনের পানে

চেতনায় বারংবার টানাটানি। ঠেলাঠেলি করে একবার শ্রীমতী পাল, একবার কুমারী নাগ, আর একবার টেবিলে অন্যদের দিকে তাঁর দৃষ্টি। ঠেলাঠেলি করে একবার ডাগর দেহের ওপর কারুকার্যময় শাড়ীর ঢেউ, সরু বালির মত টান টান চামড়ার ওপর কোমল তেজ, একবার নদীর সরু পাড়ের মত বেণীটি, আবার খুঁটির মত শক্ত খাটো ঘাড়ের ওপর গোল খোঁপা, হয়ত বারেক ঘাসের গালিচার ওপর ফোটা বেলফুল, আবার ক্রীম ও আতরের সুবাস, একবার বাহুর ওপর ঘন পাঁশুটে রোমের সঙ্গে পাঁউরুটির গন্ধ-সংযুক্ত কল্পনা, আবার সুবেশ নারী মূর্তির কায়া ঘিরে নানা খেলা, মনে মনে মাঝে মাঝে সে মূর্তির সুবেশ আবরণ খুলে খুলে থর থর বুকের ওপর চেপে এক ধরনের রুগ্ন স্বাদের অনুভূতি উপলব্ধি করা। নবকিশোর বাবু এইভাবে চোখের মাধ্যমে ভোজ চাখছেন। ঢলঢল তাঁর মুখে মৃদু হাসির মত সামান্য হাঁ, লম্বা লম্বা ঝক ঝকে দাঁত দেখা যাচ্ছে, তিনি এক সমাজবিহারী শৌখীন কবি।

যে যার ইচ্ছেমত ভোজ খাচ্ছেন—বাধা নেই।

কাড়াকাড়ি নেই—আছে দেয়া-নেয়া—"নিন না আর একটা—"

টেবিলের ওপর সবাই সঙ্গী, সাথী, মানা নেই, বাধা নেই—যে যেমন চায়। সুশৃঙ্খল সমাজ—তা দেখে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের নিরাপত্তা।

দীনবন্ধুবাবু মুখ গুঁজে ভোজ খেতে ব্যস্ত—তারই মধ্যে হিসেব নিচ্ছেন দরদামের ; দামী খাবারের ওপর তাঁর বিশেষ চোখ। হরিবাবু তুলেছেন খাদ্য বিষয়ে আলোচনা—"হেঃ হেঃ হেঃ, দীনবন্ধুবাবু ভারী বুদ্ধিমান, হেঃ হেঃ—"

"রাম আসতে পারল না" দীনবন্ধুবাবু বললেন, "লিখেছে 'কাকা, বিলেত যাবার চেষ্টায় আমি বড় ব্যস্ত।' মেজো সায়েব চান তাঁর মেয়ের সম্বন্ধ করতে, চাপ দিচ্ছেন। চেষ্টা ত' আমি যথাসাধ্য করলাম; কিন্তু ছেলেটা কি রাজী হবে ? সে যে বিলেত যাওয়ার জন্য পাগল।"

"চার চোখ এক করে দিন" ধনেশ্বরবাবু বললেন—"না পারেন ত' আমায় বলুন। কোন সুযোগে তার নাচটা দেখিয়ে দিতে পারবেন না ? দর্শক মুগ্ধ হয়ে যেত। সারা হল একদম্ চুপচাপ ; সকলের চোখের তৃষ্ণা মিটিয়ে সে যখন নেচে যায়, তখন ভাবের ঢেউ তোলে। আসুন আপনার রামকে, আসছে মাসে ত' একটা প্রোগ্রাম আছে ; দেখবেন সেই ঢেউয়ে রাম কোথায় ভেসে যাবে। আর রাজী

করানোর দরকার পড়বে না।”

“হেঃ, রাম আসবে? সে কি আমাদের মত? সে যে বিলেত বিলেত করে পাগল।”

হরিবাবু বললেন—“আপনি ওকথা বলবেন না; তা'হলে কাজটা সেরেই ফেলুন। জানেন ত'—একটা বিয়ে শেষ করা যা, একটা মন্দির গড়াও তা। বিলেত যাওয়ার কথা ত'? তা, পাড়া যাক না কথাটা মেজো সায়েবের কাছে। ভাল পাত্র পেলে দেবেন না কেন? তাঁর নেই কি? বলেন ত' পাড়ি কথাটা প্রকারান্তরে; কি, পাড়ব না কি?”

“আমার সাহস হচ্ছে না; আমায় না হয় 'কাকা' ডাকে; আমি ত' তাও নিজের কেউ নই।”

তারপর চাকরীর কথা, তার স্থান অস্থান নেই, বেলা অবেলা নেই, নিত্য নতুন দানাপানির ধান্দার কথা, তাতে পরচর্চা আপনা আপনি আসে।

সরোজিনীও টেবিলে বসেছে, তার এক পাশে প্রকাণ্ড শ্যামবাবু, তাঁর খুব খিদে। টেবিলের নীচে মাঝে মাঝে তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব অনুভব করা যায়, কিন্তু তিনি বেশী কথা বলেন না, খেতেই ব্যস্ত। কেবল মাঝে মাঝে তাঁর বড় বড় চোখ থেকে কোণাচে চাউনি চমক দিয়ে যায়, অতৃপ্ত খিদে দেখিয়ে আর্জি করে—খাবার, খাবার, আরও খাবার। ক্ষুধা মেটাবার এই কাতর যাচ্ঞার আড়ালে আসে একটা রহস্যের-ভেক—ক্ষুধাকে ডাকে ক্ষুধা, অতি সন্তর্পণে ডাকে, তার ভিতর থাকে চুরি করে লুকিয়ে লুকিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। কিন্তু সরোজিনী উন্মনা।

অতি যত্নে পরিপাটি সাজগোজ করে সে এসেছিল, তৈরী করে এসেছিল টেবিলে বলবার মত কথা,—টেবিলের ভোজ একটা দুর্লভ সম্মেলন। এত সাজ, সে কি এইজন্য? কেবল খাবার উদ্দেশ্যে?

আসরে আজ যেন সে ফুটে উঠতে পারছে না। একটা ছবির খানিকটা, ছবির মাঝখান নয়, ছবির সবটা ত' নয়ই। সব মিশিয়ে সঙ্গীতে স্বর সমন্বয় নেই যেন, সব গোলমেলে। সে কিন্তু এক বিশিষ্ট ধ্বনি, সে ধ্বনি ঢাকা পড়েছে।

এখানের সে যেন কেউ নয়; নিজে নিজেই ত' আর কেউ বিশিষ্ট হয়ে ওঠে না; অন্যরাও কাউকে বিশিষ্ট করে তোলে। তাদেরই টানাটানিতে তার বৈশিষ্ট্য বাইরে বেরিয়ে আসে। তেমন টানা-

টানি এখানে নেই আজ ; সকলে দুজন দুজন, বা চার চারজন করে নিজের নিজের আলাদা চক্রে আবদ্ধ, সে কেউ নয়। শর্মা নেই, রণজিৎবাবু নেই। বাইরে মেঘ করেছে।

কী তাড়াতাড়ি নিভে যাচ্ছে তারার দল।

ঘনঘোর অন্ধকার, হাওয়া ছুটছে সোঁ সোঁ।

কালো মেঘের আকাশের কপালে যেন সহস্র ফণা লক্ লক্ করে সহস্র ধারায় নিংড়ে পড়ছে বিদ্যুৎ—

চোখে তার ঝলক সওয়া যায় না।

এ যেন এক সংকেত। তারপর আকাশের কত আঁধার কোণ থেকে একসঙ্গে ডিমি ডিমি গম্ভীর রবে ডাকাডাকি করে বেজে উঠল মেঘের ডম্বরু। ঝিলিক দিয়ে উঠছে বিদ্যুৎ। পলকে পলকে পৃথিবী হচ্ছে উজ্জ্বল, আবার আঁধার।

একটা চামচ হাতে বসে আছে সরোজিনীর দেহ। মন উধাও। মন যেন খুঁজছে মাঝে মাঝে মৃত্যুর নিশানা, গাঁয়ের শ্মশান, পোড়া-মাটি, অঙ্গার ; একলা দাঁড়ানো বটগাছটায় শকুনের বাসা। ঢিবির ওপর ফণীমনসা ঝোপের পাশে সিঁদুর লেপা বুড়ী শ্মশানচণ্ডী ; বাজ পড়ল যেন বড়গাছটায়—

কিন্তু কোথায় মৃত্যু ? সামনে বসে লোকে গল্প করছে, ভোজ খাচ্ছে। জ্বলজ্বল করছে জীবন।

দীর্ঘশ্বাস পড়ল সরোজিনীর। মনে পড়ল শর্মা ও রণজিৎবাবু—দু'জনে গেছেন শিকারে। হয় ত' তারই মনোরঞ্জনের জন্য। স্ত্রীলোক দেখলে পুরুষ কত না ফুলিয়ে ওঠে, মাগো ! যেন স্বর্গের চাঁদ ধরে এনে দেবে।

"আপনি কিছু খেলেন না মিসেস দাস।"

"ওঃ খুব খেয়ে ফেলেছি।" সরোজিনী তার নিত্যকার হাসি হাসল—তা টেবিল আলো করে।

□

মাঝরাতে অষ্টমীর একফালি চাঁদ, তার নীচে ভেসে চলে কালো কালো ছেঁড়া মেঘ। তার নীচে মাটি ঢালু হয়ে গেছে, একটা খাল, আকাশছোঁয়া গাছের সারি ; হালকা আলোয় এ সব কখন সতেজ,

কখন নিভন্ত, কখন মিটমিটে।

নির্জন রাস্তায় আগে পিছে চলেছে মোটরগাড়ী। আগের গাড়ীতে পড়ে রয়েছে মিষ্টার শর্মার অচেতন, রক্তাক্ত দেহ ; পাশে বাইরের দিকে তাকিয়ে রণজিৎবাবু।

এই ত' শহরের উপকণ্ঠ, ঘন বেড়া সারি সারি, চেনা পুকুর, পুরনো ইটের ভাঁটা। এরপর কোম্পানীর ফ্যাকটরীগুলো। ছোট-খাট পাহাড়ের মত। মানুষের তৈরী রাস্তা, নীলচে রাস্তা, চেনা বাড়ী সব, চেনা মাঠ। ভিতরে মিষ্টার শর্মার রক্তাক্ত দেহ—বাঁচার আশা আছে কি? বুকে গুলি লাগলেও কি মানুষ বাঁচে? হয় ত' আর ক'টি ঘণ্টা। তারপর কাদা, মড়া। সব যেন মিছে, সব স্বপ্ন। এই ভয়ানক মিছে স্বপ্নের মধ্যে মড়া নিয়ে ছুটেছেন মোটরে রণজিৎবাবু, রণজিৎ নয়, মৃত্যুর দূত।

কি চুপচাপ, জনহীন চারিধার। ভাষা নেই। ভাবনা ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে পুরনো জায়গায়। এ কি সত্য? উজ্জ্বল আলো, নানা রংএর দৃশ্য, সুস্পষ্ট আকার ও আকৃতি; অথচ অন্ধকার, মড়া, রক্তাক্ত দেহ। মোটর ছুটছেই।

সে দেহের তারুণ্য, সৌন্দর্য, চড়া রোদ্দুরে উপলব্যথিত ঝরনার ফেনার মত জীবনের চক্‌চকে উল্লাস—কিছু নেই ; শুধু মলিন চাঁদ, কালরাত্রি।

রণজিৎবাবু পাগলের মত তাকিয়ে—নিজের অজান্তে মাথার চুল টেনে ছিঁড়ছে, কামিজের বুক খোলা ; তবুও শান্তি নেই, কে যেন টুঁটি চেপে ধরছে, মুখে জ্বালা, আর্ত প্রাণ খুঁজছে নিষ্কৃতি—ওঃ ওঃ, কখন শেষ হবে? আর কতক্ষণ?

নির্জন রাস্তা। মোটরের আলো পড়ে বাড়ীগুলো ঝলসে উঠছে, আবার পিছনে পড়ছে। চেনা দৃশ্য, ফটকে নামের ফলক দেখে মনে পড়ছে পরিচিত জীবন—তুফানের মত ব্যাকুলতা বাড়ছে। নিজের বাসার সামনে যেন বন্যায় তিনি ভেসে যাচ্ছেন, দূরে ডিঙ্গি, ডাক শুনে কাছে আসছে না।

এই ব্যাকুল দুঃখের ভিতর মনে পড়ল সরোজিনীকে। মনে পড়ল, সে আর শর্মার সঙ্গে বেড়াতে যাবে না, টেনিস খেলবে না—এই যার মড়া পড়ে আছে—সেই ঢেকে রেখেছিল সরোজিনীকে।

চমকে উঠলেন তিনি। শর্মা কি যেন বিড়বিড় করছে।

সত্যিই কি তাঁর মনের কথা ধরতে পেরেছে? চোরের মত চারিদিকে চোখ বোলালেন রণজিৎবাবু। এ ত' নিছক আত্মগ্লানি, ভয়, চেপে আসছে, ঘাম ছুটছে—দূরে নিভে যাচ্ছে সরোজিনী।

সব মিথ্যা—ভয়ও মিথ্যা। পিছনের মোটরে যারা আসছে, তারা দেখেছে, তারা জানে। গায়ে, মনে জোর জোগাড় করতে করতে রণজিৎবাবু যেন বলতে লাগলেন—"আমি নির্দোষ, আমি দায়ী নই।" কে যেন নালিশ জানাচ্ছে মুখোমুখি, তর্জনী উঁচিয়ে তাঁকে দেখিয়ে। মনের সমস্ত জোর একসঙ্গে করে তিনি জবাব হাঁকলেন "আমি দোষী নই, আমি দায়ী নই।"

"দোষী নয়" নিজের গলার আওয়াজ নিজের কানেই ফাঁপা শোনায়। লোকদেখানো যত যুক্তি বুকের নীচে ভেঙ্গে পড়ছে, মনকে চোখঠারা কি কষ্ট! এই যারা পিছনের মোটরে, তারা দেখেছে—শর্মা আমার বন্দুকটা তুলে দেখছিলেন, তার ওজন, তার গড়ন পরখ করছিলেন বন্দুকে গুলিভরা ছিল, সেফ্‌টিটা কেমন করে যে আল্‌গা ছিল; হঠাৎ ট্রিগারে হাত পড়ল—"বন্দুক লোডেড্ আছে, স্যার"—বলতে বলতে বিকট বিস্ফোরণ, একটা দৈব-দুর্ঘটনা, একটা অ্যাক্সিডেন্ট। ওঃ, তারপর, ভগবান! নির্দোষকে শাস্তি দাও; এমনি করে ঘটাও অকালমৃত্যু! শর্মা সায়েব, দেবতুল্য লোক, আঃ।

কই, নিজের ব্যক্তিত্ব সমর্থন করে না আপন কথা। রক্ত জল হয়ে আসে, প্রাণে ভয়। কেন বন্দুকে গুলি ছিল, কে ভরে রেখেছিল তা? কেন তার সেফ্‌টি আলগা করা ছিল? কেন মনের মধ্যে ছিল কৌতূহলী প্রতীক্ষা? সকালেই কি সূচনা ছিল না সন্ধ্যার? ওই ত' দূরে সরোজিনীর ছায়া—শর্মা হবে গৃধ্র, শৃগালের খাদ্য—ওঃ।

এই যে ডাক্তারখানা, মোটর দাঁড়াল—গম্ভীরভাবে সবাই নেমে গেল। হঠাৎ ব্যস্ততা। ষ্ট্রেচারে শর্মার শরীর বয়ে নিয়ে যাওয়া হল; ফর্সা জামাকাপড়ে গম্ভীর নার্সরা, ডাক্তারেরা। হাসপাতালের বিজলী বাতি—সব অলীক, সব স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের ভিতর শর্মা বিড়বিড় করে উঠলেন—বিকৃত, অস্পষ্ট ভাবে—

"ওঃ, বলে দিও—বলে দাও বলিদত্ত দাসকে, আমি ভুলি নি, তাঁর জন্যে লিখে দিয়েছি। আমারি লেখায় তিনি কোম্পানীর বড় সায়েব হবেন, আমারি লেখায় তাঁর প্রমোশন। বলবে ত?

ফের তুমি এসো, নিশ্চয়।”

মুখ কুঁচকে রণজিৎবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন। এই শর্মা—চোখ বুঁজে রয়েছে, নিঃশব্দ, জ্যান্ত না মৃত? ডাক্তারেরা তার বুকের ওপর ঝুঁকে। সব নিস্তব্ধ। শুধু হাসপাতালের পাখার শব্দ। বাইরে সেই রাত। বেশী অন্ধকার মনে হচ্ছে। সব মিথ্যা, সব স্বপ্ন। তারই ভিতরে পাথরের মত দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু ত্রাহি মিলছে না যে নিজের কাছেই। ভিতরের দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ছে—ধস্ নামছে, সব দমে যাচ্ছে, সব গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। এই কি জীবন? এ কী যন্ত্রণা! চোখ তুলে তাকালে দেখা যায়—সব মিথ্যা, সব স্বপ্ন, বাইরে কি অন্ধকার। স্বপ্ন বলে ভাবলে—জীবন কী সুন্দর, বাঁচার জন্য। খালি ভুলে যাওয়া, পরিণামের ভাগী নই, কর্মফলে বাঁধা নই। অন্ধকারে মিশে শুধু সময় কাটানো—ক্ষয় নেই, বৃদ্ধি নেই; আগা নেই, পিছু নেই। সারা গা শিউরে উঠছে, স্নায়ু সব ঝন্ ঝন্ করছে। শুধু চেতনা নয়, অতিচেতনা স্পর্শ-কাতর; হাওয়ার আল্‌তো ছোঁয়াতেও চমকে ওঠে। রোগজর্জর লোকেই হাওয়ার ছোঁয়ায় আঘাত পায়। নতুন যন্ত্রণার ধারা খুলে গেছে নিজের ভিতরেই। তা চাপা দিতে হবে, লুকোতে হবে; মুছে ফেলতে হবে সে দাগ।

কিন্তু জীবনেও কি সে দাগ লাগে নি?

ধরা যাক্, শর্মা তাঁর কে? কত শর্মাই ত' নিত্য মরছে—কার কি আসে যায়?

মন এই বিশ্বাস গ্রহণ করে না যে! নইলে ত' যন্ত্রণা চুকে যেত। কপালে পোড়া দাগের মত জীবনে কলঙ্কের দাগ। কালকের সকাল আর আজকের সকালের মত সতেজ লাগবে না। মন নীরোগ হবে না। ওঃ, কি যন্ত্রণা!

এই রক্তাক্ত দেহ। ডাক্তারেরা ব্যাকুলভাবে তাকিয়ে, কারা ছুটোছুটি করছে ওধারে। এরা কি শর্মার কেউ? গলার কাছে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ—কলের মুখে জল শেষ হয়ে এলে যেমন হয়। তারপর সব স্থির। ওই ত' শর্মা শুয়ে আছে। তবু, শর্মা নেই।

□

রাতেই খবর চাউর হল। তাঁরা এসে পৌঁছলেন। লাইন করে জনস্রোত সেই শেষরাত থেকে দুপুর পর্যন্ত। দল বেঁধে ডাক্তারখানার প্রাঙ্গণে শুধু মেলা বসানো। একটা কুঠ্‌রী দেখানো নিয়ে কাড়াকাড়ি। আগে যারা এসেছে, তারা দেরীতে আসা লোকদের দেখাচ্ছে আঙুল দিয়ে সেটা। পিছনের লোকে গম্ভীরভাবে এক মিনিট সেটার দিকে তাকায়। শুধু দেয়াল—তার ওপর কত বছরের রৌদ্রবর্ষা ছবি এঁকে রেখেছে। ভিতরে সব সফেদ ঝক্ ঝকে—একটা দরজা, কপাট-বন্ধ ; সেই দিকে তাকিয়ে মনে মনে একটা বিভীষিকার ছবি এঁকে নেওয়া। জীবন্ত একটা লোকের মৃত্যুর প্রতিবাদে গা শির শির করা, এক বিশেষ ধরনের চাউনি ; এক বিরাট সত্যের সামনে মাথা নুইয়ে দু' এক মিনিট গম্ভীর হয়ে থাকা, নির্বাক হয়ে কিছু ভাবার চেষ্টা না করা। তারপর আবার জীবনের বিকাশ, মৃত্যুর মুখোমুখি প্রাণপ্রাচুর্য ঢেউ-এর মত ফুলে ফেঁপে ওঠে। যারা দেখা শেষ করে, তারা পিছনের দিকে যায়, দলে মেশে, পান চিবোয়, বিড়ি সিগারেট ধরায়, মুখ খোলে।

সেই দলের মধ্যে, সেখানে শুরু হয়েছে গালগল্প। সেই আলোচনা চলেছে যাতে বাধানিষেধ নেই। মন খুলে লোকে কথা বলছে। তাতে সত্য আছে, মিথ্যাও—মন-গড়া অতিরঞ্জন, শোনা কথা, অনুমান, সব একসঙ্গে জড়িয়ে দলের মতামত ; আদালতের রায় নয়। সেই আলোচনায় উঠছিল রণজিৎবাবু, বলিদত্ত, শর্মা, সরোজিনী আরও কত নাম, তাদের প্রসঙ্গ। কিন্তু লোক নিজের মনের কলসী সেই মতামতে ভরে চলে গেল ; জানাশোনার মধ্যে কথাটা প্রচারিত হল। সকলেই শর্মা সম্পর্কে হঠাৎ ভারী সচেতন, খুব সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল। বেঁচে থেকে যে ছিল অচেনা, মরে গিয়ে হল সে খুব নিকট, অতি আপনার। সবাই তার জন্য ভাবছে—সবাই 'আহা' বলছে। তার নিতান্ত ঘরোয়া কথা, তা-ও যেন আজ সাধারণের সম্পত্তি, তার সুখদুঃখ সম্বন্ধে দু'কথা বলতে সবাই হকদার। কি করলে কি হত না হত—সেই সব নীতি বাতলাতেও অনেকেই ধুরন্ধর। সে ৯৮রছে, যে একটা

নামমাত্র, একটা প্রতীক, পরস্পরের মধ্যে বাঁধ তোলে, দেওয়াল গড়ে যে, সেই দেহ ; তা ভেঙ্গে গেছে ; সুতরাং, সে এখন সকলের।

ঠিক সময়ে ইঞ্জিন চলল, ফ্যাকটরীতে মাল উৎপাদন শুরু হল, আপিসে গম গম কথাবার্তা, কাজ। যে যার টেবিলে হাজির। বলিদত্তও কাজে ব্যস্ত। ঠিক একটার সময় হেড আপিস থেকে তারবার্তা এলো 'আজ ছুটি।' অফিসে মিটিং হল, স্বর্গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে ছ' মিনিট দাঁড়ানো, দশমিনিট বক্তৃতা। তারপর অকালছুটি উপভোগ করতে সকলে বাড়ীমুখো।

বলিদত্তও বাসায় ফিরল।

নির্জন ঘরে খাটের ওপর—উপুড় হয়ে সরোজিনী কাঁদছে। তার পিঠ যেন ঢেউয়ের মত ফুলছে, ভাঙ্গছে। বলিদত্ত সেদিকই 'মাড়াল না।' অনুভব করল—মাথার ভিতর ঝাঁঝ, অন্তরে দাহ।

এই তার সংসার, এই তার স্ত্রী !

বাইরের ঘরে একলা দুই হাতের ওপর ভর করে মাথা নীচু করে বসে রইল।

□

সরোজিনী বাসা ছেড়ে বেরোয় না ; দেখে এদিকে চাইতে চাইতে লোকে পথ চলছে। দূর থেকে সে আন্দাজ করতে পারে তাদের কৌতূহল, তাদের কথাবার্তা। মাথা নীচু হয়ে যায়।

মুখ খুলে কেউ কিছু বলে না। তবুও নিজের ভিতরে নজর চালালে নিজের সম্বন্ধে দুনিয়ার সব না-বলা কথা শোনা যায়, জানা যায়,—কথাগুলোর সেই মানে, সেই বেগ, সেই ছবি। পাগল হয়ে যাবে, ভয় হয়। কি সে করেছে কার ? কেন সকলের তার ওপর এ আক্রোশ ? কেন এ দোষ দেওয়া ?

দোষ দেওয়াই ত' ! চুপি চুপি, ফিস্‌ফিস্‌ সহস্র কোণ থেকে যেন মুখের বাছির টেট্‌রা। গাঁয়ের কথা মনে পড়ে—ঠিক এই রকম, অন্যদের সম্বন্ধে কেচ্ছা, কত দূর দূর থেকে খবর ভেসে আসে, টুকরির মত ছোট্ট একটুখানি যেন পৃথিবী, কিছু কোথাও লুকোনো যায় না, চাপা পড়ে না, হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় শব্দ, রসালো কথা। গাঁয়ের পুকুর ঘাটে জলে ঢেলা ফেললে যেমন লহরের পর লহর

বিছিয়ে যায়, তীরে এসে লাগে, ঘা দেয়। তেমনি কলঙ্ক রটে, লুকোয় না, ওঃ।

তার সন্দেহী মন প্রমাণ খোঁজে। ওপাশে পশুডাক্তার বাবুর বাড়ীর আঙ্গিনায় তাঁর স্ত্রী এইদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে, কেন আসেন না? মনে মনে হাসেন নিশ্চয়। সরোজিনী ভুলে গেছে যে, তাঁর কাছে উল বোনা শিখে সে এখান থেকে উঁচু মহলে উঠে গিয়েছিল; তারপর আর তাঁর খোঁজখবর নেয় নি, তিনিও আর আসেন নি। কেউই আর আসে না, মিলি নিলিও। কি তাড়াতাড়ি তারা তাকে পর করে দিল? সরোজিনী ভুলে গেছে যে নিজে আর "সমাজ" অঞ্চলে যায় নি; এখানকার সমাজ দূরে রয়েছে নিজে নিজেই। মিলি চিঠি লিখেছিল "আর 'রোজ' বলব না তোমাকে, তুমি মূর্তিমতী 'সরোজ'। তোমার নিষ্ঠার সাধুবাদ নিশ্চয় দি; তবুও 'হে বন্ধু! বিদায়'।" কি এর অর্থ? কি বলাই বা বাকী?

চিরদিন অবিচলিত নিতা—তার মুখের দিকে তাকালে মনে হয়—তার স্থির মুখোসের পিছনে সেই একই দোষ দেওয়া অভিসন্ধি খেলছে। নিতা কি ভাবে? পাড়ায় হাট বসাচ্ছে নিশ্চয়, যদিও সামনে নির্বাক। সেসব কথা বলতে বলতে তার মুখের ভঙ্গী কেমন হয়? কি বীভৎস উল্লাস, কি অশ্লীল ভ্রূকুটি! আন্দাজ করা যায় তা। সরোজিনী শিউরে ওঠে। তেমনি ত্যাঁদোড় ছোঁড়া হর্ষা। সত্যি মিথ্যে ফেঁদে কত কথাই না বলে বেড়াচ্ছে। চুপ শয়তান। বিনা কারণে সরোজিনী তাকে বকত, ধমকাত। এখন ইচ্ছে হয় পিঠে বসিয়ে দেয় দু'চার ঘা—দুমদাম, ফের ভয় করে বলিদত্তকে।

সত্যই ভয় করে। যেন গাঁট্টাগোট্টা ছোট মানুষটিও সেই একই ঘরে বন্ধ। তার প্রহরী ওই গাঁট্টাগোট্টা লোকটি, নিজে সেই তাকে বন্দী করেছে; হয় ত' ভয়ঙ্কর একটা কিছু করে বসবে। বুকে যেন দুমদাম ঘা; ওর মুখের দিকে তাকালে রক্ত শুকিয়ে যায়। ওকে দেখায় খুব গম্ভীর, ভারী ব্যস্ত; কথাবার্তার ফুরসত নেই। রাতে কোথায় যায়, দেরী করে ফেরে; মাঝরাত পর্যন্ত ওধারে আলো জ্বালিয়ে মুখ নীচু করে কাজ করে। সরোজিনী বিছানা চেপে পাশ ফিরে পড়ে থাকে, দেখে—"উনি" এলেন, পাশ ফিরে শুলেন। থেকে থেকে দু'একটা দীর্ঘশ্বাস, তারপর ঘুম। হয়ত এমনি চলত আগেও—বলিদত্ত কাজের লোক। নিজের কাজে ব্যস্ত, স্ত্রীর কাজে মাথা গলানো দরকার মনে করে না। কিন্তু এখন সরোজিনীর কাছে

স্বামী যেন ভিন্ন একটা লোক—সে জেনেশুনে গম্ভীর রয়েছে কষ্ট দেবার জন্য, মৌকা খুঁজছে ঝাঁপিয়ে পড়ার। বারংবার সরোজিনী মনে মনে স্বামীর বিরুদ্ধে তৈরী করে, আত্মরক্ষার জন্য কত হিংস্র ভঙ্গী, কতরকম কথার বজ্রবাণ। দাঁত ছের্‌কুটে, লেজ ফুলিয়ে, রোম খাড়া করে, নখ বের করে। বেরাল যেমন কুকুরের সামনে সশস্ত্র, সজাগ ভঙ্গীতে আত্মরক্ষা করে তেমনি। কিন্তু সরোজিনী বলিদত্তের মুখোমুখি চাইতে পারে না। বলিদত্তও তাকে যুদ্ধের সুযোগ করে দেয় না। তার ঠাণ্ডা উপেক্ষা ভয় জন্মায়। মনে মনে সরোজিনী অনুভব করে যে, তার ব্যক্তিত্ব ভেঙে পড়ছে। অবশেষে সেই ভাঙ্গা ব্যক্তিত্বই তার একমাত্র আশ্রয়। ঘরের কোণে নিজের ঘা নিজেকে চাটতে হয়। কান পেতে, তেরছা চাউনি হেনে পড়ে থাকা। সে অবস্থায় শরীর শুকোয়, খিদে কমে, মাথা ব্যথা করে, গা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করে, বিছানা জ্বালা ধরায়, ঘুম হয় নাপাত্তা। ক্লান্ত হয়ে বিছানা আঁকড়ালে মাথা দপ্‌দপ্‌ করে, অবেলায় যখন দুর্বল দেহে ঘুম বাইরের চেতনা নিভিয়ে দেওয়ার কথা, তখনও, উজ্জ্বল দিনের আলোয়, প্রকৃতি দেয় আঁধারের আশ্রয়। সে চমকে ওঠে, ঘুম ছুটে যায়। বীভৎস দুঃস্বপ্নের রূপান্তরিত চেতনার শেষ প্রবাহ জাগ্রত মনের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে। দুরু দুরু বুক, ঘাম ছুটছে। বেসামাল সরোজিনী নেতিয়ে পড়ছে—অনুভব করছে জীবনের নতুন স্তর, হাড়ে হাড়ে বুঝছে, শোওয়া মানে যন্ত্রণায় হিঁচড়ে মরা, জাগা মানে যন্ত্রণার জীবন্ত জ্বালা।

মনে পড়ে কিশোরী বয়সে দুপুর বেলা শুনত বুড়ীদের মুখে পুঁথি-পাঠ ও ব্যাখ্যা। ভাবছে—সত্যি তাহলে স্বর্গনরক আছে। বাঁচার এই ছট্‌ফটানি, হলাহল, এই কি রৌরব নরক নয়?

ভাবনা মিইয়ে যায়।

আলুথালু হয়ে কোনওরকমে বেলা পার করে যদি কখনো আসে আত্মঘাতী চিন্তা, হাত তবু ওঠে না, মনের জোর তাল রাখে না হৃদয়ের আবেগের সঙ্গে। প্রকৃতি ব্যাধি দূর করার জন্য নতুন ব্যাধিরা সৃষ্টি করে; সরোজিনী সব কথা ভুলে যায়, দুশ্চিন্তা ভুলে যায়, অভ্যাস ভুলে যায়। তবুও তার দেহজগতে সৃষ্টি চলে—নতুন রসের প্রবাহ, নতুন প্লাবন, নতুন বিপ্লব—কানা গলি থেকে উত্তরণ আলোর পথে, রোগ থেকে রোগমুক্তি।

এমনই করে একদিন—বাইরে চেয়ে থাকতে থাকতে অনুভব

করল—তার দেহের ভিতর এক রক্তমাংসের চলন্ত প্রাণ। খণ্ড খণ্ড স্বপ্ন যেন একত্র হয়ে বাস্তব হয়ে উঠছে। সাজগোজ করে অবয়ব পরিগ্রহ করছে। নতুন অনুভূতি—নিজের ভিতর, ফের বাইরেও। কখনও তার কল্পনা হয় আধেয়, কোন সুখের মুহূর্তে, দুঃখের বল্কল খুলে ছুঁড়ে ফেলে বের হয়ে আসছে তেজীয়ান হয়ে, তার নিজের রক্ত তার আঁধার, যত তা সেই আঁধারের ভিতর ভেসে ভেসে খেলে বেড়াচ্ছে, তত দিয়ে যাচ্ছে সুখের অনুভূতি, তেজের, জীবনেরও। উপলব্ধি করছে—সে সৃজনময়ী নারী, সৃষ্টিশক্তিতেই সে গরীয়সী। চোখে ভাসছে নতুন পাতা, সবুজ গাছলতা, সৃষ্টির বিবিধ বর্ণ। অনুভব করছে নিজের ভিতর বর্ষণব্যগ্র মেঘের উগ্র উত্তপ্ত কামনা, তা পরিণতি খোঁজে পৃথিবীকে চিরশ্যামলা করতে ফোঁটা ফোঁটা বর্ষার ধারায়। আবার কখনো মনে হয় স্থূল দেহ-সমেত সে নিজেই আধেয়, তার অন্তরের নবসৃষ্টিই তার আধার। আপনার অস্পষ্ট সৃষ্টির কোলে আত্মসমর্পণ করে ছন্দে ছন্দে সে বেড়ে ওঠে। কোথায় শোক, কোথায় দুঃখ? শুধু জীবনের খেলা! ক্ষণে ক্ষণে অজানা প্রতীক্ষায় সুখের জোয়ার চেপে আসে। সরোজিনী নিজেকে আদর করে, পরিপূর্ণা হয়ে ওঠে। কাউকে আর তার দরকার নেই। শুধু সে আর তার অন্তরের সূচনাভরা অস্পষ্ট সৃষ্টি, যা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জড় স্নায়ুতে, আবার অতীন্দ্রিয় চেতনাশক্তিতে বারংবার বার্তা পাঠায়—'আমি এসেছি, আমি আছি।'

কার সে?

চিন্তায় মেঘ ভাসে, আবার দীর্ঘশ্বাসে তা উড়ে যায়; উড়ে যায় জীবনের অনুভূতি, সমুদ্রের কত মন্থনের কলরোল। অল্প সময়ের মধ্যে সে সংসারকে চিনেছে খুব, চিনেছে বহু লোক, বহু পরিস্থিতিকে। আজ ঝিনুকে পড়েছে কিংবদন্তীর বর্ষাবিন্দু, ঝিনুক বুঁজে যাচ্ছে।

কত মেঘ এসেছে, কত মেঘ ঢেলেছে তার ঐশ্বর্য, কত মেঘ চলেও গেছে—তাতে তার কি আসে যায়?

শর্মা—গাঢ় দুঃখ-ভোলা অলীকতা, যেন সে ওপারের কথা, স্বপ্নের ব্যাপার।

রণজিৎবাবু—সেদিন বলিদত্ত এসে খবর দিল যে তিনি ছুটি নিয়ে গেছেন, কি একটা অসুখের দরুন। হয়ত—। কাঠের পুতুলের

মত তার গায়ে সে কথার শব্দ এসে লেগে ফিরে গিয়েছিল, তার বিভোর মনের অসংখ্য উজ্জ্বল বিন্দুর সমষ্টির ভিতর ঝক্ ঝক্ করে ছিল কয়েকটি আগুনের ফুল্‌কি; তারপর তা আবার নিভে গিয়েছিল।

আরও কত বাবু, আরও কত সায়েব, সমাজচারীর দল; ক্রমে তাদের কথা ভুলে গেছে সব। সকালে উঠে যেমন লোকে ভুলে যায় দূর অন্ধকারের মশার পালের মত—রাতের কথা মনে নেই আর, নেই মনে মশার কামড়ের কথাও।

যারা এসেছিল তারা সৃষ্টির ছায়ারূপ, দলে দলে এসেছে, চলেও গেছে যুগে যুগে। রয়ে গেছে তাদের গুণনীয়ক; প্রকৃতির মায়ার সত্যের ভিতরে দুটি প্রাণী—নর ও নারী; এখানে নয় ত' ওখানে, তা শুধু ঘটনাসূত্রে; হেথা না হলে হোথা হতে পারত। ক্ষেত্র গ্রহণ করেছে বীজ, ক্ষিতি পেয়েছে অঙ্কুরের উষ্ণতা, সৃজনের প্রতীক্ষা তার প্রকাশের জন্য। গর্ভাধানের আগ্রহে গর্ভিণী মাটি পরিচয় খোঁজে না বীজের; সে পরিপূর্ণা—এই ত' যথেষ্ট; মাটি পেয়েছে তার নিজস্ব পরিচয়—সে সৃষ্টির অফুরান খনি, সে বসুধা—তারপর তার মৃন্ময়ী মায়ার স্বপ্ন, ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময়, ক্ষণে ক্ষণে পরিব্যাপ্ত আনন্দ—লোকে চলে গেছে, ছায়ারূপ মিলিয়ে গেছে, যাক্ তারা, সে ত' আছে। অন্তরে তার যা আছে, তার নাম নেই, জাতি দেশের সংকীর্ণতা নেই। সরোজিনী ফিরে পায় নতুন ব্যক্তিত্ব।

আশ্চর্য লাগে এই অননুভূত জীবন, দুনিয়ায় অবস্থিতির অসংখ্য স্তর বিন্যাস। নিজের বিচিত্রতায় সে মুগ্ধ হয়ে এলিয়ে পড়ে, তার স্বপ্ন অটুট।

□

বলিদত্ত যেদিন জানল যে তার বংশধর স্ত্রীর গর্ভে, তার সীমা রইল না আনন্দের। হঠাৎ যেন এক হেঁচ্‌কায় তার এতদিনের সংকোচ ফালা ফালা হয়ে গেল। তার পুরনো ব্যক্তিত্ব, আগের মত স্ত্রীর সামনে পাখ্‌না ঝেড়ে বক্তৃতা শুরু করল— "জানো সরোজ, এত দিনে—"

ঐ ত' সে আরসির সামনে কামাতে বসেছিল। ডাক্তারনী কিছুক্ষণ

আগে চলে গেছেন, হেসে হেসে বলে গেছেন—“একটু কাহিল হয়ে গেছেন ; প্রচুর কমলালেবু খেতে দিন ; অষ্টোক্যালসিয়াম বড়ি, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স—বুঝলেন, আর এই যা আমি লিখে দিলাম। আর প্রেস্টাবটা অন্তত মাসে একবার—”

সরোজিনীর স্বাস্থ্যের বিচিত্র ধারা দেখে সে কর্তব্যের খাতিরে ডাক্তারনী ডেকে এনেছিল—কিন্তু এহেন খবর !

আয়নায় দেখা যায় আপন গোল মুখটি—গামলার মত বুকের মধ্যে সে নিজেকেই খুঁজে পায় ; হঠাৎ খেয়াল হল, গোঁফটা বাড়তে দিলে হয় ; অন্তত আজ আর তা ছেঁটে কাজ নেই। দেখেছে অন্যদের—গোঁফ বাড়ায় মুখে একধরনের বীরত্ব ; এই সে, সর্ববিষয়ে কৃতকার্য।

“বুঝলে সরোজ, আমি বড় দুঃখিত। কাজকর্মের চাপের মধ্যে তোমার দিকে নজর দেওয়ার সময় করে উঠতে পারিনি। বেড়াতে নিয়ে যেতে পারিনি তোমাকে কোথাও ! তবে এটা আমার জানা উচিত ছিল। দেখ—আমার কুষ্ঠিতে লেখা আছে—এই উনচল্লিশ বছর বয়সে পুত্রলাভ, স্থানান্তর, পদোন্নতি ; স্ত্রীঅঙ্গে সামান্য পীড়া—সে ত' তোমার কেটে গেছে। আমার সব পরিশ্রমের চূড়ান্ত পুরস্কার-সহ জন্ম নেবে এই ছেলে ! জানো তুমি ? আমরা বড় সায়েব হচ্ছি বোধহয় ; বড় সায়েব ! আন্দাজ কর ত', কি ? ওঃ সরোজ, সরোজ !”

মুখ নীচু করে আধ হেলান দিয়ে সে বসেছিল—লজ্জা লজ্জা করছে, মুখে আধ-আধ হাসি ; এমনি হয় ; অবিকল এমন হওয়াই স্বাভাবিক। ভাগ্যবতী সেই ত' এনেছে তার সৌভাগ্য—নয় ত' কে ? অতি আপনার সে—এক মন এক আত্মা ; ঘরকন্না সব এই জন্যই ত' ! এ তার স্ত্রী।

বলিদত্ত দাস চেয়ে থাকে, মুখ হাসি-হাসি। তার চোখে সেই সনাতন স্বামীর মোহ অঞ্জন, তার ভিতর কিছুটা তার আপন আত্মবিশ্বাস, কিছুটা মনগড়া স্বপ্ন ; বাঁচার জন্য প্রত্যেক অবস্থাকে নিজস্ব করার, খাপ্ খাইয়ে আপন করার জন্য প্রকৃতিদত্ত দান ; কিছুটা তার কামনা, কতক সেই অতি চেনা দেহের মোহময় আকর্ষণ। সে স্বামী—স্ত্রীকে অন্ধবিশ্বাসে ভালবাসাই তার মনের সহজ প্রবৃত্তি, অবিশ্বাস করা নয়। আরসিতে তার গোলমুখ, গোলগাল গড়ন,

হাতটা তুলে টিপে মাংসপেশী পরখ করে সে, না হলই বা গোল, মোটা ত' !

"এই হর্ষা, তেল মালিশ কর্" বলিদত্ত হাঁক্‌ল তার হুকুম ; আবার চেয়ে রইল সরোজিনীর দিকে। তার দেহে যে কোন উপায়ে জোর আনা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে নিতাকে ওষুধের জন্য বাজারে পাঠাল "আর ভাল লেবু আন্‌বি একটাকার—হ্যাঁ।"

"নিজ দেহের যত্ন নাও, সরোজ ! নিয়মিত ওষুধ খাও না হলে বাচ্চা বাড়বে না। এতে লজ্জাভয়ের কিছু নেই—অতি সাধারণ কথা। কিন্তু যত্নে হেলা করা চলবে না। যা হয়, আমাকে বল। সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। কিন্তু ডাক্তারকে রোগী সাহায্য না করলে চলবে কি করে ? অবশ্য, এ একটা রোগই নয়, মনে রাখো ; মানে, শুধু শুধু ভয় পেও না।"

গল গল করে সে একসঙ্গে একগঙ্গা বকতে চায়, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি, সে অনেক কথা, নিজের মধ্যে হুড়মুড় করে পরিষ্কার ভাবে কিছু বেরোতে পারে না। আবার শোধ্‌রাতে হয়। ঘুরছে তার মাথার ভিতর নিজের কাহিনী, জীবনের সন্ধিক্ষণ মাত্রেই এমনি ঘোরে ; সে প্রচুর টাকা জমিয়েছে, দানাপানিতে বেধড়ক ; চাকরীতে ওপরে ওপরে উঠে, হতে বসেছে চূড়ান্ত, সায়েব। কিন্তু বংশধর অভাবে টাকাকড়ির উদ্দেশ্য মূলে হাভাত্ ; খ্যাতিতে ছিল না প্রসারের ডোর।

"বেশী পরিশ্রম কোর না। ক্লান্ত লাগছে ? শুয়ে পড় তাহলে। সকাল হলেই বা কি ? তুমি আরও একটু ঘুমিয়ে নাও। আজ আমার তাড়া নেই। তোমাকে ওষুধ খাইয়ে, তারপর যাব। তুমি ঘুমোও।"

সরোজিনী সত্যিই শুয়ে পড়ল। এই তার স্বামী—হঠাৎ ইচ্ছা হল প্রাণ খুলে কাঁদে। বালিশে মুখ গুঁজড়ে দিল।

"না, চিৎ হয়ে শুলে ভাল লাগবে। আরে, ভুলে গিয়েছি যে-মোটরের বিষয়ে আজ শেষ কথা পাকা করতে হবে। নইলে তুমি একটু হাওয়া খেতে যাবে কি করে ? আচ্ছা, আজই সব ঠিক করে ফেলব। তুমি এখন বিশ্রাম কর ত' !"

□

উড়ে চলে যায়, রোজকার জীবন, জীবনের বড় কেতাবের পুরনো হলদে পৃষ্ঠার মত; নতুন পাতা খুলতে হয়। কখনো নতুন অনুভূতি পুরনোর সাদৃশ্য আনে, সেই দণ্ডপ্রহর, সেই পরিচিত দৃশ্য, মনে তেমনি ভাব, যেন সত্যিই গোটাটাই সেই মত। কিছুক্ষণ অতীতে কাটিয়ে হঠাৎ সেই শুকনো পাতা আবার—চোখের সামনে দলা পাকিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ে। বিকল অনুশোচনার ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস—সৃষ্টির শক্তি নেই তার, শুধু স্মৃতির তর্পণ। যত গুমরোলেও অবিকল প্রতিফলিত হয় না স্মৃতি—ব্যবধান রচে মাঝখানে ঘন সময়ের স্রোত।

নিজস্ব মোটরের নরম পিছনের সীটে বসে ভাবে সরোজিনী—হেলান দিয়ে। সামনে ড্রাইভারের কাছে বলিদত্ত। গাড়ীর কায়দা কানুন আয়ত্ত করতে তার উচ্ছল কৌতূহল; বারবার ড্রাইভারকে জেরা করে চলেছে। সে চায় নিজে ড্রাইভ করতে শিখবে।

এ হল মিষ্টার শর্মার গাড়ী। শর্মা মারা যাওয়ার পর, তাঁর দেশ থেকে লোক এসেছিল, অতি সস্তায় বেচে দিয়ে গেল সব জিনিষ। বলিদত্ত কিনেছিল গাড়ীটি।

"বুঝলে সরোজ, খুঁজছিলে রণজিৎবাবুর গাড়ীর মত গাড়ী; এই নাও, তার চেয়েও ভাল, স্বয়ং মিষ্টার শর্মার গাড়ী। আহা, বেচারার কি শখ ছিল; কে কেনে, আর ভোগে লাগে কার! এই ত' দুনিয়ার রীতি। যা হোক, আমার হাতে পড়ল—শর্মা বেঁচে থাকলেও দেখে খুশী হতেন। নয়ত আর কেউ কিনে নিতে পারত।" গাড়ীর সঙ্গে এসেছিলেন একজন পশ্চিমা কণ্ট্রাকটর ভদ্রলোক, বললেন—"ঠিক হ্যায়, আপন্‌দের মন ত' খুস্, দেবীজির মন খুস্ হলে মান্‌ব হামারা মেহনত্ সার্থক। কুল্ গ্যারহ্ হাজার রূপয়া; থোড়া কম পড়া।"

সেই তার 'নিজস্ব' মোটর—'নিজস্ব!' কার তা? শর্মা ত' গেছেন, বলিদত্ত ত' দামের টাকা দেয় নি। যে টাকা দিল, সে শোক করছিল—'কুল্ গ্যারহ্ হাজার'—আর তার সঙ্গে দেখা হবে কি না কে জানে; কারণ বলিদত্ত বদ্‌লি হয়ে যাচ্ছে। গাড়ী যে ব্যবহার করে, গাড়ী তার, তার 'নিজস্ব।'

সবই তেমনি আছে—সেই গাড়ী, সেই সোজা রাস্তা ; লম্বা রাস্তার দু'পাশে সারি সারি পুরনো গাছ। সেই বেলা পড়ে আসা, যখন প্রাণীমাত্রেই ঘরে ফেরার মন ঝোঁকে, বাসায় ফিরতে পাখীর মন ব্যাকুল হয়। সামনে তাকিয়ে সে আন্দাজ করতে পারে আগে কি আছে। কিছু দূরে কোম্পানীর একটি করাত্‌কলের ছোট ডিপো, তার পাশ কাটিয়ে বনের মধ্যে কোম্পানীর একটা বাংলো, রাস্তার পাশেই তার আঙ্গিনা। তার মধ্যে কি আছে তা-ও অনুমান করতে পারে সে—ঢুকবার পথের দু'পাশে কলমী আমগাছের চারার ঝোপ, তারপর গোলাপবন অযত্নে বেড়ে বেড়ে লুটিয়ে পড়ছে—অপর্যাপ্ত ফুল। ভাবতে ভাবতে পিছনে ফেলে আসে সে বাংলো, দীর্ঘশ্বাস ফেলে সান্ত্বনা লাভ করাও গেল না। একসারি শালগাছের গুঁড়ি দেখা যাচ্ছে, বাঁ ধারে অর্ধেক খোলা ছোট একটা পাহাড়। কে বলেছিল—এই সময় সেখানে ভালুক বেরোয় ; ছাড়া ছাড়া ঠুঁটো জঙ্গলের ভিতর এখানে সেখানে এক একটা কালো পাথর দেখতে দেখতে সরোজিনী বারবার জিজ্ঞেস করে—"ওই দূরে, ওটা কি ভালুক ?"

"কৈ ?" ঘাড় ঘুয়ে আসে, গায়ের ওপর তপ্ত নিঃশ্বাস—কার ? কৈ, কেউ ত' নেই।

এরপর পাথর-ভাঙা ডিপো। কুলি বস্তি থেকে দূরে পাহাড়ের কোলে ছোট বাংলোটি। পিছনে জলের দহ, টিবির ওপর হিঙ্গল গাছে কোন বুনো দেবতা। গাছে বাঁধা আছে লম্বা একটা বাঁশ, তার ডগায় সাদা নিশান, রাস্তা থেকে তা দেখা যায় ; জায়গাটার নিশানা। বাংলোর পিছনে দহের ওপর উঁচু পাথর, বকুল গাছের ছায়ার নীচে সেই পাথরের ওপর বসলে দহের জলে সূর্যাস্তের শোভা দেখায় চমৎকার, মাছেদের খেলাও।

একটা থেকে আর একটা কথা মনে পড়ে। নেমে আসে পুরনো ভুলতে-বসা স্মৃতি, তা ফুলের মতই ফুটে ওঠে, তারপর, আর নেই ; ভানুমতীর খেল্ খতম্।

শর্মা নেই, রণজিৎ বাবু চলে গেছেন—জীবনে থাকা না থাকার মত ; দুনিয়ায় এত লোক, সবাই কি সকলের পক্ষে জীবন্ত ? রাস্তার ধুলোর সঙ্গে স্মৃতি মিশে যায় ; ক্ষণে ক্ষণে যত পরিচয়ের, চেনাজানার অসংখ্য লোক, সড়কের অগণিত ধূলিকণা, বাছাই করা যায় না। আর জীবনের বিশিষ্ট অনুভূতির যত পর্যায়, কোন সময়

কি সম্পর্কে, কিভাবে, কি রঙে রাঙা হয়েছিল দিবারাত্রির জীবন, তা-ও যেন ভুল হয়ে যায় এই রাস্তাধারের ছোট ছোট বাংলোর মত। জীবনের স্তর, পথ পাশে চটি; সে ঘর থাকবে, পথিক আশ্রয় নিতে আসবেও—কিন্তু যে গেছে সে গেছে।

সন্ধ্যা নিকটে, চেনা জায়গার সংকেতগুলো নিবু নিবু হয়ে বিদায় নিচ্ছে—এরপর নীরন্ধ্র অন্ধকার, শুধু মোটর ছুটছে। সরোজিনীর দুঃখের ভাবনা পুঞ্জীভূত হল শেষ প্রতিরোধে, চেপে বসা অনুশোচনার হাহাকারের বিরুদ্ধে এ যেন তার জৈবী ব্যক্তিত্বের প্রতিক্রিয়া। কে বলে—সব শেষ? তার দেহ আছে, স্বাস্থ্য আছে, প্রাণপ্রাচুর্য আছে, সবার ওপরে আছে জীবনের সঙ্গে তার সম্বন্ধের স্বর্ণসূত্র—তার অজাত সন্তান। সেই সে—যে অনাহূত হয়েও তাকে চঞ্চল করে, উদাসভাব ঘুচিয়ে মনে আনে নানারংয়ের কামনার লহরী, বাসনা পরিতৃপ্তি পায় কল্পনায়।

অন্ধকারের সঙ্গে নিজের ওপর উজাড় হচ্ছে সেই কামনার জ্বালা—মাংসাশী জন্তুর দৃষ্টির মত জ্বলে উঠছে তার চাউনি। শর্মা গেছে—কিন্তু এই ত' রয়েছে তার মোটর সরোজিনীর জন্য। শর্মা গেছে—কিন্তু সে ত' আছে। ভোগের উপকরণ এই সারা দুনিয়া—অথচ ভোগের দক্ষতা শুধু নিজের মধ্যে; অতএব, শর্মা যাক, রণজিৎবাবু যাক, নিমিত্তের বন্ধন নিয়ে বসুধা পূর্ণ থাকবে চিরদিন, যত দিন সে নিজে থাকবে অগ্নিসমা।

তপ্ত ভূমির মত সে সব শুষে নিতে চায়; অফুরান মাতৃরূপা নারীর এ তৃষ্ণা—একবার যদি সে সচেতন হয়, শুষে নিতে চায়। কিন্তু কাকে? অন্ধকার রাস্তায় সোঁ সোঁ ছুটছে মোটর। আলোয় আলোময় যত রাস্তা খুলছে, তত রাস্তা শেষ হয়েও যাচ্ছে—তবুও সামনে খোলা পড়ে আছে আরও রাস্তা।

ঝাঁঝ-ভরা দেহে তপ্ত নিঃশ্বাস পড়ছে—সরোজিনী ভাবনার রাশ টানতে চাইল। মনে মনে সে চলে গেল সেই পুরনো শহরে, চোখের সামনে ভাসছে আগেকার সেই ছোট বাসা, সামনে রাস্তার ওপাশে কলেজ ছাত্র, কসরৎ করত, বাঁশী বাজাত। কখনো কেউ এসে ডাকত; আর একজনকেও মনে পড়ে—থালা হাতে দোরে দোরে ঘোরা ভাট—ওপরওলা মহাপাত্র; তখন সে শুধু দেখেছিল, মনের দরজা কেঁপেছিল কিন্তু খোলে নি; মনের গহনে সূচনার ব্যাখ্যা খুব বাস্তব হয়ে ঘা দেয় নি, শুধু ছুঁয়ে গিয়েছিল। অতীতের ঘটনা

আজকের নতুন চোখে দেখে বুঝছে—তাতে ছিল স্পষ্ট উদ্দেশ্য—মন কেমন করে সেই সূত্রপাতের জন্য।

এবার ফেরার পালা, সেই শহরে বদলী হয়ে যাবে; কিন্তু পরিস্থিতি আলাদা; সূচনা রয়েছে সেখানে, সে নিজেও আছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ—

রাত প্রায় ন'টা; শহরের আলোগুলো চলন্ত মোটরের পানে যেন ধেয়ে আসছে, যেন গলায় পরিয়ে দেবে আলোর মালা। বলিদত্ত হাঁক দিল—"ঘুমোচ্ছ না কি, সরোজ ?"

"না—"

"উঠেছ তবে ? সারা রাস্তা খুব চুপচাপ, বেশ বিশ্রাম হয়েছে—কি বল ? আচ্ছা, বিশ্রাম কর যত খুশী—ডাক্তার তাই বলেছে। তোমার যেমন শরীরের অবস্থা, তায় এত দূর বেড়ানো; যা হোক্ নতুন মোটর কাজ দিল গোড়া থেকেই। লোকে বলে—এ মোটরে এক গ্লাস জল রেখে চালালেও একটুও চল্‌কাবে না, এমনি এর গড়ন; তুমি কি বল, তোমার কেমন লাগল? বাসা ত' এসে গেল।"

ঐ দেখা যাচ্ছে, পরিচিত বাড়ীগুলো—বলিদত্তর আপিস, এর পর গাঁয়ের কাছে সরু রাস্তা, তার দুপাশে বাড়ী, তার প্রায় শেষ দিকে বলিদত্তর আগেকার বাসা; ঢুকতেই কমলা লেবুর গাছ, পেঁপে; একপাশে রান্নাঘর, বৌ সরোজিনীর কর্মস্থল। পুরনো পুকুরে পানাভরা; ভিজে গন্ধের মত মনের ওপর চেপে বসে সেই পুরনো জীবনের শান্তি।

চোখ বুঁজে আসে।

গোজাতির মত নিরীহ জীবন—চোখ ধাঁধানো নয় অবশ্য, তাতে ছিল না প্রশ্নের, সমস্যার তৃপ্তিহীন উনপঞ্চাশ বায়ুর সৃষ্টি করে তার পিছু পিছু লোক-দেখানো উদ্‌ভ্রান্ত দৌড়ঝাঁপ; অনেক কথাই ছিল না তাতে, তবু তা ছিল রুচিকর। সরোজিনী চোখ খুলল; বাঁয়ে সেই চেনা রাস্তা, পিছু ফিরে সরোজিনী চেঁচিয়ে বলল—"ওদিকে কোথায় ? রাস্তা ভুল হচ্ছে যে, এই ড্রাইভার, বাঁয়ে রাস্তা, পিছনে ফেলে এলে—"

গাড়ী তবু এগিয়ে চলল। হো হো করে হেসে উঠে জবাব দিল বলিদত্ত—"ঠিক আছে, ঠিক আছে; হেঃ হেঃ সরোজ। আবার ফিরব নাকি সেই সরু গলিতে ? ভুলে যাচ্ছ—তুমি কে ? ঐ আগে

বড়সায়েবের কুঠি, আমাদের কুঠি; আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেছি। ওদিকে কোথায় যেতে? এই ত' আমাদের আস্তানা।"

সরোজিনীর সারা গায়ে চমক; তাই ত', তার শ্রেণী বদ্‌লেছে। সোজা হয়ে উঠে বসল সে—কঠোর কর্তৃত্বের ভঙ্গীতে তাকাল সামনের দিকে—বড় ফটকটার দিকে।

□

আপিস-ঘরের লাগাও একটি ছোট বাগান; তার পিছনে খুব যে যত্ন নেওয়া হয়েছে, তা নয়; তবু তা কোম্পানীর বড়আফিসের আভিজাত্যের চিহ্ন। সেখানে বসবার জন্য পাথরে তৈরী আসন, বেড়াবার জন্য বাঁধানো রাস্তা; ইচ্ছে হলে যে কেউ ঘুরে ঘুরে সেখানে ধুলো খেতে পারে; কারণ, বাগানের আধমানুষ-সমান উঁচু কাঁচা বেড়ার ওপাশে গ্যারেজে যাওয়ার রাস্তা, সব গাড়ীই সেই পথে যায়। যার সময় আছে হাতে, সে ঘুরে ফিরে বাগান দেখতে পারে—সরু রাস্তার জালের মাঝে থোকা থোকা আধমরা ঘাস, এক থোকা গোল ত' এক থোকা ত্রিকোণ, কোনটা চিড়িতন ত' কোনটা পানের আকার; যেখানে আকার অস্পষ্ট, মালী বুঝিয়ে দেবে—এটা ময়ূরের মত ছাঁটা, এখানে হাতীর চেহারা। এক এক জায়গায় টবে নির্জীব কিছু শৌখীন গাছ; এখানে সেখানে মরশুমী ফুল, ভালো ফোটেনি, একপ্রস্ত টগরের ঝোপ, কিছু লাল কল্কে, পাতায় ঝাঁকড়া জবা, বেড়ার ধারে ক্যানার ঝাড়—তার আধ্ শুকনো পাতার মধ্যে ডাঁটা উঁচু করেছে গোল গোল ফলসুদ্ধ মাথা। কোথাও বা মরে যাওয়া গাছের ঠুঁটো গোড়া। মালী কৈফিয়ত দেয়—'এতদূর জল আনা কষ্ট, বয়ে আনা মুশকিল, তার ওপর বাবুদের গা নেই; কোম্পানীর কত টাকা কতভাবে যাচ্ছে, অথচ এখানে খরচ করতে'—তার ওপর, ছাগলের উৎপাত; মালী দেখায় প্রমাণ—কাঁচা বেড়ার মধ্যে বড় বড় ফাঁক; মালী সেখানে গুঁজেছে কিছু কিছু বাখারি, চাঁচাড়ি। মালীর মতে তারও শত্রু আছে—নিরালা দুপুরে ঝুড়ি নিয়ে জ্বালানি জোগাড় করতে কতক চেংড়ি ঘুরে বেড়ায়! এই হল বাগান—এতে একটা বড় ফটক, তাতে তালা দেওয়া।

বাগানের পরিকল্পনায় ছিল যে, কাজের মধ্যে হাঁফিয়ে ওঠা কর্মচারীরা এখানে ঘুরে ফিরে, চোখ ও মন তৃপ্ত করে নতুন উৎসাহ পাবে বিশ্রামের পর। কিন্তু আসন ছেড়ে উঠতেই ফুরসত নেই কেজো কর্মচারীদের। বাগান যেন তাদের প্রতীক, আধাক্ল্যান্ত, আধ্-মরা।

নতুন সায়েবের অভিনন্দন অভিষেক—বাগান টেবিল চেয়ারে ভর্তি, সকলে জমায়েত, বাগানের পটভূমিতে কোম্পানীর আশ্রিত দল ; এখানেও পদমর্যাদা মুতাবেক্ আসন ; বড়সায়েব, তার পর তাঁর থেকে ছোট, তার পর তাঁরও থেকে ছোট—এইভাবে ওপর মহলের কর্তারা, দূরে কেরানীরা—ওধারে চাপরাশীদের সারি।

চা, জলখাবার, নানা রকম গল্পের টুকিটাকি। তারপর অভিনন্দন ভাষণ, প্রত্যুত্তর।

এই তার ফৌজ—বলিদত্ত চোখ বুলিয়ে দেখল—স্তরে স্তরে, সকলেই তার অধস্তন। কত তাড়াতাড়ি সব বদলে গেছে। কয়েক-জনকে দ্বিতীয়বার চেনার মত মনে হচ্ছে, আর কয়েকজন খুবই চেনা, বাকীরা নতুন। পুরনো হলেও নতুন ; সে পুরনো পরিচয় ঝালাতে ব্যস্ত নয়, তাতে শৃঙ্খলা ভাঙ্গতে পাবে। সুতরাং চেনা লোকদের দেখেও সে দেখল না। কিন্তু মনে চলছে দুই ধারা—একদিকে প্রভুত্বের নতুন দৃষ্টিতে নতুন অনুভূতি যা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয়—আমিই এখানে বড় ; অন্যদিকে পুরনো স্মৃতি—ওই ওদিকে ঠেলাঠেলির মধ্যে, দলের ভিতর কোন্ ফাঁক থেকে সে বেরিয়ে এসেছে ওপরে, ধাপে ধাপে সিঁড়ি চড়ে! ওরা ভাবছে কি? নিশ্চয় হিংসা করছে, প্রশংসা? কৌতূহল? যতই চাপতে চেষ্টা করুক, শেষ পর্যন্ত পারল না সে ; এই ত'—

"এংকটু রাও?"

"য়েস্, স্যার।"

"সব ভাল ত'?"

"আপনার দয়ায়, সব ভাল, স্যার।"

কৈ বনু? চারিদিকে কতবার তেরছা চেয়েও বলিদত্ত তাকে পায় নি। দলের মধ্যে তাকে ত' দেখছে না। বহুদিন তার খোঁজ নেওয়া হয় নি সত্যি—সাজিয়ে গুছিয়ে দু'চারটে উপদেশ দেওয়া যেত তাকে—"বনু, এ পথ ছাড়্, নরম হ, গোঁয়াতুর্মিতে কোন ফল হয় না।"

উপদেশ দেবে ? না, সে স্তর আর নেই।

বরং গম্ভীর হয়ে থাকবে বলিদত্ত ; কড়া কড়া দু'কথা শোনাবে—"এভাবে চললে, আমি বাধ্য হব অপ্রীতিকর আদেশ জারি করতে। কি করা যায় ? কোম্পানীর কাজে শৃঙ্খলা ত' রাখতে হবে। ধর্, আমার বদলে অন্য কেউ হত। সে কি করত ?"

মনে মনে কথাগুলো আওড়াতে আওড়াতে মুখের রেখা টান্ টান্ হয়ে উঠছে। ভ্রূ টেনে যাচ্ছে কানের দিকে ; কর্মচারীদেব দিকে আগুনের মত নজর এগোচ্ছে। না, সে একটুও ঢিল দেবে না। কেউ কেউ আসবে পরিচয়গত সুবিধা নিতে, আরও কত আসবে—পেটে মাথায় হাত চাপড়ে মনগলানো কথা বলতে :—'মাইনেয় কুলোচ্ছে না, বৌএর হাত খালি, ছেলেমেয়ে বখে যাচ্ছে, সেদিকে নজর দেবার সময় নেই।' সেই পুরনো যুক্তি—হয়ত তার অধিকাংশ সত্য—তা হোক্।

সে তবুও নরম হবে না। তার শাসনে বন্ধু বাদ যাবে না, যতই চেনা থাক না কেন ! এই ত' সে প্রথম অনুশাসন ভঙ্গ করেছে—এসে দেখা করা উচিত ছিল তার, সুখদুঃখের কথা জিজ্ঞাসা, অভিনন্দন, তা নয়, ছায়াই মাড়াচ্ছে না। নিশ্চয় সে কোথায়ও বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বিদ্রোহের বক্তৃতা ঝাড়ছে। নিছক হাওয়ায় ছোরার ঘা—অথচ এই সে ভালবাসে। প্রচারের জোরে এ খেলায় আগুন জ্বালানো যায়—বলিদত্ত ভাবতে লাগল ; কোথাও এক চিলতে আগুন, তারপর তা ছড়িয়ে পড়ে, কোম্পানীর কোটি কোটি টাকার ক্ষতি। আগে থেকে সাবধান হওয়া চাই, অতএব—

ফুলের মালা মিলছে একের পর এক,—বক্তৃতা চলছে। প্রসন্ন, অমায়িক হাসি হাসতে হবে। মনে হয় সরোজিনী এলে পারত, আসা উচিত ছিল তার। এ সব সামাজিক অনুষ্ঠান সামলাতে সে দড়। তার মুখে আছে মোহিনী মায়া। ভাবতেই, বলিদত্তের মুখে স্মিত হাসির রেখা আঁকা হয়ে যায়। অভিনন্দন শোনা যায়, এ ত' ঐতিহাসিক—"আপনার হৃদয়বত্তা, আপনার বলিষ্ঠ মানবিকতা, অধস্তনদের প্রতি আপনার গভীর স্নেহ সহানুভূতি সকলেরই সুবিদিত। আবার, আপনার কর্মকঠোরতা, ধুরন্ধর কার্যকুশলতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও উদার দূরদর্শী বিবেচনা—আপনার দিকে কোম্পানীর আস্থা যথার্থই আকৃষ্ট হয়েছে। একাধারে সুযোগ্য ও সহৃদয়

কর্তৃপক্ষ—আপনাকে আমরা পেয়েছি পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে। অতএব—”

এত গুণ আছে তার? নিজেরই অবাক লাগে।

কালকের মত লাগছে, এ ছিল তার কর্মস্থল, কত লোক তাকে তোয়াক্কা করত তখন?

কিন্তু আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে। তখনও ত' সে সরোজিনীকে বলত—“তুমি দেখো, ওরা চিনবে তখন। গুণ লুকানো থাকে না, সাধনা যায় না বৃথা।”

আজ তারা তাকে চিনেছে—তার দানাপানির আসন সবচেয়ে উঁচুতে সুপ্রতিষ্ঠিত; শুধু নিজের জন্যই নয়; যে বংশধর আসছে এবং অনাগত সন্ততির জন্যও সে বংশপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে।

বলিদত্ত বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়াল। সকলে সসম্ভ্রমে চেয়ে—সে নিজেও অনুভব করছে যে সে কত বড়। বুক ফুলে উঠছে। নিজেকে বড় বলে ভাবলেই কি সহজে মুখে আসে ভাষা! সে যেন কথা কইছে না—তার ভিতর থেকে অন্য কে যেন বলছে। সবাই শুনছে। কেউ কেউ লিখে নিচ্ছে—

“পরিশেষে আমি আপনাদের কিছু উপদেশ দেব। ধর্ম কি? শুধু কি ঠাকুরপূজা? না, তা নয়। কর্তব্য পালনই আসল ধর্ম। কর্তব্য কি? কর্তব্য হল কতকগুলো দায়িত্বের সমষ্টি, নিজের প্রতি—ঈশ্বরের প্রতি; সবচেয়ে বড় কর্তব্য, যে আমাদের অন্নদাতা, তার প্রতি; অর্থাৎ আপনাদের কাজকর্মের প্রতি।

“পদে পদে কখনো দুই অথবা তিন কর্তব্যের মধ্যে বাছাই করার বিপদ ঘটতে পারে। আপনাদের বড় কর্তব্যকে সে সময় প্রথম স্থান দিলে মনে কোন খটকা বাধবে না। কর্তব্য সম্পাদনে ত্যাগ চাই—যেমন পূজায় চাই বলি; কিন্তু সেই ত্যাগই ত' আনন্দ, কাজই ত' বিশ্রাম। আলস্য ব্যাধি, বিশ্রাম নয়।

“আমি দেখেছি—যতক্ষণ ফাইলের ভিতর ডুবে থাকি, ততক্ষণ চরম আনন্দ পাই। -কারণ, আপনারা জানেন—কাজের মধ্যেই জীবনকে অনুভব করা যায়, নিদ্রায় নয়। অবশ্য, সকলের মত এক না হতে পারে; কিন্তু আমি আমার মত বললাম, আপনারা ভেবে দেখবেন—”

ঘন ঘন হাততালির মধ্যে তার বক্তৃতা শেষ করার সময় সকলে এসে তার চারিপাশে ঘিরে দাঁড়াল। বিনীত নমস্কার জানিয়ে তারা একে একে বিদায় নিল। এংকট্ রাও ছায়ার মত ঘুরছে। বলিদত্ত

ডাকল—"এংকট্ রাও—"

"য়েস্ স্যার—"

"একটু এ পাশে—" 'এস' বা 'আসুন' কিছু ঠিক করা গেল না—"একটু এ ধারে, সামান্য কথা আছে—"

"য়েস্ স্যার—"

"এখন কোন্ সীটে?"

"বাড়ী ঘর, পোল, সড়ক তৈরী বিভাগের গুদামের ইন্‌চার্জ।"

"ভাল তা হলে?"

"য়েস্ স্যার।"

"আর, হাত দেখা, কোষ্ঠী দেখার অভ্যাস চালু ত'?"

এংকট্ রাও হাসল। "য়েস্ স্যার! অনুমতি দিলে কাল সকালে যেতে পারি।"

"বনবিহারীকে মনে আছে? তার খবর কি? সব ভাল ত'?"

"য়েস্ স্যার।"

"সে এখন কোথায়? কোন্ সীটে? তাকে দেখলাম না ত' এখানে?"

"সে ত' কবে চাকরী ছেড়ে গেছে, স্যার—"

"অ্যাঁ, হায় রে হতভাগা। একদম চলে গেছে? এখন চলছে কি করে তার? খায় কি?"

"তার জন্য দুঃখ করবেন না, স্যার। সে ভালই আছে,—এক রকম বড়লোকই বলা যায়।"

"চাকরী ছেড়ে বড়লোক; সন্ন্যাসী না রাজনৈতিক নেতা?"

"না স্যার, সে ব্যবসা করে; তার প্রকাণ্ড দোকান ইলেকট্রিক্যাল, এবং রেডিও বিক্রীও করে। শহরে একজন নামী লোক সে।"

"আশ্চর্য!"

"কিছু না, স্যার। এটা ব্যবসার যুগ কি না। তাছাড়া ইলেকট্রিক ত' হু হু করে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রথমে যখন আপিসে হাঙ্গামাহুজ্জত করে বেরিয়ে গেল—অনেকেই ভেবেছিল—সে তলিয়ে গেল। হাতে ছিল না কানাকড়ি, বরং কিছু দেনা, আর খাওয়ার কুটুমও ত' কম নয়। কিন্তু আমি তার হাত দেখেছিলাম। তারপর—"

বাধা দিয়ে বলিদত্ত বলল—"আচ্ছা, পরে দেখা হবে। তাহলে নমস্কার।"

এংকট্ রাও নমস্কার জানিয়ে চট্‌পট্ ঘুরে চলে গেল। বলিদত্ত

এগোল মোটরের দিকে। সব বিরক্তি এংকট্ রাওয়ের ওপর আছড়ে পড়ছিল ; এরা এমনই, অল্প আস্কারা পেলেই শুরু করবে খোস্‌গল্প। তাই মাঝখানে তাকে থামিয়ে দিয়ে ঠিকই করেছে। এংকট্ রাওএর বোঝা উচিত ছিল—সে দিন আর নেই।

সাঁ করে মোটর সোজা কুঠির দিকে চলেছে। মন বিরক্তিতে গরগর করছে। বন্ধু হয়েছে বড়লোক। কেন? কি তার ত্যাগ? কি তার চেষ্টা? হাওয়া খেয়ে বেড়াত অনেকে, তারাও ত' উঁচুতে উঠেছে। কেন? রাগ হল দুনিয়ার ওপর। দুনিয়ার অসাম্যকে ধিক্কার দিল তার বড়লোকী মনও। মনে হল সে অত্যাচারিত, সে দুঃখী।

□

কুঠিতে পোঁছল ; সরোজিনী নেই, বাড়ী খাঁ খাঁ।

চাপরাশীরা টহল দিচ্ছে। হর্ষা বসে আছে একটা চেয়ারে। পা নাচিয়ে পেয়ারা খাচ্ছে।

চাপরাশীরা সেলাম করল—হর্ষা পেয়ারা লুকিয়ে নুয়ে পড়ল জুতোর ফিতে খুলতে। রান্নাঘর মুখরিত—খান্‌সামা, বাবুর্চি আর পানিওয়ালার কলরবে। আলো জ্বলছে—সাজসজ্জায় সুন্দর বড় সায়েবের কুঠি—চওড়া বারান্দায় ফুলের টব সারি সারি, প্রকাণ্ড বাগান—

"মা কোথায় রে?" বলিদত্ত জিজ্ঞাসা করল।

"সেই যে বাবু", হর্ষা বলল "যে বাবু মোটরে চড়ে বেড়াতে আসতেন ওখানে থাকার সময়, তিনি এসেছিলেন। মা আর তিনি চা খেলেন। মা তাঁর সঙ্গে বেড়াতে গেছেন কোথায়। তিনি আসবেন আবার, আজ রাতে থাকবেন এখানে।"

"কোন্ বাবু রে?"

"সেই যে বাবু মোটরে চড়ে আসতেন ওখানে থাকার সময়—সে-ই যে—" হর্ষা টেনে টেনে বলে চলল যেন গ্রামোফোন রেকর্ড। সে শুধু খবর দিচ্ছে—তার মতামত নেই।

কোন্ বাবু সে?

কত বাবুই ত' আসত। রণজিৎবাবু না কি? না, আর কেউ?

হঠাৎ মাথার মধ্যে খুন চাপল—এও একটা নতুন সুর। নীচের ঠোঁট দাঁতে কামড়ানো—সামনের কিছুই চোখে পড়ছে না—অথচ দেখছে অন্ধ চোখ শুধু বিভীষিকা। নিজের মনের মধ্যের ভূতগুলো চরে বেড়াচ্ছে, ধেই ধেই নাচছে, অস্থির করছে, হাড়-মজ্জায় আগুন ধরাচ্ছে। ওঃ, কী যন্ত্রণা; এই জন্য বড় হওয়া? কিসের সাফল্য, কার জন্য? কি সে পেয়েছে? দু'হাতে মাথা টিপে অন্ধকারের দিকে দেখছে। এই তার পথ, অন্তহীন। এই তার জীবনে জট-পাকানো কাহিনী—দানাপানির স্থূল তরাজুতে সাফল্য মাপতে মাপতে দিনরাত কেটে গেছে, দেহে জ্বলছে দাহ—

আবার বেড়াতে গেছে সরোজিনী—

ওঃ।

বলিদত্ত তড়াক করে উঠে পড়ল, সোজা গেল আপিস কুঠ্রীতে—বসে পড়ে ফাইলের গাদা থেকে একটা তুলে নিয়ে হাঁকল—

"চাপ্রাশী—"

"হুজুর—"

"জল্দি ডাকো স্টেনোবাবুকে—"

বেশ, এই ভাল, এখানে সে কর্তা। এ হল কারখানা—জীবন এখান থেকে পিছিয়ে থাকে—তার প্রবেশ নিষেধ।

□ □